শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

# গোলাঘর

৪র্থ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা জানুয়ারি - জুন ২০১২

**প্রকাশকাল**
১৫.১২.২০১২

**সম্পাদক**
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

**যোগাযোগ**
৩৬২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫
৪র্থ তলা, ডানপাশ, ইস্টার্নপ্লাজা মার্কেটের পেছনে মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫
০১৫৫৯১১৩৯৬১, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

**বানান সমন্বয়**
ফরীদুল আলম

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
কাইয়ুম চৌধুরী

**পত্রিকার নামলিপি**
শরমিন নিশাত

**প্রচ্ছদ অংকন**
রুবাবা হোসেন নদী

**জনসংযোগ**
আবদুল হাই

**অনলাইন মেকাপ**
খোরশেদ রানা

**মুদ্রণ**
বিকল্প প্রিন্টিং

**মূল্য**
২০০.০০ টাকা
২০০.০০ রুপি
৪$ ডলার

## স ম্পা দ কী য়

বাংলা একাডেমি বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন– ইদানীং এরকম দাবি উঠেছে প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতাদর্শের সাহিত্যিক, গবেষক মহলে। শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমির মতো সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানও বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন বলে অনেকে মত দিয়েছেন। এ ধরনের মতকে আপাত অর্থে আত্মঘাতী কিংবা জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী মনে হলেও; এই ধরনের মত প্রকাশের পেছনে যৌক্তিক কারণও রয়েছে। বাংলা একাডেমির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে যে-যে কাজগুলো এই প্রতিষ্ঠান করছে, তাতে জাতীয় সাহিত্য ও ভাষা-র কোনো উপকার তো হচ্ছেই না বরং এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় মনন ও সৃজনচর্চাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার ক্রমবিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের সাহিত্য ও ভাষার চর্চা, গবেষণা এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। অথচ আজ এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অন্য দশটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতোই দুর্নীতি, লক্ষ্যভ্রষ্টতা ও স্থূল দলীয়করণের কারণে হাজামজা-দুর্গন্ধময় কুয়োয় পরিণত হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ-ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার তাগিদ অনুভব করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন : "...পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি বাঙ্গালাভাষী যা করতে পারে, পূর্ববঙ্গের সাড়ে চার কোটি বাঙ্গালাভাষী কেন তা করতে পারবে না? ...আমাদের মনে রাখতে হবে জাতির স্থায়ী গৌরব তার সাহিত্যে। তার রাষ্ট্রীয় আয়তনে, জনবলে, ধনবলে বা অস্ত্রবলে নয়। ...আমি একথা নিশ্চিত জানি যে বাঙ্গালা ভাষা কখনও পূর্ব-পাকিস্তান থেকে লুপ্ত হবে না। আমি আরও বিশ্বাস করি যে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা জনবহুল এবং স্বাস্থ্যবান পূর্ববঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে একদিন অগ্রণী হবেই হবে। ...গোটা পূর্ব-পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সমিতি নাই। যখন আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, তখন এই কেন্দ্রীয় সমিতির অভাব কি লজ্জা ও দুঃখের বিষয় নয়?"

এ রকমের অভাব ও লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যেই শুধু নয় বরং ইতিহাসে চরম অবহেলিত পূর্ব-বাংলার অর্জন অর্থাৎ প্রধানত বাঙালি মুসলমানের অর্জনের আবিষ্কার, সংরক্ষণ এবং সম্মানের সাথে জাতির সামনে, বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার জন্যও ভাষা-আন্দোলনের গতি ও চেতনা নিয়ে ১৯৫৫ সালে জন্ম হয়েছিল বাংলা একাডেমির। বিশ্বের ন্যূনতম সভ্য প্রায় সকল দেশেই এ-ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে; সেদিক থেকে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানসচর্চার প্রতিপালন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বাংলা একাডেমি একটা সময় পর্যন্ত সুনামও কুড়িয়েছিল।

কিন্তু আজ বাংলা একাডেমির সেই সুনাম কোথায় গেল? বাংলা একাডেমি থেকে যে-বিশালসংখ্যক উঁচুমানের স্বতন্ত্র বই ও বিশিষ্ট লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ

হয়েছিল, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিশালসংখ্যক বই এই প্রতিষ্ঠানটি আর পুনর্মুদ্রণ করছে না কেন? এখনও রচনাবলী প্রকাশ হয়নি এমন অনেক বড়-বড় লেখকের রচনাবলী প্রকাশ হওয়া দরকার, যে-গুলো বাণিজ্যিক প্রকাশনীগুলো হয়তো কখনোই প্রকাশ করবে না; সেই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের রচনাবলী বাংলা একাডেমিও প্রকাশ করছে না; এমনকি ভবিষ্যতে প্রকাশ করবে তারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অথচ এগুলোই হওয়ার কথা ছিল বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পক্ষান্তরে বিভিন্ন ধরনের মেলা, পুরস্কার বিতরণ, হৈ-হুল্লোড়মূলক লোক-দেখানো তাৎক্ষণিকতার ফূর্তিতে মোড়ানো নানা কিসিমের প্রকল্প ও অনুষ্ঠানের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের অতি মাত্রায় ঝোঁক লক্ষণীয়।

বাংলা একাডেমিকে যদি প্রশ্ন করি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষী মুসলমানেরা যে-হাজার হাজার পুঁথি লিখেছিলেন যার বেশ কিছুটা আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ ব্যক্তিগত উদ্যোগে জীবন বাজি রেখে সংগ্রহ করেছিলেন, সেই পুঁথিগুলো কোথায়? কিংবা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো অনেক লেখকের রচনাবলী বাংলা একাডেমির গুদাম বা বিক্রয়কেন্দ্রে নেই কেন? একটি চরিতাভিধান এবং একটি লেখক-অভিধান পর্যন্ত আমাদের নেই! সে-ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কী জবাব দেবে। এরকম শত প্রশ্নের জট তৈরি হয়ে আছে যেগুলোর একটিরও জবাব বাংলা একাডেমির কাছে নেই। বরং দেশের অন্য দশটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো আমাদের রক্ত ও স্বপ্নদিয়ে গড়া বাংলা একাডেমিকেও সব ধরনের দুর্বৃত্তায়ন, গ্রাস করে নিয়েছে সাধ্যমতো।

আমাদের জাতীয় রাজনীতি যে-চরিত্র ধারণ করেছে; একদিকে দেশের আন্তঃকোন্দল অন্যদিকে বিদেশি আগ্রাসন এই দুইয়ের মাধ্যে পড়ে যে-স্বপ্ন নিয়ে দেশটি স্বাধীন হয়েছিল, সেই স্বপ্ন আজ অসম্ভবের দরজায় কড়া নাড়ছে। ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকি, বিশ্বমন্দার প্রভাব, বিশ্ব-জলবায়ুর বিপর্যয়, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন এছাড়া আরও বহু ধরনের সংকটের মুখোমুখি আমরা। এ অবস্থায় দেশ পরিচালনার সময়োপযোগী নেতৃত্ব প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে।

পুরো পৃথিবী-ই আজ যেখানে অনেকগুলো কারণে চরম হুমকির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে, সেখানে আমাদের মতো দরিদ্র একটি দেশ যদি সঠিক নেতৃত্ব না-পায়; তাহলে এখানকার মানুষের ওপর দিয়ে যে-দুর্ভোগ বয়ে যাচ্ছে সেটা যে-কোনো সময় বিপজ্জনক সাইক্লোনে রূপ নিতে পারে!

এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, লালন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব কতটা নিতে পারছে বাংলা একাডেমির মতো প্রায় দিশেহারা একটি প্রতিষ্ঠান, সে-কথা ইতোমধ্যে আমরা নিশ্চিত করেই বুঝে নিয়েছি।

'নিতান্ত চাকরিজীবী' ও 'দলের দালাল' দিয়ে কোনো উদ্দেশ্যই পুরণ হবে না; দেশ আজ এই দুই জাতের মানুষে পূর্ণ হয়ে গেছে। দলের নয়, বাংলা একাডেমিকে বাঁচাতে আজ দরকার দলের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করবার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ।

বিশ্বরাজনীতির আধিপত্য ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, দেশীয় রাজনীতির স্থূল দলীয়করণ ও আন্তঃকোন্দলের বিরুদ্ধে এবং বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠানের দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একইসঙ্গে। একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কিত বিধায় একটি বাদ দিয়ে অন্যটি নয়; বরং সামগ্রিক সমাধানের উদ্দেশ্যে নতুন ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা আজ আমাদের প্রধান কাজ।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

**শওকত হোসেন**
**শরমিন নিশাত**
**১৫.১২.২০১২**

# সূচি

স্মরণ
ছবি: পূর্ণচন্দ্র দাস ৭

ব্যক্তিত্ব/প্রবন্ধ
ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে মাদারীপুর ও পূর্ণচন্দ্র দাস
**এম. এ. আজিজ মিয়া ৮**

প্রবন্ধ/ইংরেজি সাহিত্য
প্রতিক্রিয়াশীলতা, আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে
**সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৩২**

কবিতা
প্রথম দশকের ২১ জন কবির ২১ টি কবিতা ৬২

প্রথম দশকের ২১ জন কবির ২১ টি কবিতার ৩টি আলোচনা
একই কবিতা নিয়ে তিন অলোচকের তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া ৮০

প্রবন্ধ/সাহিত্যতত্ত্ব
মার্কসবাদী নন্দন ও সাহিত্যতত্ত্ব
**খোন্দকার আশরাফ হোসেন ৯২**

প্রবন্ধ/রবীন্দ্রচর্চা
রবীন্দ্রচর্চায় বামবলয়ের ঐতিহাসিক অবদান
**আবদুশ শাকুর ১২০**

গল্প
মেঘের আগুন
**নুরুন নাহার খান ১৩৪**

এই সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পের পাঠ-প্রতিক্রিয়া
আঞ্চলিক সংলাপ ও গৃহস্থালির বর্ণনায় মুন্সিয়ানা
**প্রশান্ত মৃধা ১৪১**

অনুবাদ/কবিতা
উঠি জেগে আজও
**মায়া এঞ্জেলো/দেবযানী কচ্ ১৪৩**

প্রবন্ধ/চলচ্চিত্র
রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্ররূপ: সত্যজিৎ রায় এবং নারী প্রসঙ্গ
**তারেক মাসুদ ১৪৫**

প্রবন্ধ/ নাটক
বাংলাদেশের বর্তমান নাট্য আন্দোলন: কিছু জিজ্ঞাসা
**গজন্ফর কবীর ১৫২**

চিত্রশিল্প/প্রবন্ধ
এস. এম. সুলতান : বলশালী গণশক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা
**শওকত হোসেন ১৫৬**

প্রতিক্রিয়া
রামুর বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ বসতি আক্রমণ: বর্বরোচিত!
**তাহিয়া পাপড়ি ১৬৪**

প্রবন্ধ/দর্শন
লালনের ‘অচিন পাখি’ দর্শন
**সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ১৬৬**

## স্মরণ

................................

## পূর্ণচন্দ্র দাস

১৮৮৯ - ১৯৫৬

১৮৮৯ সালের ১ জুন বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস মাদারীপুর (তৎকালীন ফরিদপুর) জেলার সমাজ-ইশিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা...... । পিতা কাশীনাথ দাস। ১৯০৮ সালে তিনি মাদারীপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং সেখান থেকে ১৯১০ সালে ম্যাট্রিক পাসের পর কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। তখন মাদারীপুরে যাতায়াত এবং গোপন বিপ্লবী দল পরিচালনা করতেন। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি এবং মনিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকে সারাদেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়; অতঃপর ১৯১৩ সালে মাদারীপুর বা ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্র দাস তাঁর অনেক সঙ্গীসাথীসহ গ্রেফতার হন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষও মাদারীপুরের মানুষ ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বললেন, 'Their difficulty is our opportunity. বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ যখন জড়িয়ে পড়বে, তখন ভারতের ওপর তার মুঠোর জোর কমে আসবে।' সেই সময়ে বাঘাযতীনের পাশে থেকে পূর্ণচন্দ্র দাস কাজ করেন। তিনি ১৯১৪ সালে 'ভারতরক্ষা আইন'-এ পুনরায় গ্রেফতার হয়ে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলে ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ও তাঁর দলের অধিকাংশ সদস্য গান্ধিজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। করাচিতে ১৯২১-এর জুলাই মাসে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনে ভারতের মুসলমানদের ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সামরিক বিভাগ থেকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; ওই প্রস্তাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় মুসলিম নেতা মৌলানা মহম্মদ আলি, সৌকত আলি ও ড. কিচলুকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে পূর্ণচন্দ্র মাদারীপুর কালিবাড়িতে জনসভা করে সেই সভায় নিজে করাচি প্রস্তাব পাঠ করে ইংরেজের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেন। এই অপরাধে তিনি গ্রেফতার হন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কারণে ১৯২৩ সালে তিনি আরও একবার গ্রেফতার হন; মুক্তিলাভের পর তাঁকে মাদারীপুরে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়; সভায়

পূর্ণ দা-কে উদ্দেশ্য করে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'এসো অষ্টমী পূর্ণচন্দ্র, এসো পূর্ণিমা পূর্ণচাঁদ...' অভিনন্দন সূচক কবিতাটি পাঠ করা হয়। পূর্ণচন্দ্র জেলে থাকাকালে ঘনিষ্ঠ হন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। ১৯৩৯ সালে তিনি নেতাজীর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। পূর্ণচন্দ্র ৬৭ বছরের জীবনে ৪৮ বছর কাটিয়েছেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এবং মানবকল্যাণ সাধনে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের দিকটি হল, বাংলার মহান বিপ্লবী বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়িবালাম নদীর তীরে প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধে যে পাঁচজন বিপ্লবী যুদ্ধ করে শহীদ হন, তাঁর মধ্যে তিনজনই ছিলেন পূর্ণচন্দ্রের একান্ত অনুগামী ও বিশ্বস্ত সহযাত্রী। ১৯৫৬ সালের ৪ মে বালিগঞ্জে এক
প্রাক্তন বিপ্লবীর ছুরিকাঘাতে তিনি মারা যান।

ব্য ক্তি ত্ব / প্র ব ন্ধ

## ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে মাদারীপুর ও পূর্ণচন্দ্র দাস

...........................................................................................................

এ ম. এ. আ জি জ মি য়া

বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে মাদারীপুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। সে কালে 'মাদারীপুরকে বাংলার চিতোর' বলে আ্যাখায়িত করা হত। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রায় সমকালেই মাদারীপুরে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। অগ্নিপুরুষ পূর্ণচন্দ্র দাস (১৮৮৯-১৯৫৬) সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১৩) বা মাদারীপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি ছিলেন তিনি। ১৯১৫ সালে বুড়িবালামের যুদ্ধে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫) বা বাঘা যতীনের নেতৃত্বে মাদারীপুরের তিনজন বিল্পবী অংশগ্রহণ করেন। একজন ঘটনাস্থলে শহীদ হন এবং অপর দুজনের ফাঁসি হয়। তাঁরা ছিলেন পূর্ণ দাসের লোক। যুগান্তর দল প্রভাবিত। তাছাড়া পরবর্তীকালে পূর্ণদাসের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল বিশাল 'শান্তিসেনাবাহিনী'। এ-বাহিনীর শৃঙ্খলা, সততা এবং সেবাপরায়ণতা ক্ষেত্রে

সারা দেশে বিশেষভাবে সুখ্যাতি ছিল। বাংলাদেশের অন্যান্যস্থানেও শান্তিসেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। সারাদেশে পূর্ণচন্দ্র দাসের সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা কংগ্রেসে শান্তিসেনাবাহিনী গার্ড অব অনার দেয়ার সময় পূর্ণচন্দ্র দাসকে গান্ধিজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে গান্ধিজী করজোড়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে বলেছিলেন 'আমাকে নয় ভারতবাসীর প্রণাম করা উচিত তোমাকেই'। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫) বা স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২) প্রতিটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মাদারীপুরের বিপ্লবী ও স্বাধীনচেতা জনগণ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং আন্দোলন সংগ্রামে সহযোগিতা করেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রথম ফাঁসি হয়েছিল ক্ষুদিরাম বসুর (১৮৮৯-১৯০৮)। তাঁর আদি পৈতিক বাড়ি ছিল তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমার (বর্তমান শরীয়তপুর জেলা) সখিপুর গ্রামে। বুড়িবালামের যুদ্ধে ঘটনাস্থলে শহীদ হয়েছিলেন খালিয়া গ্রামের চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (১৮৯৪-১৯১৫) এবং ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছিলেন খৈয়ারভাঙ্গা গ্রামের নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮২-১৯১৫) এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৮৯৮-১৯১৫)। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং চরমুগরিয়া মেল-ব্যাগ ডাকাতিতে হত্যা মামলায় ফাঁসি হয়েছিল এরিকাঠি গ্রামের বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (১৯১০-১৯৩২)। জেলখানায় আত্মাহুতি দেন পালং-এর বিপ্লবী রাধাচরণ প্রামাণিক (১৮৮৫-১৯১৭) এবং আঙ্গারিয়ার ডাক লুটের সময় ১৯২৬ সালে মারাত্মক জখম হয়ে মাদারীপুর হাসপাতালে মারা যান জ্যোতি নামে এক বিপ্লবী। তিনি ছিলেন রেঙ্গুনের একটি গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য। তাছাড়া মাদারীপুরের বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যাঁরা জেল খেটেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন তাঁদের তালিকা অতিকায় দীর্ঘ।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে কলকাতায়। ১৯০২ সালে গঠিত হয় গোপন বিপ্লবীদল 'অনুশীলন সমিতি'। অনুশীলন সমিতির সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০), সহ-সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫)। সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০)। সমিতির পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্র ছিল কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র ছিল ঢাকা। কলকাতা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন বিপ্লবী সতীশচন্দ্র বসু (১৯৭৬-১৯৪৮) এবং ঢাকার কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস (১৮৭৭-১৯৪৯)। তাঁরা দুজন ছিলেন অনুশীলন সমিতির যুক্ত সম্পাদক। পুলিন বিহারী দাসের বাড়ি ছিল সোনসিং গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ হতে সমিতির নাম রাখা হয়েছিল 'অনুশীলন সমিতি'। অনুশীলন অর্থ চর্চা। আর চর্চা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করাই ছিল বিপ্লবীদের লক্ষ্য। অনুশীলন সমিতির রণকৌশলগুলো নেয়া হয়েছিল ফরাসি বিপ্লীদের সংগঠন থেকে। কলকাতার পরেই মেদিনীপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সমিতির শাখা গঠিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ

বিরোধী আন্দোলনের ফলে স্বদেশী জোয়ারে দেশ ভাসতে থাকে। তখন এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনও প্রবল গতিবেগ লাভ করে। পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে ও অন্যান্যস্থানে প্রায় ছয়শত শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯০৬ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' নামে একটি বাংলা পত্রিকা। এ-পত্রিকাকে ঘিরে একটি পৃথক বিপ্লবীদল গড়ে ওঠে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ-কে কেন্দ্র করে। পরবর্তীকালে এ দলটিই যুগান্তর নামে পরিচিতি লাভ করে। 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি পত্রিকায় বিপ্লবী কলাকৌশল সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত এবং সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে আন্দোলন-সংগ্রাম তীব্রতর হতে থাকে। আদালতে সার্জেন্টকে ঘুষি মারার অপরাধে পনেরো বছরের বালক সুশীল সেনকে পনেরোটি বেত মারা হয়। এ ঘটনা জনমনে বিশেষ করে বিপ্লবীদের আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে মানিকতলা বিপ্লবী দল বোমা তৈরি করে রাজকর্মচারীদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়িতে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮) বোমা নিক্ষেপ করলে মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা মারা যান। ধরা পড়লে প্রফুল্ল চাকী আত্মাহুতি দেন এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ব্রিটিশ সরকার ঢাকা অনুশীলন সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সাধনা সমিতি ও সুহৃদ সমিতি, বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সতেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮) এবং কানাইলাল দত্তকে (১৮৮৮-১৯০৮) ফাঁসি দেয়া হয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষসহ অন্যান্য আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন মোটেই থেমে থামেনি। অধিকতর দৃঢ় মনোবল নিয়ে শহীদের বেদিমূলে আত্মাহুতি দেয়ার জন্যে বাংলার দামাল ছেলেরা মিছিল করে এগিয়ে চলে। এ সময় মাদারীপুরে পূর্ণচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। সেখানে ব্রতী সমিতি বা অনুশীলন সমিতি অপেক্ষা যুগান্তর দলের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ-ব্যাপারে কালীপদ রায় চৌধুরী 'স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর' গ্রন্থে লিখেছেন, "পূর্ণ দাস যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কলকাতা-মাদারীপুর যাতায়াত ছিল এবং তাঁর মাধ্যমে যুগান্তর দলের প্রভাব মাদারীপুরের যুবমানসে সঞ্চারিত হয়। প্রধানত মাদারীপুর হাইস্কুলের ছাত্রদের নিয়ে একটি বিপ্লবীদল গঠিত হয়। বামন চক্রবর্তী, কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন অগ্রণী। কালীপ্রসাদ পড়াশুনা করতেন কালীপদ রায় চৌধুরীর পৈত্রিক বাড়িতে থেকে। সেখানে গোপনে বিপ্লবের আলোচনা হত। ওই বাড়িটিকে কেন্দ্র করেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিপ্লবী দল বিকাশ লাভ করে, যাকে 'মাদারীপুর বিপ্লবী দল' বা 'পূর্ণ দাসের দল' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দু-তিন বছরের মধ্যে (১৯১২-১৪) বেশ কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতি করে দলটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।... তবে এই দলের শ্রেষ্ঠ অবদান বাঘা যতীনের নেতৃত্বে দেশব্যাপী

আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন তরুণ নীরেন, মনোরঞ্জন ও চিত্তপ্রিয়কে তাঁর হাতে সমর্পণ।" (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১৩)

১৯০৮ সালে বিপ্লবীদলসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও বিপ্লবীরা থেমে থাকেনি। তারা অধিকতর দৃঢ় মনোবল নিয়ে এ-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে স্বদেশী ডাকাতির প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। একটি সরকারি নথিতে প্রকাশ ১৯০৮ সালে মোট ৩৭টি ডাকাতি সংগঠিত হয়েছিল। তারমধ্যে দরিয়াপুর ডাকাতি (১৬ আগস্ট ১৯০৯), পল্লিতসার ডাকাতি (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১১), বাইগুন তেওয়ারি ডাকাতি (২৩ জানুয়ারি ১৯৯২), আইনাপুর ডাকাতি (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২), কোলা ডাকাতি (১৮ নভেম্বর ১৯১২), মাইনত ডাকাতি প্রচেষ্টা (১২ জানুয়ারি ১৯১৩), ভরাকৈর ডাকাতি (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩) গোপালপুর ডাকাতি প্রচেষ্টা (৩ এপ্রিল ১৯১৩ নিক্সন রিপোর্ট), কাউয়াকুরি ডাকাতি (২৯ মে ১৯১৩ নিক্সন রিপোর্ট), বোহার ডাকাতি প্রচেষ্টা (আগস্ট ১৯১৩), কুলপদ্দি ডাকাতি (২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪) উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া নড়িয়া বাজার ডাকাতি ও পদ্মা নদীতে একাধিক নৌডাকাতির কথা শোনা যায়। এসব ডাকাতি মামলার কোনো কূল-কিনারা না-করতে পারায় সরকার মাদারীপুর ষড়যন্ত্র মামলা বা ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১৩) শুরু করে। এ-সম্পর্কে কালীপদ রায়চৌধুরী লিখেছেন, "রাজনৈতিক ডাকাতির কোনো কূল-কিনারা হয় না; স্বদেশী ডাকাতদেরও দমন করা সম্ভব হচ্ছে না। পুলিশ তখন মরিয়া হয়ে বেপরোয়া ধরপাকড় আরম্ভ করে দেয়। মাদারীপুরে পূর্ণদা, কালীপ্রসাদদা, বামনদা, প্রিয়নাথদা, হেমদা, কুলদা, চিত্তদা, নীরেনদা, মনোরঞ্জন, সুরেশচৌধুরী, সুরেন সাহা প্রভৃতিসহ আমাকেও পুলিশের কবলে পড়তে হল। বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের দলের প্রায় সত্তরজন কর্মী গ্রেফতার হলেন। এঁদের মধ্যে প্রায় চল্লিশজনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়ে ফরিদপুর জেলা জজকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এটিই ১৯১৩ সনের কুখ্যাত ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা। বাদী বা সরকারপক্ষের এই মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা হত মাদারীপুর থেকে এস.ডি.ও., পুলিশ সুপার ও আই.বি. অফিসারের যোগসাজসে। ডাকাতি, ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদ সাধনের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহী ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগ প্রমাণ করার মতো উপযুক্ত সাক্ষী-সাবুদ সরকারের পক্ষে ছিল না। কাউকে প্রলোভন দিয়ে, কাউকে ভয় দেখিয়ে বাদীপক্ষ অনেক সাক্ষী জোগাড় করে। আসামিদের মধ্য থেকেও তিনজনকে রাজসাক্ষী (approver) করতে সক্ষম হয়। কোর্টে তারিখে-তারিখে বাদীপক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী, সনাক্তকরণ ইত্যাদিতে প্রায় দশ মাস কেটে যায়। এই সময়ে আসামি-পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ফরিদপুরের প্রখ্যাত উকিল দীনেশ সেন ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী উকিল। সরকার পক্ষের সাক্ষীর জেরা আরম্ভ হলে বিখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ আসামিপক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করা স্থির হয়। ইত্যবসরে আই.বি. অফিসার অশ্বিনী গুহর মাদারীপুর অফিস থেকে এই মামলা-সংক্রান্ত গোপন কাগজপত্রের কনফিডেনশিয়াল ফাইল উধাও হয়ে যায়। তা

বিপ্লবীদের হাতে পড়েছে বলে গভর্নমেন্ট জানতে পারে। সে-সব কাগজপত্র এই মামলায় ব্যবহৃত হলে সরকারের অনেক জাল-জুয়ারি, ছলচাতুরি ধরা পড়ে যাবে, সরকারকে নাজেহাল হতে হবে। নিজের মান বাঁচাতে সরকার তাই অবশেষে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। তথাকথিত আসামীরা সকলেই এ-মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন।" (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ২৮-২৯) "তবে বিচার চলাকালীন বামন চক্রবর্তী সাক্ষীদের ভয় দেখানোর অপরাধে পনেরো মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাছাড়া ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানির পঞ্চাশটি মসার পিস্তল এবং বেশ কিছু কার্তুজ চুরি হয়। সেগুলো বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে বিতরিত হয় এবং সেগুলো খুন ডাকাতিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। অনুমান করা হয় সেই পিস্তলের একটি মনোরঞ্জনের হস্তগত হয়েছিল, ...এবং চোরাই অস্ত্র পূর্ণ দাস ও তার দলের লোকদের হাতে পাচার হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়।" (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ৩৫) "ডাকাতি ছাড়া অর্থ সংগ্রহের অন্যান্য প্রচেষ্টাও করা হত বলে জানা যায়। ১৯১০ সাল থেকে বেশ কয়েকবার জাল নোট তৈরি করে চালানোর চেষ্টা করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পূর্ণ দাসও এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ধরা পড়ে যান।" (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ৩৩)

১৯১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর মাদারীপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কুলপদ্দির মদনমোহন সাহার বাড়িতে ডাকাতির বর্ণনা দিয়েছেন কালীপদ রায় চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, "কলকাতা কেন্দ্রে তখন অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিপুল চেষ্টা চলতে থাকে। মাদারীপুরেও আমাদের সেরূপ নির্দেশ দেয়া হয়। তদনুসারে ১৯১৪-র শেষদিকে মাদারীপুর শহরের উপকণ্ঠে কুলপদ্দি গ্রামে এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাজনৈতিক ডাকাতির আয়োজন হয়। ওখানে আগে থেকেই মাদারীপুর বিপ্লবী দলের একটি কেন্দ্র ছিল। এই কাজে কুলপদ্দি কেন্দ্রের বন্ধুরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আমাদের সাহায্য করার জন্য কলকাতা থেকে বন্ধুবর মনোরঞ্জন সেনকে মাদারীপুর পাঠানো হয়। মনোরঞ্জন কলকাতা থেকে একটি বিখ্যাত জার্মান মসার পিস্তল নিয়ে আসেন। মনোরঞ্জন, সুরেন ও আমার ওপর যৌথভাবে এ কাজটির ভার পড়ে। সাধারণত পূর্ণদার নেতৃত্বেই এ-সব কার্য পরিচালিত হত। বিশেষ কারণে কুলপদ্দির এই অ্যাকশন পরিচালনার ভার বিপ্লবী বন্ধু প্রিয়নাথ দত্তর ওপর দেয়া হয়। ওই দিনের জন্য তিনিই হলেন দলপতি। নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে রাতের অন্ধকারে আমরা সকলে ওই বাড়িরই কাছাকাছি এক নির্জন স্থানে ঝোপঝাড়ের আড়ালে এসে জড়ো হলাম। সেখান থেকে পোশাক বদলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যার-যার কাজ বুঝে নিয়ে সেই বাড়িতে উপস্থিত হলাম। কিন্তু কাজ আরম্ভ হতে না-হতেই যেন ঘুমন্ত গ্রাম জেগে উঠল। বাড়ির চারদিকেই কোলাহল, মনে হল লোকজন হই-হল্লা করে বাড়ির দিকেই ধেয়ে আসছে। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ বাগানের ভিতর দিয়ে ওই বাড়ির যাতায়াতের একটি

সরু পথ অবরোধ করে রাখার ভার ছিল আমার ওপর। মনোরঞ্জন, সুরেনরা বাড়ির ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিল। সেখানে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এমন সময় সহসা দলপতির বিপদসূচক হুইসেল বেজে উঠল। আমি যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সুরেন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস। শীগগীর আয়।" (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ২৯-৩০)

মাদারীপুর বিল্পবী দল বা পূর্ণ দাসের দলের অন্যতম গৌরবজনক ঘটনা হল যতীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়িবালামের যুদ্ধে এ দলের তিনজন সদস্যের অংশগ্রহণ করা এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা। এ যুদ্ধে একজন মারা যান এবং অপর দুজনার ফাঁসি হয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ। কালীপদ রায়চৌধুরী লিখিত সে যুদ্ধের বর্ণনা থেকে খানিকটা তুলে ধরা হল। তিনি লিখেছেন, "...তল্লাশি করেই পুলিশ কাপতিপদা জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথদের অবস্থানের কথা জানতে পারে এবং বিরাট সশস্ত্র বাহিনী কাপতিপদা বন ঘিরে অনুসন্ধান চালাতে থাকে। তখন যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর চার সহচর রাতের অন্ধকারে গুলিবর্ষণ করতে করতে (৮ সেপ্টেম্বর) পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে বনজঙ্গল, পাহাড় পেরিয়ে পরদিন সকালে বালেশ্বর শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। লোকালয়ে এসে পৌঁছলে চেহারার বৈশিষ্ট্য দেখে গ্রামের চৌকিদার বুঝতে পারে এরাই সেই সরকার-ঘোষিত ডাকাতদল। অর্থলোভে চৌকিদার গ্রামবাসীদের সাহায্যে এদের সকলকে ঘিরে ফেলে এবং চৌকিদার নিজে চিত্তপ্রিয়কে জাপটে ধরে। তখন মনোরঞ্জন মসার পিস্তলের গুলিতে চৌকিদারের অর্থলিপ্সা চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়ে চিত্তপ্রিয়কে মুক্ত করেন এবং সকলে মিলে বালেশ্বর শহরের বিপরীত দিকে জনবসতিহীন উষরভূমি চাষখণ্ডের দিকে এগুতে থাকেন। পথে পড়ল খরস্রোতা বুড়িবালাম নদী। ব্রিটিশ সরকারের ভয়ে নৌকার মাঝিমাল্লারা নদী পার করে দিতে অস্বীকার করল। অগত্য তারা নিজের অস্ত্রশস্ত্র, জামাকাপড় পুঁটলি বেঁধে একহাতে তা জলের উপর উঁচু করে ধরে অন্য হাতে সাঁতরে নদী পার হয়ে গেলেন। বিপ্লবীদল চাষখণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে খবর পেয়ে সশস্ত্র পুলিশ এবং সৈন্যদলও সেই দিকে ধাওয়া করল। তারা নৌকায় সহজেই বুড়িবালাম পার হয়ে বিপ্লবীদের পিছু নিতে সক্ষম হল। আর বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয় বুঝে যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহচরদের ফিরে সৈন্যদের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দিলেন। একটি মাটির ঢিবির আড়ালে ব্যূহ রচনা করে তাঁরা ব্রিটিশ সেনাদলের উপর মুষলধারায় গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। অপর পক্ষ থেকেও তার যথাযথ উত্তর দেওয়া হতে থাকে। দুই তরফেই ব্যাপকভাবে গুলিবিনিময় চলে। কিছুক্ষণ পরেই প্রথমে যতীন্দ্রনাথের হাতে গুলি লাগে। আহত অবস্থায়ও তিনি সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন। তারপর চিত্তপ্রিয়'র মুখে গুলি লেগে মুখমণ্ডল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন।

দ্বিতীয়বার গুলির আঘাতে যতীন্দ্রনাথকেও ভূতলশায়ী হতে হয়। মনোরঞ্জন তখন এক উরুতে যতীন্দ্রনাথ, অন্য উরুতে চিত্তপ্রিয়র মাথা রেখে বিপক্ষের উপর অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করে চলে। বিপক্ষদলেও অনেক হতাহত হয়। একটি বুলেট থাকা পর্যন্ত বিপক্ষ সৈন্যদল তাদের কাছে যেতে পারেনি। যুদ্ধচলাকালীন একসময় নীরেন্দ্র কাছের ডোবা থেকে কাপড় ভিজিয়ে এনে মুমূর্ষু যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয়'র মুখে দিয়ে তাঁদের তৃষ্ণা নিবারণের শেষ চেষ্টা করেন। শেষে, বোধ হয় বুলেট ফুরিয়ে গেলে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে নীরেন্দ্র পরনের কাপড়ের টুকরো শান্তির প্রতীক শ্বেতপতাকা হিসেবে তুলে ধরেন। যুদ্ধ থেমে গেল। বালেশ্বর জেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে এঁদের গ্রেফতার করে বালেশ্বর শহরে নিয়ে গেলেন।" (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১২০-১২১) ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গিয়েছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী এবং পরের দিন ১০ সেপ্টেম্বর দলপতি বাঘা যতীন। মৃত্যুকালীন ঘোষণায় বাঘা যতীন বলেছেন, 'বাংলার মানমর্যাদা রক্ষার জন্যই আমি ও চিত্তপ্রিয় জীবন আত্মহুতি দিলাম।' তাছাড়া বালেশ্বর ঘটনার সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে, তিনি তরুণবয়স্ক নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতিষচন্দ্র পালকে রেহাই দেয়ার জন্য আবেদন করে গেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সে বছর ৩ ডিসেম্বর নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ফাঁসিতে দেয়া হয়। ফাঁসির আগে নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি লিখে বলে গিয়েছেন, 'তোমরা দুঃখ করো না আমরা দেশের জন্যই জীবন দিচ্ছি... ।' (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১২২)

মাদারীপুর বিপ্লবী দল গঠন সম্পর্কে কালীপদ রায়চৌধুরী বলেছেন, 'পূর্ণদা আমাদের বাসায় এসে প্রথমেই খেলাধুলা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতেন এবং নানা ভাবে খেলাধুলায় উৎসাহিত করতেন। তিনি নিজেও একজন ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন। তাঁর কাছে শুনতাম, বিবেকানন্দের বাণী, "You will be nearer to Heaven through football than through the study Gita." পূর্ণদা মাঝে মাঝেই কলকাতা থেকে মাদারীপুর এসে বন্ধুবান্ধবদের মধ্য থেকে দু-চারজন করে বেছে নিয়ে গোপনে মিটিং করতেন। এই গোপন সাক্ষাৎকার হত রাতদুপুরে মাদারীপুর শহরের দক্ষিণপ্রান্তের শ্মশানক্ষেত্রে, নয়তো শহরের পশ্চিম প্রান্তে বড়-বড় গাছপালায় ঢাকা মুসলমানদের নির্জন কবরখানায়। নির্জনে, নিভৃতে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা হত। স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় তখন মাদারীপুর স্কুলের হেডমাস্টার; আমাদের পাড়াতেই তিনি থাকতেন। তাঁর জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছাত্রদের মনেও কিছুটা প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন মাদারীপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ দেখা যায়। এই পরিবেশে পূর্ণদা ও কালীপ্রসাদদার বিপ্লবী দল গঠনের যৌথ প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। তাঁদের প্রভাবে, প্রেরণায় আমাদের আসরের কিশোর ও যুবকবৃন্দ অতি অল্পদিনেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠে। আমিও একদিন

পূর্ণদার উপস্থিতিতে তাঁরই দেওয়া একটি রিভলবার হাতে নিয়ে বিপ্লবী দলের শপথবাক্য পাঠ করে মাদারীপুর বিপ্লবীদলের সক্রিয় সদস্য হয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়ির কেশবলাল রায়চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও স্বেচ্ছায় এই দলে যোগদান করেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মাদারীপুরের বাড়িটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে 'মাদারীপুর বিপ্লবীদল'। পূর্ণদা এই বাড়িটিকে 'মাদারীপুর বিপ্লবীদলের সূতিকাগার' আখ্যা দিয়েছেন। (স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ২১)

বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যদের চার পর্বে প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষা নিতে হত। যথাআদ্য-প্রতিজ্ঞা, মধ্য-প্রতিজ্ঞা, অন্ত-প্রতিজ্ঞা ও বিশেষ-প্রতিজ্ঞা।

**আদ্য-প্রতিজ্ঞা :** 'আমি এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না। আমি আমার চরিত্র সর্বদা নির্মল ও পবিত্র রাখিব। আমি সকল সময়ই সমিতির বিধি-বিধান মানিয়া চলিব। আমি সমিতির আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব। আমি আমার নেতার নিকট কোনো বিষয় গোপন করিব না বা মিথ্যা বলিব না।'

এসব সদস্যদের মধ্য থেকে আবার বাছাই করে যারা বিপ্লবী দলের উপযুক্ত বলে গণ্য হত তাদেরকে মধ্য-প্রতিজ্ঞা করানো হত।

**মধ্য-প্রতিজ্ঞা :** 'আমি সমিতির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কারো নিকট কোনো কিছু প্রকাশ করিব না। আমি পরিচালকের নির্দেশ ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইব না। যদি কোনো সময় সমিতির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হই তাহা হইলে অবিলম্বে পরিচালককে জানাইব এবং উহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব। আমি যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো সময়ে পরিচালকের নির্দেশ পালন করিব।'

আবার এসব সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে অন্ত-প্রতিজ্ঞা করানো হত।

**অন্ত-প্রতিজ্ঞা :** 'আমি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না-হওয়া পর্যন্ত ইহার বেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নির স্নেহ, গৃহের মোহ সমস্ত দেশের জন্য ত্যাগ করিব।'

এসব সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে বিশেষ প্রতিজ্ঞা করানো হত।

**বিশেষ প্রতিজ্ঞা :** 'আমার জীবন ও ঐতিহ্যের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে আমি সমিতির প্রসারের জন্য কার্যে আত্মনিয়োগ করিব। সমিতির কোনো গোপন বিষয় লইয়া কারও সহিত আলোচনা করিব না, অথবা আমার বন্ধু-আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিব না। ইহা ছাড়া কোনো বিষয়ে সমিতির কোনো সভ্যের নিকট অযথা কোনো প্রকার প্রশ্ন করিব না।' হিন্দু সদস্যদের মন্দির ও মুসলমান সদস্যদের মসজিদ স্পর্শ করে এ মন্ত্র পাঠ করতে হত। দীক্ষা গ্রহণের পর প্রত্যেক সদস্যকে দুধ, ঘি ও চিনি মিশ্রিত এক গ্লাস

সরবত পান করতে দেয়া হত। এক কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের কাজের সংবাদ জানত না। অবশ্য পরে এ নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল। (জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ, পৃ. ১২৬-১৩৩)

এসব মামলা-মোকদ্দমায় যাঁরা ১০ বছরের অধিক জেল খেটেছেন তাঁদের মধ্যে পুলিনবিহারী দাস (লোনসিং), পূর্ণচন্দ্র দাস (মাদারীপুর), আশুতোষ কাহালী (বিলাসখান), কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত (কূঁয়রপুর), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ফতেহজঙ্গপুর), দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস (শালধ), ফনিভূষণ মজুমদার (মাদারীপুর), শচীন্দ্রমোহন কর (পালং), জীবনগুহ ঠাকুরতা (বিলাসখান), সং এবং নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য (বিলাসখান)। দশ বছরের কম যাঁরা জেল খেটেছেন তাঁরা হলেন চিন্তাহরণ সেন (বালুচড়া), প্রভাত চক্রবর্তী (কোটাপাড়া)। রশিক চক্রবর্তী (কোটাপাড়া), ভুবন বসু (দেওভোগ), হেমচন্দ্র বসু (দেওভাগ), প্রমথ গুহ (পালং), নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পালং), নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পালং), প্রমথ সরকার (পালং), বীরেন সেন (পালং), সীতানাথ দে (পালং), জীতেন্দ্র সেনগুপ্ত (কুরাশী), খগেন চক্রবর্তী (ছয়গাঁ), সুবোধ রায় (বিলাসখান), হরেশ্বর কাহালী (বিলাসখান), চিত্ত কাহালী (বিলাসখান), ধীরেন্দ্র অতর্থী (বিলাসখান), সত্যরঞ্জন ঘটক (বিলাসখান, উপেন্দ্র রায় চৌধুরী (ইদিলপুর), প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী (রুদ্রকর), নিখিল দাস (আকসা), সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (মূলগাঁও), রাধাবল্লভ গোফ (কাঠালবাড়ি), দেবেশ রায় (হোগলা), নিখিলরঞ্জন গুহরায় (ইদিলপুর), শান্তি মিত্র (আঙ্গারিয়া), যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মাদারীপুর), কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (মাদারীপুর), বামন চক্রবর্তী (মাদারীপুর), প্রতাপচন্দ্র গুহরায় (মাদারীপুর), বিজয় চক্রবর্তী (মাদারীপুর), কুলরঞ্জন মুখার্জী (মাদারীপুর), কালীপদ রায়চৌধুরী (আমগ্রাম), সুরেশ রায়চৌধুরী (আমগ্রাম), সন্তোষ দত্ত (আমগ্রাম), সুরেন সাহা (লক্ষ্মীগঞ্জ), আশু দাস (লক্ষ্মীগঞ্জ), কালিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (খালিয়া), হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মাদারীপুর), সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (মাদারীপুর), সুরেশচন্দ্র চৌধুরী (মাদারীপুর), প্রিয়নাথ চক্রবর্তী (মাদারীপুর), কুলদারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (মাদারীপুর), অসিতরঞ্জন বিশ্বাস (মাদারীপুর), কেশবলাল রায়চৌধুরী (আমগ্রাম), সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মাদারীপুর), রামরঞ্জন গুহ (মাদারীপুর), সত্যেন্দ্রনাথ সেন (মাদারীপুর), প্রফুল্লকুমার চৌধুরী (মাদারীপুর), পুলিন গাঙ্গুলী (মাদারীপুর), দীনেশ রায়চৌধুরী (মাদারীপুর), কেশব কুণ্ডু (মাদারীপুর), কেশব রায়চৌধুরী (মাদারীপুর), শরৎ সাহা (মাদারীপুর), তারকেশ্বর সাহা (মাদারীপুর), যতীন্দ্র ভট্টাচার্য (মাদারীপুর), সুরেশচন্দ্র বসু (মাদারীপুর), অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায় (মাদারীপুর), সুরেশ গঙ্গোপাধ্যায় (মাদারীপুর), পঞ্চানন চক্রবর্তী (পাঠককান্দি), বিজয়চন্দ্র দত্ত (মাদারীপুর), প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় (মাদারীপুর), তারাপদ চট্টোপাধ্যায় (মাদারীপুর), যজ্ঞেশ্বর দাস (মাদারীপুর), চিত্ত বসু (মাদারীপুর), ডা. গুহরায় (মাদারীপুর), অমলেন্দু দাশগুপ্ত (খৈয়ার ভাঙ্গা), নরেন্দ্রনাথ সিংহ (মাদারীপুর), প্রমোদ বসু রায়চৌধুরী (মাদারীপুর), হরিপদ চক্রবর্তী (পাঠককান্দি), নলিনী গুহ (মাদারীপুর),

সত্যরঞ্জন সেন (মাদারীপুর), সন্তোষ দত্ত (মাদারীপুর), সন্তোষ ব্যানার্জী (মাদারীপুর), হারাণ রক্ষিত (সাজনপুর), গিরীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (নলতা), রাইহরণ সেন (বালুচরা), জীবন ধূপী (ডিঙ্গামানিক), শান্তিসেন (রামভদ্রপুর), সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নড়িয়া), হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পালং), মাখন কর (ভোজেশ্বর), প্রমোদ দাশগুপ্ত (কূঁয়রপুর), পান্নালাল দাশগুপ্ত (কূঁয়রপুর), পরেশ চক্রবর্তী (পালং), বনলতা সেন (কার্তিকপুর), রাধাচরণ প্রামাণিক (পালং), সুরেন কর (বিঝারী), নিখিল রঞ্জন গুহরায় (ইদিলপুর), নেপাল দে (পালং), উপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস (লোনসিং), অশ্বিনীকুমার দাস (লোনসিং), গীতা সরকার (শালধ), নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (কূঁয়রপুর), চারুচন্দ্র রায় (কূঁয়রপুর), দেবেন্দ্রনাথ ঘটক (নড়িয়া), নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (দাসের জঙ্গল), হরিদয়াল চক্রবর্তী (মশুরা), রজনীকান্তি দাস (কার্তিকপুর) এবং আরো অনেকে। জেলখানায় অনেকে দীর্ঘদিন অনশন করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিপ্লবী সংগঠনে যোগদানের জন্যে সাড়া পড়ে যায় তরুণ ও যুবকদের মহলে। এ ব্যাপারে মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিলেন। কালিপদ রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'বিপ্লবী মহলে তখন বেশ সাড়া পড়ে যায়। অনেক পরিবারের মেয়েরা পর্যন্ত বিপ্লবী দলের সভ্য হয়েছিলেন। অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ, বন্দুক-রিভলবার ছোঁড়া, বোমা তৈরি ইত্যাদির শিক্ষাদান পুরোদমে চলতে থাকে। ভারতজোড়া সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে ভূমিকা নেওয়ার জন্য মাদারীপুর প্রস্তুত হয়ে ওঠে। স্থানীয় পরিকল্পনাও রচিত হয়। বিপ্লবী বন্ধুরা সাগ্রহে কলকাতা কেন্দ্র থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।' (স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ৩২)

মাদারীপুরের বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্যের কথা বেশ কয়েকজন বিপ্লবীর ও অন্যান্যদের লেখা গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। মাদারীপুরের চরমুগরিয়ার একটি জুট প্রেসে যুগান্তর পার্টির লোকেরা অস্ত্রক্রয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্যে ডাকাতি করতে যায়। সেখানে প্রেসের লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (এড়িকাঠি, ১৯০৮-১৯৩২) গুলিতে একজন লোক মারা যায়। সেই অভিযোগেই তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। এ বিপ্লবীর ফরিদপুর জেলজীবনের স্মৃতিচারণ করে অবণী লাহিড়ী তাঁর 'তিরিশ চল্লিশের বাংলা' গ্রন্থে লিখেছেন, "শুনলাম, মাদারিপুর সাব-ডিভিশন থেকে এসেছেন। এঁদের মধ্যে একজন আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করলেন। তিনি হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সুন্দর স্বাস্থ্য। অসাধারণ গানের গলা। সেলের ভিতরে উদাত্ত গলায় তিনি নানা গান গাইতেন, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'একলা চল রে' গানটির কথা আমার এখনও কানে বাজে। আমরা ওয়ার্ডের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ওঁর গান শুনতাম।

* * * * *

এ ঘটনার ক'দিন পরে—রাত্রে আমারা খেয়েদেয়ে যে যার ওয়ার্ডে ঢুকে গেছি, গেটের তালা বন্ধ হয়ে গেছে, হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে তাঁর সেল থেকে বের করা হচ্ছে। তিনি চিৎকার করে বলছেন, 'আমি এখান থেকে চললাম। এখানকার ফাঁসিকাঠে ঘুণ ধরে গেছে—আমার ওজন সইতে পারবে না। তাই এরা

আমাকে বরিশাল জেলে নিয়ে যাচ্ছে—ফাঁসি দিতে।...' এই সব বলতে বলতে, দু'পায়ের শেকল ঝনঝন করে বাজাতে বাজাতে তিনি গেটের দিকে চলে গলেন—সত্যিই যেন মুক্তি পেয়ে বাড়ি যাচ্ছেন।" (তিরিশ চল্লিশের বাংলা, পৃ. ৪৯-৫০)

মাদারীপুরের বিপ্লবী ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) লিখিছেন, "চোখের চিকিৎসার পর মাদারীপুর ফিরে এলাম, কোনো কাজ নেই। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই, শুধু একটামাত্র কাজ, বিকালে সভায় যাওয়া। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। মাদারীপুরের পূর্ণ দাস তখন ইংরেজ আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হত, মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনের-ষোল বছরের ছেলেদের স্বদেশীর দলে ভিড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার ওপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হল। সুভাষবাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম। গোপালগঞ্জের সেই সময়ের এসডিও, আমার দাদা খানসাহেবকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন, এ গল্প আমি পরে শুনেছি। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৯)

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে মাদারীপুরে ছাত্রদের কথায় কথায় যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'উনিশ শ পাঁচ' গ্রন্থে। এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃত করা হল,

"ছাত্র আর শিক্ষকদের ওপর পুলিশের জুলুম। যদি কোনো দুঃসাহসী ছাত্র বা শিক্ষক অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে আসে আদালতের কাছে প্রতিকারের আশায়, আদালত দ্বিগুণ করে দেয় শাস্তির মেয়াদ। আশ্বিন মাস। মাদারীপুরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন মি. ক্যাটেল, পাটওয়ালা সাহেব। সাহেবের মাথায় ছাতা নেই। কিন্তু সাহেবের সামনে দিয়ে একজন স্কুলের ছাত্র আসছিল, তার মাথায় ছাতা। সাহেব তাতে অপমানিত বোধ করলেন। উদ্ধত ছাত্রটি সাহেবের আদেশ সত্ত্বেও ছাতা বন্ধ করল না। সাহেব ছাত্রটিকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করলেন।

ক্যাটেলের বিরুদ্ধে মামলা আনা হল।

মামলায় সাব্যস্ত হল, বালকের আঘাত যদিও সত্য, কিন্তু আসলে বালকই দোষী, কেননা সে তার দুর্ব্যবহারের দ্বারা সাহেবকে উত্তেজিত করেছিল। এবং উত্তেজিত সাহেব স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ছেলেটিকে মেরেছেন। অতএব আসল দোষী ছাত্রটি। ক্যাটেল সাহেব নির্দোষ।

তাতেও কিন্তু ক্যাটেল সাহেবের রাগ পড়ল না। এবার ক্যাটেল সাহেব নিজে নালিশ করলেন। অনন্তমোহন দাস আর তার সঙ্গে তিনজন ছাত্র তাঁকে প্রহার করেছে।

স্কুলবিভাগের সরকারি কর্তা মি. স্টেপল্টন নিজে তদন্ত করতে এলেন এবং তদন্ত করে অভিযুক্ত ছাত্রদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। হুকুম দিলেন, মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের এনে প্রত্যেককে ২৫ ঘা করে বেত মারা হবে এবং প্রকাশ্যে ছাত্রদের এই শাস্তি সে স্কুলের হেডমাস্টারকে নিজের হাতে দিতে হবে।

শুধু মাদারীপুর নয়, বাংলার বিভিন্ন শহরে অনুরূপ ঘটনা ঘটতে লাগল।" (উনিশ শ পাঁচ, পৃ. ২১-২২)

১৯১২ সালে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনের জন্যে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীকে (১৮৯৩-১৯৭৩) মাদারীপুর মহকুমায় পাঠানো হয়েছিল। তিনি 'অগ্নিযুগের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন, "অনুশীলন সমিতি (তখন গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন) মাদারীপুর মহকুমায় আমাকে কাজ করার জন্য পাঠায়। পালং থানার অন্তর্গত ভড্ডা* [*ভড্ডা গ্রামটি বর্তমানে নরিয়া থানার অন্তর্গত।] গ্রামে মধ্যইংরেজি স্কুলের শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হয়ে ঐ অঞ্চলে দলগঠনের কাজে যোগ দেয়ার সুযোগ করে দেয়। সমস্ত এলাকাটাই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের এলাকা। প্রায় সকলেই কিছু জোতজমির মালিক। আবার চাকরি করেও অর্থোপার্জন করেন। এদের ছেলেরা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের গোপন দলের রিক্রুট। ভদ্রলোকেরা নিজেরাও ইংরাজ-শাসনের নিন্দায় মুখর। নিজের প্রকৃত নাম-ধাম ও পরিচয় গোপন করে সাধারণ সৎপ্রকৃতিরই একজন শিক্ষকরূপেই আমি নবীন-প্রবীণ সকলেরই প্রশংসাভাজন হয়ে পড়ি। তাতে আমার কাজে সুবিধা হল।

ভড্ডা গ্রাম থেকে সংগঠনের কাজে মাদারীপুর মহকুমার নানা স্কুলে যেতে হত। ঢাকা পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশে একটা বিশেষ কাজে আমাকে শালদ গ্রামে যাতায়াত করতে হয়। সে সময় 'শালদ'-এ একজন কুখ্যাত সি.আই.ডি. পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট আসেন। তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। বিচার-বিবেচনা করে দেখা গেল ওই পুলিশ-পুঙ্গবের উপর গুলি চালিয়ে ওখান থেকে সরে পড়া কঠিন। ছয়জন সশস্ত্র পুলিশ সর্বদা তাকে আগলে থাকত। এখানে তাকে হত্যা করার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়, আমরা ক্ষুণ্নমনে ফিরে আসি।" (অগ্নিযুগের কথা, পৃ. ৩২-৩৩)

তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের সময় যাঁরা নিগৃহীত হয়েছিলেন তার একটি বিবরণ *নব্যভারত* ১৩১৪ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্ন তা তুলে ধরা হল :

**এক.**

ক্যাটেল (Cattel) নামক এক সাহেব অনন্তমোহন দাস নামক মাদারীপুর ইংরেজি স্কুলের ৫ম শ্রেণির ছাত্রের নামে নালিশ করে যে, তাহাকে মারিয়াছে, ১৪৭ ধারা অনুসারে তাহার ৬ সপ্তাহের কঠিন পরিশ্রম সহিত জেল হয়। সাং-চরমুগরিয়া, মাদারীপুর।

## দুই.

এক মুসলমান রাজকুমার দে এবং কুমুদিনীকান্ত দে নামক ২টি ভদ্রলোকের নামে বিলাতি কাপড় কাড়িয়া নেওয়া ও তাহা পোড়ানোর নালিশ করে। ৩৭৯ ধারার বিধান মতে শ্রীমান রাজকুমার দের ১ মাস ও কুমুদিনীকান্ত দের ১৫ দিনের সপরিশ্রম জেলের হুকুম হয়। আদালতে হুকুম বহাল থাকে। উভয়ের বাড়ি সাজনপুর। থানা পালং।

## তিন.

ব্রজবাসী কাপুড়িয়া নামক এক কাপড়বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মুখটির নামে নালিশ করে যে, সে তাহার বিলাতি কাপড় লইয়া গিয়াছে। ৩৭৯ ধারার বিধান অনুযায়ী ৩ মাস সপরিশ্রম জেল ও ৫০ টাকা জরিমানা হয়। আপিলে জরিমানা বহাল ও চার দিন জেল খাটিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া খালাস পায়।

## চার.

শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মুখটি, শ্রীযুক্ত মুনসী মজাফের হোসেন বিলাতি কাপড় ও লবণ বিক্রয় বাধা দেওয়ায় ১০৭ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত যদুনাথের ৫০০ টাকা জামিন ও ৫০০ টাকার মুচলিকা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর ৫০০ টাকার জামিন, ৩০০ টাকার মুচলিকা, মুনসী মজাফর হোসেনের ২০০ টাকা জামিন ও ২০০ টাকার মুচলিকা হয়। প্রত্যেকেরই জামিন ও মুচলিকা ৬ মাসের জন্য হয়। সকলের নিবাস পালং।

## পাঁচ.

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটির উক্ত জামিনের ৬ মাস অতীত হওয়া মাত্র পুনরায় তাহাকে বিলাতি লবণ বিক্রয় হইতে বাধা দেওয়ার অপরাধে ১০৭ ধারা অনুযায়ী পুলিশ চালান দেয়—৫০০ টাকার জামিন ও ৫০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। (১ বৎসরের জন্য)

ঐ মোকদ্দমার মহেন্দ্রবাবুর সহিত মৈজদ্দিন নামক পালং হাটের ইজারাদারকেও চালান দেয়া হয়। তাহারও ২০০ টাকার জামিন ও ২০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। সকলের নিবাস পালং।

## ছয়.

শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে হাটুরিয়ার বাজারে বিলাতি লবণ বিক্রয় করিতে বাধা দেওয়ায় ২০৭ ধারামতে প্রক্যেকের ১০০ টাকার জামিন ও ১০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে।

## সাত.

বাজিতপুর স্বদেশী মোকদ্দমা। উমেশচন্দ্র বাগচি নামক এক ব্যক্তির নালিশে—

১. শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বাগচি (বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়াছেন) বাজিতপুর, ইংরেজি স্কুলের সুপারিনটেনডেন্টের ৩ মাস সপরিশ্রম কারাগার ১০০ টাকার জামিন এবং উক্ত স্কুলের ১ম শ্রেণির অপর ৩টি ছাত্র।

২. শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষ ২ মাস সপরিশ্রম ৫০ টাকা জরিমানা।

৩. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী ১ মাস সপরিশ্রম ও ৫০ টাকা জরিমানা।

৪. শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২ মাস সপরিশ্রম ৫০ টাকা জরিমানা।

**অভিযোগ :** কলেজ হইতে শ্রীযুক্ত রসিকবাবুর আদেশে উমেশ বাগচির দোকান হইতে বিলাতি চিনির প্রস্তুতীয় সোয়া পাঁচসের বাতাসা মূল্য ১ টাকা জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে মারিয়াছে।

১৪৭ ও ৩৭৯ ধারা মতে সাজা হয়। জরিমানার টাকা হইতে ১ টাকার বাতাসা নষ্ট করার জন্য বাদীকে ৩০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকবাবু আজ ৩/৪ দিন হয় জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন—বালকগণ পূর্বেই মুক্ত হইয়াছেন। (ফরিদপুরের ইতিহাস, পৃ. ৫৫১-৫৫২)

মাদারীপুরের বিপ্লবীদের অপর একটি বড় কৃতিত্ব মাদারীপুরে শান্তিসেনাবাহিনী গঠন এবং অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা। ১৯২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মাদারীপুরের বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের দল অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নীতিকে গ্রহণ করেন। পূর্ণচন্দ্র দাস তাঁর দলের সদস্যদের নিয়ে কলকাতায় গঠন করেন 'ফরিদপুর স্বরাজ্য সমিতি'। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী সংগীত গেয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করবেন। সে মতে দলনেতা পূর্ণদাস দলের সদস্যদের মাদারীপুর পাঠিয়ে ছিলেন। দলের ভার দিলেন কালীপদ রায়চৌধুরীর ওপর। নিজে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে বিদায় জানালেন। মাদারীপুর পৌঁছেই বিপ্লবীরা প্রথমে শহরের তিনটি হাইস্কুল—মাদারীপুর হাইস্কুল, ইসলামিয়া হাইস্কুল ও ডনোভান গার্লর্স স্কুল-এ ধর্মঘট করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে কালীপদ রায়চৌধুরী স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "স্কুল বর্জনের ব্যবস্থাদি এগিয়ে চলেছে। মাদারীপুর হাইস্কুলের ছাত্র এবং আগে থেকেই মাদারীপুর বিপ্লবী দলভুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী, বিজয়ানন্দ দত্ত, প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় (টেনু), তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর দাশ, চিত্তবসু প্রমুখের সহায়তায় ভেতরে ভেতরে অবস্থা এক রকম পাকা হয়ে গেলে ছাত্রদের একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করা হয়। তখনকার দিনে এ ধরনের সভায় সভাপতিত্ব করার লোক জোগাড় করাও দুঃসাধ্য, রাজনীতির গন্ধে তখন জনসাধারণ মূর্ছা যায়। ড. প্রতাপচন্দ্র গুহরায় তখন মাদারীপুরে ডাক্তারি প্র্যাকটিস

করেন। এক সময় মাদারীপুর বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্রে তাঁকে ছাত্রদের এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালাম। তিনি সানন্দে সম্মতি জানালেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে মাদারীপুর রিজার্ভ ট্যাঙ্কে দক্ষিণ দিকের খোলা মাঠে ড. গুহরায়ের সভাপতিত্বে ছাত্রদের প্রকাশ্য সভা হয়ে গেল। সভাপতির ভাষণে ড. গুহরায় ওইসব স্কুলরূপী সরকারি গোলামখানা বর্জনের জন্য ছাত্রদের অনুরোধ আহ্বান জানালেন। দেশের মুক্তিসংগ্রামে এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য ছাত্রদের প্রতি আমরাও আবেদন জানালাম। এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুল জাতীয়করণের ব্যবস্থা না-হলে ছাত্রগণ সমবেতভাবে স্কুল বর্জন করবেন এই মর্মে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যথাসময়ে উক্ত প্রস্তাবের এক কপি স্কুল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হল। তাঁরা এর কিছুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক মনে করলেন না। ফলে নির্দিষ্ট দিনে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী বিজয়ানন্দ দত্ত মাদারীপুর হাইস্কুলের গেটে দঁড়িয়ে হুইসেল বাজাতে থাকলে ছাত্ররা একসঙ্গে হুড়-হুড় করে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ে। যজ্ঞেশ্বর দাসের চেষ্টায় প্রায় একই সময়ে ইসলামিয়া হাই স্কুলেও ধর্মঘট হয়। শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তখনকার দিনে এই ধরনের স্কুল স্ট্রাইক জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল।" (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ৪১)

মাদারীপুর শহরে স্কুল বর্জনের কাজ শেষ হলে আশেপাশের গ্রামগুলোতেও ধর্মঘটের কাজ চলতে থাকে। একে-একে আমগ্রাম, চরমুগরিয়া, কুলপদ্দি, রাজৈর, খালিয়া, গোপালপুর, বাজিতপুর, কালামৃধা, ইশিবপুর প্রভৃতি স্কুলে ধর্মঘট হতে থাকে। বাদ যায় না মাইনর স্কুল, টোল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসাও। স্কুলত্যাগী ছাত্রদের নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকভাবে সফল করার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর সদস্যদের কর্মঠ, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নিয়মানুবর্তী করার জন্য তাদের নিয়মিত ড্রিল, প্যারেড, কুচকাওয়াজ ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের স্পোর্টস ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। দিনে দিনে সে তালিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাদারীপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বাড়ি ভাড়া করে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। পঞ্চানন চক্রবর্তী, বিজয়ানন্দ দত্ত, তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, যজ্ঞেশ্বর দাস প্রমুখ লেফটেনান্ট নিযুক্ত হন এবং কালীপদ রায়চৌধুরী নিযুক্ত হন কমান্ডার বা অধিনায়ক। এই বাহিনী বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের মাদারীপুর আগমন উপলক্ষে একটি জাঁকজমক সংবর্ধনা সভায় আয়োজন করা হয়। তার বর্ণনা দিয়ে কালীপদ রায়চৌধুরী লিখেছেন, "ভলানটিয়ার ক্যাম্প থেকে স্টিমার স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার দু-দিকে বড়-বড় ছাপানো পোস্টার লাগানো, স্থানে-স্থানে ফুল-পাতা সাজানো তোরণ প্রস্তুত করা ইত্যাদি ব্যবস্থা হতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আমরা স্টিমার স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টিমার থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে পূর্ণদাকে স্বাগত জানানো হল। স্টেশন প্রাঙ্গণে

ভলান্টিয়ার বাহিনী গার্ড অব অনার দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানায় এবং তাঁকে মিছিল করে শহরের ভিতর অগ্রসর হতে থাকে। বন্ধুপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ সাহা কয়েকজন সহকারী গায়ক নিয়ে দরাজ গলায় গান গেয়ে চলেন। পথে চলতে চলতে পূর্ণদা নবগঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনী সম্পর্কে আগ্রহের সঙ্গে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। অবশেষে বলেন, 'এই বাহিনীকে সুশৃঙ্খল, শক্তিশালী এক বিরাট রেজিমেন্টে পরিণত করতে হবে। স্বাধীনভারতে এই বাহিনীই হবে আমাদের ন্যাশনাল মিলিশিয়া বা জাতীয় রক্ষী বাহিনী।' ... এই ভলান্টিয়ার দলই ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে 'শান্তিসেনাবাহিনী' সমগ্র ভারতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।" (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ৪৩)

বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের আগমনে মাদারীপুরে বিশেষ কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতা থেকে আসলেন শশাঙ্কজীবন চৌধুরী, সামসউদ্দীন আহমদকে নিয়ে যতীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এলেন। ফরিদপুর থেকে এলেন নরেন্দ্রনাথ সিংহ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। শান্তিসেনাবাহিনী নিয়ে স্টিমার স্টেশনে নেতৃবৃন্দকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। মাদারীপুর শহরে বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। পূর্ণচন্দ্র দাসের অনুরোধে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন উকিল সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এ সভায় তিনি 'রায় সাহেব' খেতাব বর্জনের ঘোষণা দেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, প্রিয়নাথ বসু, হেমন্তকুমার সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে। কিছুদিন পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন গিরীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, ড. প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, সতীশচন্দ্র দে, নলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ বিহারীলাল সরকার, ড. সুধীর সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র রায়, সর্বেশ্বর রায়, বিপিনচন্দ্র দাস প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। আর প্রবীণ বিপ্লবীদের মধ্যে এ আন্দোলনে যাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বামনচন্দ্র চক্রবর্তী, কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রমোহন সাহা, বিধূভূষণ মজুমদার প্রমুখ। ফলে মাদারীপুরে অসহযোগ আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করে।

শান্তিসেনাবাহিনী দিন-দিন প্রসার লাভ করতে থাকে। পূর্ণচন্দ্র দাস শান্তি সেনাবাহিনীর এক-একটি দল নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যান। শান্তিসেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ ও সুশৃঙ্খলা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন নতুন শাখা বা কেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। এ সময় বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদানের জন্যে পাঁচশত শান্তিসেনাবাহিনীর একটি দল নিয়ে স্থলপথে মাদারীপুর থেকে বরিশাল পর্যন্ত পঞ্চাশ মাইল পথ রুটমার্চ করে যোগদান করেন। সেখানে বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসও উপস্থিত ছিলেন। শান্তিসেনাবাহিনীর সেবা ও শৃঙ্খলা নেতৃবৃন্দ ও জনগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বরিশাল সম্মেলন থেকে ফিরে এসে নতুন কর্মপ্রেরণা নিয়ে শান্তিসেনাবাহিনীর কাজ শুরু হয়। শান্তিসেনাবাহিনীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে। মাদারীপুর শহরে শান্তিসেনাবাহিনীর তিনটি সেনানিবাস স্থাপন করা হয়—শহরের মাঝখানে মূলকেন্দ্র, পূর্বপ্রান্তে পুরনো বাজারে একটি এবং পশ্চিমে

চরমুগরিয়ায় আর একটি। অবশ্য যে সব শান্তিসেনার বাসস্থান শহর বা শহরতলীতে ছিল তারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে এসেই নিয়মিত এলাকার সেনানিবাসে হাজিরা দিতেন এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। মাদারীপুর শান্তিসেনাবাহিনীর আর একটি বড় রোড মার্চ ছিল ভাঙ্গা থেকে ফরিদপুর শহর পর্যন্ত। সেখানে খালিয়া, ভাঙ্গা, কালামৃধা ও অন্যান্য কেন্দ্রের প্রায় পাঁচশত শান্তিসেনাসদস্য ছিল। সেটিতেও পূর্ণচন্দ্র দাস সঙ্গ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ছিলেন ভাঙ্গার প্রবীণ উকিল শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি ফরিদপুরের 'গ্রান্ড ওল্ড ম্যান অব ফরিদপুর' নামে খ্যাত ছিলেন। বরিশালের ন্যায় এ মার্চটিও প্রচুর উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ফরিদপুর জেলার বাইরেও শান্তিসেনাদল গঠিত হয়েছিল। কলকাতায় নন্দকুমার চৌধুরী লেনে একটি শক্তিশালী শান্তিসেনাবাহিনী গঠিত হয়। তার পরিচালক ছিলেন মাদারীপুর বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিসেনাদল গঠিত হয় রংপুর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, আসাম, মালদহ প্রভৃতি জেলায়। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন স্থানে শান্তিসেনাদল বিভিন্ন সমাবেশে যোগ দেয়। বিভিন্ন দল পৃথকভাবে শান্তিসেনাদল জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করেও প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে।

মাদারীপুর ছিল শান্তিসেনাবাহিনীর মূল কেন্দ্র। এখান থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত। এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পূর্ণচন্দ্র দাস কখনো মাদারীপুর, কখনো কলকাতায় থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করতেন। কাজের সুবিধার্থে 'মাদারীপুর স্বরাজ্য সমিতি' নামে একটি পৃথক দপ্তর খোলা হয়েছিল। শান্তি সেনাবাহিনীর অফিস সংক্রান্ত কাজ স্বরাজ্য সমিতি সম্পাদন করত। এর সভাপতি ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দাস, সহ-সভাপতি নরেন্দ্রনাথ সিংহ এবং কোষাধ্যক্ষ বা অফিসার ইনচার্জ কালীপদ রায়চৌধুরী। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, মহাত্মা গান্ধি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতা মাদারীপুর এসেছেন। কেননা বাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে থাকার গৌরব অর্জন করেছিল মাদারীপুর। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারের সময় একবার চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী কলকাতা থেকে লঞ্চে মাদারীপুর এসেছিলেন। তাঁদের 'গার্ড অব অনার' জানিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন শান্তিসেনাবাহিনী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শান্তিসেনাবাহিনীর কার্যালয়ে যান এবং পূর্ণচন্দ্র দাসের সঙ্গে আলোচনা করে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি চরমুগরিয়া গেলে সেখানেও শান্তিসেনাবাহিনী তাঁকে সংবর্ধিত করে এবং তাঁর 'তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার'-এ অর্থ-সংগ্রহে সহযোগিতা করে। দেশবন্ধু শান্তিসেনার সংগঠন ও কর্মধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়ে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর' নামে যে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন, সেখানে শান্তিসেনার একটি বড় দল এ-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সফলতা অর্জনে অবদান রেখেছিল। তার অন্যতম

পরিচালক ছিলেন শান্তিসেনার অন্যতম সুপারভাইজার পঞ্চানন চক্রবর্তী। সভা-সমাবেশ ছাড়াও শান্তিসেনাদল হরতলা পালন, পিকেটিং ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও ভূমিকা রেখেছেন। তাছাড়া চাঁদপুরে অবরুদ্ধ আসামের চা-শ্রমিকদের সেবাদানের জন্য মাদারীপুর থেকে একটি শান্তিসেনাদল ছুটে গিয়েছিল এবং তাদের সেবাদান করেছে। চরমুগরিয়ার শ্রমিক ধর্মঘটের সময় সহযোগিতা করেছে শান্তিসেনাদলের সদস্যরা। খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় আর্তের সেবায় মাদারীপুর থেকে ছুটে গিয়েছিলেন একদল শান্তিসেনা। এ দলের জীবন মিশ্র ও জিতেন দত্ত চালবোঝাই নৌকা ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করার সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় অভিভূত হয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি জীবন মিশ্র ও জিতেন দত্তকে আপ্যায়িত করেছিলেন। রিলিফের কাজ, রোগী ও আর্তের সেবা, মৃতের সৎকার, আগুন নেভানো, যাত্রাগানের আসরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও বৈষয়িক বিষয়ে শান্তিসেনাদল সহযোগিতা করতে এগিয়ে গিয়েছে। জনগণের মনও জয় করেছিল মাদারীপুরের শান্তিবাহিনী। ১৯২২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখের এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে মাদারীপুরের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংখ্যা ছয় হাজার বলে মনে করা হয়েছে। এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত শান্তিসেনাবাহিনীর কার্যক্রম অব্যাহত ছিল উল্লেখিত রয়েছে। (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ৪২-৬৭)

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কিছুদিন চলার পর স্কুলত্যাগী ছাত্রদের জন্য কংগ্রেস বাংলার বিভিন্ন জেলায় অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফরিদপুর জেলায়ও অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তারমধ্যে কয়েকটি মাদারীপুর স্বরাজ্য সমিতির সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছে। পূর্ব মাদারীপুরের (বর্তমান শরীয়তপুর) বিলাসখান গ্রামে এ ধরনের একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। 'বিলাসখান জাতীয় শিক্ষাশ্রম'-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেন, 'ফরিদপুর জেলার বিলাসখান গ্রামে আশুতোষ কাহালী, জীবন ঠাকুরতা, রাইহরণ সেন, হারাণ রক্ষিত ১৯২১ সালে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় ছিল। তাঁত-চরকা ছিল, পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এই জাতীয় শিক্ষাশ্রম অনুশীলন সমিতির একটি আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। পলাতক বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে এখানে আসিতেন। অনুশীলন সমিতির ফেরারি বিপ্লবী নোয়াখালীর ভুপেন মজুমদারের এখানে মৃত্যু হয়।'

এক সময় মাদারীপুর শান্তিসেনাবাহিনীকে সরকার বে-আইনি ঘোষণা করে এবং ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। পুলিশ শান্তিসেনানিবাস তথা স্বরাজ্য সমিতির সমস্ত-খাতাপত্র হস্তগত করে এবং কার্যালয় বন্ধ করে দেয়। স্বেচ্ছায় দলে দলে শান্তিসেনারা গ্রেফতার বরণ করেন। মফস্বল থেকেও বহু কর্মী গ্রেফতার হন। ফলে মাদারীপুর জেলখানা ভর্তি হয়ে যাওয়ায় ফরিদপুর ও অন্যান্য জেলে চালান দেয়া হয়। সেখানেও এসকল নেতাকর্মীরা বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন, সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করেন

এবং অনশন করেন। সে কারণে তাঁদের নামে বিভিন্ন মামলা হয়। বহরমপুর জেলে কয়েদিদের মধ্যে এবং বাইরে লোকের সাথে বেআইনি যোগাযোগের অপরাধে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয় : ১. পূর্ণচন্দ্র দাস (স্পেশাল ক্লাশ প্রিজনার), ২. কাজী নজরুল ইসলাম (ঐ), ৩. আফতাবুল ইসলাম (ঐ), ৪. অমলেন্দু দাশগুপ্ত (বহরমপুর কলেজের ছাত্র, শহীদ নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) এবং ৫. কালীপদ রায়চৌধুরী। সেই মামলায় পূর্ণচন্দ্র দাসকে এক মাসের লঘু কারাদণ্ড, অমলেন্দু দাশগুপ্তকে দুইমাস ও আফতাবুল ইসলামকে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। আর কাজী নজরুল ইসলাম ও কালীপদ রায়চৌধুরীকে বেনিফিট অব ডাউটে মুক্তি দেয়া হয়। অবশ্য নামে বেনামে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হয়েছে এবং সে সব চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ছদ্মনামগুলো ছিল : 'বীরেন্দ্র' বা 'দাদা' (পূর্ণচন্দ্র দাস), ইন্দু (অমলেন্দু দাশগুপ্ত), পাগল (নৃপেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী), অংশু বাবু (হিমাংশুকুমার রায় ওরফে কালা) 'বিদ্রোহী দাদা' এবং 'নরু' (কাজী নজরুল ইসলাম ), এবং কালীবাবু (কালীপদ রায়চৌধুরী)। (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ৮৫-৮৬)

## অগ্নিপথিক পূর্ণচন্দ্র দাস

১৮৮৯ সালের ১ জুন বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস মাদারীপুর (তৎকালীন ফরিদপুর) জেলার সমাজ-ইশিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাশীনাথ দাস। অষ্টম মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি শিশুকাল থেকেই ক্ষীণদেহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি ছিল আকর্ষণীয়। সকলকেই টানতে পারতেন। স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁর লেখাপড়া দেরিতে শুরু হয়। শিশুকালেই তিনি পরাধীন স্বদেশের গ্লানির কথা শুনেছেন। শুনেছেন ফরিদপুরের নামকরা উকিল ও স্থানীয় জমিদার অম্বিকাচরণ মজুমদারের (সেনদিয়া, ১৮৫১-১৯২২) কথা। মজুমদার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'পিপল্‌স এসোসিয়েশন'। পরবর্তীকালে তা ভারতসভার সংগে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রথম সারির আন্দোলনকারী। পূর্ণচন্দ্রের দাদা মহাত্মা অম্বিকাচরণ মজুমদারের আমলা ছিলেন। তাই পূর্ণচন্দ্র তাঁর দাদার কাছে মাদারীপুর-ফরিদপুরের সংগ্রামের কথা শুনেছেন এবং অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তখন মাদারীপুর-ফরিদপুরের ব্রতী সমিতিও গড়ে উঠেছে। তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলনে টানারও চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯০৮ সালে তিনি মাদারীপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পাঠক কান্দি থেকে তিনি স্কুলে যাতায়াত করতেন। তখন মাদারীপুরের তরুণ যুবকেরা পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন পাড়ায় খেলাধুলা ও পাঠচক্রের আয়োজন শুরু হয়েছে। কালীপদ রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'কালীপদদা, নীরেনদা ছিলেন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়। খেলাধুলায় তাঁদের উৎসাহ ছিল অসীম। তাঁদের সহযোগিতায় আমরা পাড়ার ছেলেরা মিলে 'মধ্যপাড়া স্পোটিং ক্লাব' নাম দিয়ে একটি খেলাধুলার সংস্থা গঠন করেছিলাম। আমাদের বাড়ির সুরেন ও

কেশবলাল এ বিষয়ে খুব উদ্যোগী ছিলেন। সবাই মিলে মহানন্দে ফুলবল, ক্রিকেট, হাডুডু ইত্যাদি খেলতাম। কালীপ্রসাদদার পরামর্শে আমাদের বাড়িতে একটি ছোটখাট গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলাম 'আর্য লাইব্রেরি' নাম দিয়ে। এই লাইব্রেরিতে গীতা, চণ্ডী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ লিখিত ধর্ম পুস্তকাদি, বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*, *দেবীচৌধুরাণী* ইত্যাদি উপন্যাস, রমেশচন্দ্র দত্তের *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত*, *রাজপুত জীবন সন্ধ্যা*, *টডের রাজস্থান* ইত্যাদি ইতিহাসের বই যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ইটালির জাতীয় নেতা ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি প্রমুখ দেশপ্রেমিককের জীবনবৃত্তান্ত, সিনফিন আন্দোলন, ফরাসি বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ে লেখা বহু দুস্প্রাপ্য বইও ছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের *দেশের কথা* (তখন নিষিদ্ধ) এবং আরো অনেক দেশাত্মবোধক পুস্ত কাদি দ্বারা আমাদের আর্য লাইব্রেরি ভরপুর হয়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকাটির আমরা নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম।"(স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, কালীপদ রায়চৌধুরী, পৃ. ২০-২১)

পূর্ণচন্দ্র দাস স্থানীয় বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে খেলাধুলায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের নিয়েই স্থানীয়ভাবে দল গঠন করেন। তিনি ছিলেন দলনেতা। খেলাধুলা ও ধর্মের ছলে তিনি বেশ কিছু ছেলেকে তাঁর দলে টানতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজরঞ্জনগুহ, কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, বীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার চৌধুরী প্রমুখ অন্যতম। তারপর ১৯১০ সালে পূর্ণচন্দ্র দাস ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। তখনও তিনি মাদারীপুর যাতায়াত করতেন, গোপন বিপ্লবী দল পরিচালনা করেছেন। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি এবং মনিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকে সারাদেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এবং অনুশীলন দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পূর্ণচন্দ্রদা কলকাতায় যাবার পর আরো বেশি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পান। আবার মাদারীপুর বিপ্লবী দলের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। মাঝে মাঝে মাদারীপুরও আসা-যাওয়া করতেন। এ সময় তিনি কলেজের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সে সময়কালের স্মৃতিচারণ করে কালীপদ রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'কালীপ্রসাদদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পূর্ণদা (দাস) তখন মাঝেমধ্যেই আমাদের বাসায় আসতেন এবং কালীপ্রসাদদার পড়ার ঘরে বসে নিরিবিলিতে অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ফিরে যাবার সময় আমাদের পড়ার সিটে এসে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব, হাসি-কৌতুক করে বিদায় নিতেন। তিনি তখন কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র এবং মাদারীপুর বিপ্লবীদের নেতা। আর কালীপ্রসাদদা ছিলেন স্থানীয় সংগঠক। তিনি মাদারীপুর হাইস্কুলে পড়তেন আর লোকচক্ষুর অন্তরালে দল সংগঠন চালিয়ে যেতেন।' (স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১৮-১৯)

১৯১৩ সালে মাদারীপুর বা ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্র দাস তাঁর অনেক সঙ্গীসাথীসহ গ্রেফতার হন। সাক্ষীপ্রমাণের অভাবে সকলেই মুক্তিলাভ করেন। এ মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ (১৮৯৬-১৯৪১) বা বিনোদসাধু। তিনি ছিলেন বাজিতপুর গ্রামের অধিবাসী। সে সময়কার বিপ্লবী আন্দোলনের বিবরণ দিয়ে কালীপদ রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'ফরিদপুর মামলা থেকে মুক্তি লাভের পর মাদারীপুরের বিপ্লবী বন্ধুরা অনেকে মাদারীপুর ছেড়ে গেলেন। কালীপ্রসাদদার স্কুলের পড়াশুনা আগেই ঘুচে গিয়েছিল। চিত্তদা, নীরেনদা ও মনোরঞ্জন স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে পড়াশুনার অজুহাতে কলকাতা চলে যান এবং সেখানেই রাজনৈতিক কাজকর্ম আরম্ভ করেন। কলকাতাই তখন পূর্ণদা, কালীপ্রসাদদা তথা মাদারীপুর দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে। মাদারীপুরে সুরেন সাহা ও আমি পুলিন গাঙ্গুলি, দীনেশ ও তার এক ভাইপো, মহেন্দ্র গুহ মাস্টারের দুই ছেলে, কেশব কুণ্ডু, কেশব রায়চৌধুরী, শরৎ সাহা, তারকেশ্বর সাহা প্রমুখকে নিয়ে আমাদের কলকাতা কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে কাজকর্ম চালিয়ে যাই।' (স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ২৯)

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী দল একযোগে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রেও পূর্ণ দাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সে স্মৃতিচারণ করে কালীপদ রায়চৌধুরী লিখেছেন, '১৯১৪, জুলাই মাস্তপ্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। ইংরেজ ও জার্মান দুই প্রধান প্রতিপক্ষ। ভারতে ইংরেজ সরকার বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত। ভারতে বিপ্লবের পক্ষে এই-ই প্রকৃষ্ট সময় ও সুযোগ। মহান বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন, "Their difficulty is our opportunity. বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ যখন জড়িয়ে পড়বে, তখন ভারতের ওপর তার মুঠোর জোর কমে আসবে।" যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবীদল একযোগে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে ব্যাপৃত হলেন। তখন সর্বদা যতীন্দ্রনাথের পাশে থেকে কাজকর্ম করার জন্য তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণ দাস আমাদের বিপ্লবীবন্ধু চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্র দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনকে যতীন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করেন।' (স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১১৯)

সম্মুখযুদ্ধে বাংলার এসব বিপ্লবীদের আত্মদানের গৌরবগাঁথা ইতিহাসে উল্লেখিত রয়েছে। পূর্ণচন্দ্র দাস তার আগেই ১৯১৪ সালে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলে ছিলেন। তখন মাদারীপুরে বিপ্লবী আন্দোলনও অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। আর পরবর্তীকালে তিনি ও তাঁর দলের অধিকাংশ সদস্য গান্ধিজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি মাদারীপুরে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তারই সর্বাধিনায়কত্বে মাদারীপুরে শান্তিসেনাবাহিনী গঠিত হয় যা অসহযোগ আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। এক পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলনকালে তিনি আটক হলেন। তার বিবরণ দিয়েছেন কালীপদ রায়চৌধুরী।

তিনি লিখেছেন, 'করাচিতে ১৯২১-এর জুলাই মাসে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনে ভারতের মুসলমানদের ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সামরিক বিভাগ থেকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই প্রস্তাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় মুসলিম নেতা মৌলানা মহম্মদ আলি, সৌকত আলি ও ড. কিচলুকে গ্রেফতার করা হয় (সেপ্টেম্বর ১৯২১) এবং করাচি কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা চলতে থাকে। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে পূর্ণদা মাদারীপুর কালিবাড়িতে জনসভা আহ্বান করে সেই সভায় নিজেই করাচি প্রস্তাব পাঠ করেন এবং তাঁর সঙ্গে সমবেত জনতা কর্তৃক তা সমস্বরে পঠিত (২৭ অক্টোবর) হয়। এই অপরাধে পূর্ণদাকে গ্রেফতার করে ফরিদপুর জেলে চালান দেওয়া হয়। তাঁর গ্রেফতারের প্রতিবাদে মাদারীপুরে প্রবল বিক্ষোভ সঞ্চার হয়। নানাস্থানে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হয়। কোর্টে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি। বিচারে তাঁর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। (স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১১৮)

১৯২৩ সালে তিনি আর একবার গ্রেফতার হন। মুক্তিলাভের পর তাঁকে মাদারীপুরে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'এসো অষ্টমী পূর্ণচন্দ্র, এসো পূর্ণিমা পূর্ণচাঁদ...' অভিনন্দন সূচক কবিতাটি পাঠ করা হয়। তিনি জেলে থাকা কালে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫?) সঙ্গে। ১৯৩৯ সালে তিনি নেতাজীর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদেন। দেশভাগের পর তিনি দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করেন। জীবনের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে অনেকটাই অমিল থেকে যায়। তারপর তিনি কলকাতায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হয়ে বাস্তুহারাদের কল্যাণে তৎপর হন। ১৯৫৬ সালের ৪ মে বালিগঞ্জ এক প্রাক্তন বিপ্লবীর ছুরিকাঘাতে তিনি মারা যান। পরিসমাপ্তি ঘটে এক নিরন্তর অগ্নিময় বিপ্লবী জীবনের।

একজন বিশিষ্ট বিপ্লবীর দৈহিক কাঠামো সাধারণত যেমনটা ভাবা হয় পূর্ণচন্দ্র দাসের দৈহিক কাঠামো তেমনটা ছিল না। তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'পূর্ণচন্দ্র দাস স্মরণে' তাঁর দৈহিক অবয়বের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "বাল্যে, কৈশোরে, সমবয়সী ছাত্রদের তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন; যৌবনে ছিলেন যুবনেতা, প্রৌঢ় বয়সে জননেতা। তাঁর যৌবনে পূর্ণ কর্মোদ্যমের সময় দেহটি ছিল অতিকায় ক্ষীণ, অস্থিচর্মসার, অনেকটা 'পথের দাবী'-তে বর্ণিত গিরিশ মহাপাত্রের মতো। এই কঙ্কালসার দেহটি ছিল ব্যাধির মন্দির। অ্যাজমা, পাইলস, ক্রনিক ডিসেন্ট্রি, ডিওডেনাল আলসার ছিল নিত্য সহচর। রোগের ঔষধ নেই, উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন। অবয়বের মধ্যে দুটো চোখ ছিল একমাত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—যা রাতের অন্ধকারেও জ্বলন্ত বলে মনে হত।" (স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১১৬)

পূর্ণচন্দ্র দাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির বর্ণনায় তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "বিপ্লবী মাত্রেই নির্মম, নৃশংস, খুনি ডাকাত— আমাদের দেশে এক সময় জনসাধারণের এই-ই ছিল বদ্ধমূল ধারণা। সেই বিপ্লবী যুগে

পূর্ণদাকে যাঁরা কখনো চোখে দেখেননি, তাঁদেরও মুখেও পূর্ণদার ভীষণ নিষ্ঠুর কাণ্ডকারখানার অনেক আজগুবি ও হাস্যকর কাহিনী শোনা যেত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দীর্ঘ, ঋজু, শীর্ণ দেহটির মধ্যে ছিল একটি প্রশস্ত, উদার, মমতাভরা মন। তাঁর কথাবার্তা, কাজকর্ম, বিভিন্ন সময়ে লেখা চিঠিপত্র থেকেও তাঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কখনো তিনি স্বামী বিবেকানন্দ'র বাণী উদ্ধৃত করে লিখতেন, কখনো বেদান্তের কথা উল্লেখ করতেন। কতবার লিখেছেন এবং মুখেও বলেছেন, "দেখো, আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলেছি, সে 'দেশ' অর্থ কি শুধুই দেশের মাটি, পাহাড় জঙ্গল? তা নয়, 'দেশ' অর্থ দেশের মানুষ। এই মানুষের কল্যাণসাধনই আমাদের ব্রত। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষকে আমরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।" এই ছিল পূর্ণচন্দ্রের অন্তরের আসল রূপ, তাঁর আদর্শ।' (স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১১৮)

অগ্নিপথিক পূর্ণচন্দ্র দাস ৬৭ বছর বেঁচেছিলেন। তারমধ্যে ৪৮ বছর কেটেছে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এবং মানবকল্যাণ সাধনে। তাঁকে নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয়নি। তাঁর জীবনকালে বা তারপরে। কেননা ১৯৪৫ সালে তাঁর প্রিয়নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানে তিনি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। রাজনীতি থেকেও গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে যা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। তবে তাঁর মৃত্যুর ১১ বছর পর ১৯৬৬ সালে মাদারীপুর বিপ্লবীদল ও শান্তিসেনার জীবিত সদস্যদের রচনার একটি সংগ্রহ 'পূর্ণ দাস স্মরণে' প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সব স্মৃতিমূলক লেখায় তাঁর জীবনের মূল্যায়ন সেভাবে প্রকাশ পায়নি। অবশ্য সেখানে তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী-সুহৃদদের লেখায় তাঁর জীবনের অকৃত্রিম গুণ ও অনেক কৃতিত্বের কথা

প্রকাশ পেয়েছে। কেউ বলেছেন, "পূর্ণদাস ছিলেন সর্বাধিনায়ক বলে স্বীকৃত। কোনো পদের অধিকারী না-হয়েও তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী; অনেকটা 'পথের দাবী'-র সব্যসাচীর মতো।" মাদারীপুরের বিপ্লবীদল বা পরবর্তীকালে শান্তিসেনাবাহিনীর সদস্যদের কাছে পূর্ণচন্দ্র দাসের কথাকে বেদবাক্য মনে করা হলেও তা ছিল পূর্ণচন্দ্র দাসের ওপর গভীর আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ ও প্রীতির কারণে। কেননা কর্মীরা তাঁর বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর চোখদুটো সকলকেই আকৃষ্ট করে রাখত। তাঁর একজন সাথি বলেছেন, "এ জন্যই তাঁরা বিনাবাক্যব্যয়ে পূর্ণচন্দ্রের নির্দেশ পালনে ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। এক মহৎ ও শক্তিশালী দলের সর্বময় নেতৃত্বে তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কখনো আদেশের সুরে বা ভঙ্গিতে কথা বলতে শুনিনি। ...তাঁর কাছ থেকে এতটুকু কাজের ইঙ্গিত পেলে কর্মীরা কৃতার্থ হয়ে যে কোনো বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিলেন।" (স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ১১৭)

বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের দিকটি হল বাংলার মহান বিপ্লবী বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়িবালাম নদীর তীরে প্রথম সশস্ত্র অসমযুদ্ধে যে পাঁচজন বিপ্লবী অমিত শক্তিতে যুদ্ধ করেছেন, তাঁর মধ্যে তিনজন ছিল তাঁরই একান্ত অনুগামী ও বিশ্বস্ত সহযাত্রী। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জীবনের প্রারম্ভে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন রক্তবিপ্লবের দুর্গম পথে। তিনি গড়ে তুলেছিলেন মাদারীপুর বিপ্লবীদল। তাঁর বীরত্বগাঁথা রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে মাদারীপুর, কলকাতার বেলেঘাট, হেদুয়ায়, ধলেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে। তারপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আন্দোলনের পর আন্দোলন এসেছে। প্রতিদিন প্রতিটি পর্যায়ে পূর্ণচন্দ্র দাস অমিত বিক্রমে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। সেখানে সফলতা ব্যর্থতা, রাজনীতির সফলতা, দুর্বলতা নিয়ে কথা থাকতেই পারে। তবে এ কথা বলা কোনোমতেই অতিরঞ্জিত হবে না, যে-আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করে, যে সাহস নিয়ে বিপ্লবী কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁর দলবল নিয়ে তা নিতান্তই অর্থহীন বা বাস্তবতা বিবর্জিত ছিল না।

বরং তাঁদের আত্মত্যাগ এবং শত শহীদের জীবনের বিনিময়ে সেদিন তাঁরা আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সারণি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ জন্যে পূর্ণচন্দ্র দাসদেরও স্মরণ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুরের এ-সব বীর সূর্যসৈনিকদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বীরপ্রসবিনী মাদারীপুরের জয় হোক। শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

## সহায়ক গ্রন্থ


১. *স্বাধীনতাযুদ্ধে মাদারীপুর* (স্বাধীনতা সংগ্রামী কালীপদ রায়চৌধুরীর আত্মজীবনী), সংকলন ও

সম্পাদনা-বরুণ রায়চৌধুরী

২. *জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*-ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ

৩. *তিরিশ চল্লিশের বাংলা*-অবণী লাহিড়ী

৪. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-শেখ মুজিবুর রহমান

৫. *অগ্নিযুগের কথা*-সতীশ পাকড়াশী

৬. *ফরিদপুরের ইতিহাস;* আনন্দনাথ রায়; সংগ্রহ ও সংকলন-কমল চৌধুরী

৭. *ফরিদপুরের ইতিহাস* : আনন্দনাথ রায়-সম্পাদনা ড. তপন বাগচী

৮. *উনিশ শ পাঁচ*-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

৯. *আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী*-শ্রীমতিলাল রায়

১০. *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

# প্রতিক্রিয়াশীলতা, আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে

................................................................

সি রা জু ল  ই স লা ম  চৌ ধু রী

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের উৎসাহটা নানা ঐতিহাসিক কারণে ও ঘটনাপরম্পরায় গড়ে উঠেছে। এই সাহিত্য আমাদেরকে যে গভীর আনন্দ দিয়েছে সে-বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। এ কথা মানতেই হবে যে, বাংলাভাষী মানুষ ইংরেজি চর্চায় যে-পরিমাণ উৎসাহ, শ্রম ও সাধনা নিয়োগ করেছেন তা যদি মাতৃভাষার চর্চায় ব্যয় হত তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে লেখা হত। এর মূল কারণটা সাহিত্যিক নয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। ওই দুই সূত্রেই সূচনা, সূচিত পরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ইংরেজি ভাষা আমাদের মানসিক গবাক্ষ, লোকপ্রসিদ্ধ এই উপমাটি অযথার্থ নয়। এই জানালা দিয়ে আমরা জগৎ দেখি। ওই ভাষার চন্দ্র-সূর্য-জোনাকির আলো কখনো আমাদের আলো দিয়েছে, কখনো দিয়েছে চোখ ধাঁধিয়ে।

কিন্তু আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকলে প্রতিক্রিয়াশীলতার যে-উপাদানগুলো চোখে পড়বে সেগুলো সম্পর্কে বোধ করি সচেতন হওয়ার আবশ্যকতা আছে।

সঙ্কোচ না-করে উদারনীতিক সাহিত্যসমালোচক লায়োনেল ট্রিলিঙ সরাসরিই উত্থাপন করেছেন অভিযোগটা, তাঁর Beyond Culture বইতে। অভিযোগটা এই যে, আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের পাঠকেরা যতটা উৎসাহের সঙ্গে উদারনীতির দিকে এগুচ্ছেন, সাহিত্য-স্রষ্টারা প্রায় ততটা উৎসাহেই ছুটছেন প্রতিক্রিয়াভিমুখ। পাঠক যাচ্ছেন এগিয়ে, লেখক আসছেন পিছিয়ে। ট্রিলিঙের এই অভিযোগ কিন্তু ভিত্তিহীন নয়।

ডবু. বি. ইয়েট্স্ (১৮৬৫-১৯৩৯), এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২), টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) এবং যোসেফ কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪), জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) ও ডি.এইচ. লরেন্সের (১৮৮৫-১৯৩০) উদাহরণ যদি নিই আমরা, তবে দেখতে পাব এই অসাধারণ লেখকেরা কত দূরবর্তী পরস্পরের; তবে, একই সঙ্গে, আবার দেখব ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পর-ঘনিষ্ঠ তাঁরা, তাঁদের অন্তর্গত, কেন্দ্রীয় প্রতিক্রিয়াশীলতায়। এই অসামান্য লেখকেরা সামান্য এইখানে। পরস্পরিক দূরত্ব ও

বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার নিয়ামক ঐক্যের সূত্রদ্বারা গ্রন্থবদ্ধ। তাঁরা একজন অপরজন থেকে ভিন্ন কোন্ দিকে দিয়ে তা দেখামাত্রই খেয়াল করা যায়। কোনো দু'জন বড় লেখকই যে এক ধরনের হন না, এ নিরিখ তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বটে। এঁদের প্রথম দল কবি। দ্বিতীয় দল ঔপন্যাসিক। পাউন্ড-এলিয়ট এসেছেন আমেরিকা থেকে, ইয়েট্‌স-জয়েস আয়ারল্যান্ডের। পোলান্ডের কনরাড নিজের চেষ্টায় ইংরেজি লেখক হয়েছেন, কিন্তু ইংরেজ হতে পারেননি। ইংলন্ডের লরেন্স পৃথিবীর নানান দেশে সময় কাটিয়েও আপন ইংরেজত্ব ঘুচাতে পারলেন না। এঁদের কেউ ধর্মে বিশ্বাস করেন-যেমন এলিয়ট ও লরেন্স; কিন্তু সেক্ষেত্রেও এলিয়টের ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার লরেন্সের তুলনায়; লরেন্স তো ধার্মিকই নন এলিয়টের মতে। পাউন্ড চাইছেন শিল্পকে ধর্মের শূন্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন, ইয়েটসের অভীপ্সা লোক-সংস্কৃতির নানাবিধ উপাদান-সমন্বয়ে এক আধিদৈবিক জগৎ গড়ে তুলবেন। জয়েসের আস্থা নেই ধর্মে, আস্থা নেই জাতীয়তাবাদেও; তাঁরই স্বদেশবাসী ইয়েট্‌স থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র তিনি উভয়ত। ধর্মের অতিরিক্ত আদর্শবাদিতার মধ্যে কনরাড ব্যক্তির ওপর নিপীড়ন লক্ষ করেছেন। এই লেখকদের কেউ অভিজাত (কনরাড), কেউ-বা অভিজাততন্ত্রে বিশ্বাসী (ইয়েট্‌স্), কেউ অনস্বীকার্যরূপে শ্রমিকশ্রেণির (লরেন্স); এবং অপর তিনজন যেমন অবস্থানে তেমনি চিন্তা-চেতনায় মধ্যবিত্ত। তাঁদের মধ্যে একদল রোমান্টিক (ইয়েট্‌স্, কনরাড, লরেন্স), বিপরীত দল ক্ল্যাসিসিজমে বিশ্বাসী (পাউন্ড, এলিয়ট, জয়েস)। লেখার রীতিতে কেউ অতিরিক্ত সংযমী, কেউ অতিউৎসাহী, কেউ-বা মধ্যপন্থী। কিন্তু সকল বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এক জায়গায় এক তাঁরা-তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীলতায়। তাঁরা সকলেই আধুনিক এই সত্যের চেয়ে খাটো নয় তাঁদের রচনায় প্রতিক্রিয়াশীলতার নানাবিধ উপাদানের বিদ্যমানতা।

প্রতিক্রিয়াশীলতা অর্থটা কী? এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার অর্থ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও সহনশীলতার বিরোধিতা এবং সমাজবিজ্ঞানীরা যে সামাজিক বিপ্লবের কথা বলেছেন তাকে যেমন করে পারা যায় প্রতিহত করবার চেষ্টা। অর্থাৎ সামনে না যেয়ে পেছন দিকে চলা, বৈজ্ঞানিকতাকে পরিহার করে অবৈজ্ঞানিকতাতে আশ্রয় খোঁজা, ফ্যাসিবাদ ও নৈরাশ্যের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করা। এক কথায়, ইতিহাসের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা। শুধু ঠেকিয়ে রাখা নয়, পারলে ইতিহাসের চাকাকে পেছনমুখো ঘুরিয়ে দেয়া।

যে কয়জন প্রধান লেখকের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তাঁদের রচনায় এই প্রতিক্রিয়াশীলতার চিত্রসমূহ খুব সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত। রানী ভিক্টোরিয়ার যুগ যখন অবসন্ন অবসানের দিকে এগিয়ে আসছে তখন ইংরেজি সাহিত্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। পরিবর্তনের লক্ষণগুলো লুকিয়ে ছিল না। এবং সেগুলো হঠাৎ করে, আকস্মিকভাবে, আপতিক ঘটনা হিসেবে আসেনি। সাহিত্যের ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা গড়ে উঠছিল। কবিতাতে টেনিসনের দৃষ্টিতে যে 'সমন্বয়' একদা সম্ভব মনে

হচ্ছিল তা টেনিসনের পরবর্তী লেখকদের (এবং পাঠকদেরও) কাছে আর সম্ভব মনে হয়নি। সমাজের অস্থিরতা ঔপন্যাসিকদের লেখায় সরাসরি এসে গিয়েছে। গদ্য রচনায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা কার্লাইল করেছেন, আর্নল্ড করেছেন। মার্কস যদিও ইংরেজ নন তবু তিনি ইংল্যান্ডে থেকেই তাঁর বৈপ্লবিক রচনা সৃষ্টি করছিলেন। এঙ্গেলসও তাই। ডারউইনের তত্ত্ব ইতিপূর্বেই প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়েছিল ধর্মবিশ্বাসীদের চিত্তগৃহে। কবি-তাতেও প্রি-রাফেলাইটরা কল-কারখানা ও ব্যবসায়-নিয়ন্ত্রিত বুর্জোয়া সমাজের দুর্বিষহ সৌন্দর্যহীনতার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য বিরূপ ধ্বনিসমূহ উত্থাপন করছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী যতই অগ্রসর হতে থাকল বিংশ শতাব্দী অভিমুখে, সাহিত্যের পরিবর্তনগুলোও ততই প্রকট হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনের মূল কারণটা সাহিত্যিক নয়, অর্থনৈতিক। পুঁজিবাদের স্ববিরোধসমূহই সাহিত্যে প্রকাশিত হচ্ছিল, যেমন হচ্ছিল সমাজ-সংস্কৃতির আরো বহুবিধ ক্ষেত্রে।

সাহিত্যে পরিবর্তনের একটি চিহ্নের কথা মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক আর্নল্ড কেট্ল উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আধুনিক কালে দেখা যাচ্ছে যে বড় লেখকরা আর জনপ্রিয় লেখক নন। এ এক নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঘটনা। এতকাল বড় লেখক ও জনপ্রিয় লেখক ছিলেন অভিন্ন। বড় হলেই জনপ্রিয় হতেন। কিন্তু এখন, বিংশ শতাব্দীতে চোখে পড়ছে যে, যাঁরা বড় লেখক তাঁরা শত সহস্র মানুষের চিত্ত একসঙ্গে জয় করে নেবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা মোটেই নেই। এটাই-বা কেন ঘটছে? ঘটছে এই জন্য যে লেখক-পাঠকে এমন একটা বিচ্ছিন্নতা এ কালে দেখা দিয়েছে যা আগের কালে ছিল না। গজদন্ত মিনারের কথা আগেও শুনেছি আমরা, টেনিসন তাঁর শিল্পের রাজপ্রাসাদের কথা বলেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে ঐ প্রাসাদ ত্যাগ করে লোকালয়ে চলে যাবেন তিনি-অনুতপ্ত চিত্তে। বিংশ শতাব্দীর লেখকের পক্ষে গজদন্ত মিনারবিলাস আর সম্ভব নয়, রাজপ্রাসাদ অবান্তর কল্পনা, তিনি তাঁর ছোট কামরাতেই থাকেন; তবু তিনি বরঞ্চ অধিক বিযুক্ত চারপাশের মানুষের কাছ থেকে। কেননা তাঁর আছে আত্মকরুণাবোধ। আছে নিঃসঙ্গতার চেতনা। আত্ম-করুণা এই জন্য যে, তাঁকে কেউ বুঝছে না, অধিকাংশ মানুষই বর্বর, অশিক্ষিত, তারা শিল্পের নামে উত্তেজনা চায়, গভীর আনন্দ চায় না। এটা আদৌ মিথ্যা কথা নয় যে, আধুনিক কালে তথাকথিত গণ-মাধ্যমগুলোর তৎপরতায় এক ধরনের মাস্ কালচারের উদ্ভব হয়েছে যা সূক্ষ্মতার শত্রুপক্ষ। এমনটা যে ঘটবে তা ওয়ার্ডসওয়ার্থ একশ' বছর আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। কবির সে দেখা মিথ্যা হয়নি। কিন্তু আত্ম-করুণায় দগ্ধ লেখক যতই ইচ্ছা করেন নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন মানুষের সংশ্রব থেকে ততই বাড়ছে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীলতা, ততই নীরক্ত হচ্ছে তাঁর সাহিত্য। অন্যদিকে লেখক ভাবেন তাঁর দুঃখ কেউ বোঝে না, বুঝবে এমন মানুষ নেই সমাজে। তখন আসে নিঃসঙ্গতাবোধ, আসে বিষাদ-চেতনা। অর্থাৎ কিনা, লেখক বন্দি হয়ে পড়েন ছোট কামরাতেই, তাঁর বৃহৎ আবেদন থাকে না, বৃহৎ সমাজকে তিনি প্রভাবিত করবেন এমনটা ঘটে না। তিনি

বাহুল্য হয়ে পড়েন সমাজের জন্য। যে ছয় জন প্রধান লেখকের উদাহরণ নিয়েছি আমরা, তাঁদের মধ্যে এক লরেন্স ভিন্ন অন্য সকলেরই জনপ্রিয়তা ছিল সীমিত। ইয়েট্স্ সহজবোধ্য কবি নন, যত তিনি অগ্রসর হয়েছেন কবি হিসেবে, শিল্পে যত বৃদ্ধি পেয়েছে উৎকর্ষ ততই অসহজবোধ্য হয়েছেন তিনি; তাঁর উপমা-উৎপ্রেক্ষা ততই জটিলতা লাভ করেছে। শেষ বয়সে ইয়েট্স্ ভেবেছেন জনপ্রিয়তাহীনতাতেই রয়েছে আভিজাত্য। পাউন্ড তো জনপ্রিয়তা অর্জনের কথা ভাবেনইনি। তিনি সকলের কবি নন, কবিদের কবি। ইমেজিস্টদের জন্য A Few Dont's-এ বলেছেন তিনি, "It is better to present one Image in a life time than to produce voluminous works": এই উক্তির মধ্যে যে শুধু শিল্পে আত্মনিবেদনের কথা আছে তা নয়, এক ধরনের জীবনবিমুখতাও আছে। অনেক লেখার আবশ্যকতা নেই-এমন বক্তব্যের পেছনে উন্নাসিকতা কার্যকর। তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি জীবনকে প্রভাবিত করতে চান না, শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি চান। শিল্পের বিশুদ্ধতায় অর্থাৎ সমাজনিরপেক্ষতায় আস্থাশীল তিনি। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি দেশের মানুষের বিরুদ্ধে (তথা মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে) প্রচারকার্য চালিয়েছেন, মুসোলিনির ইটালি থেকে-বেতারে। ফ্যাসিবাদের পক্ষে প্রচারক ছিলেন তিনি, বিপুল জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এলিয়টও জটিল, অসহজবোধ্য কবি। তাঁর জীবনদর্শনও উদার নয়। তাঁর শিল্প উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করে না। পাউন্ডের মতো তিনিও ক্লাসিসিস্ট, তিনিও আঙ্গিকের শিল্পগুণকে অধিক গুরুত্ব দেন বক্তব্যের তুলনায়। স্টাইল ও ফর্ম নিজেরাই মূল্যবান হয়ে ওঠে। জয়েস বা কনরাড কেউই লোকপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন না; তাঁদের বই কখনো তেমন কাটেনি, যেমন কেটেছে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ডিকেন্সের উপন্যাস। তাঁদের আঙ্গিকে জটিলতা ও বক্তব্যের কাঠিন্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হয়নি। তুলনায় লরেন্স অনেক বেশি রোমান্টিক, অনেক বেশি উদাত্ত, অনেক বেশি চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী লেখক ছিলেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল পাঠকের পক্ষে ভীতিজনক। পাঠককে তিনি প্রায়শই আহ্বান করতেন সম্মুখযুদ্ধে। প্রভাবিত করতে চাইতেন, চাইতেন বদলে দিতে। জনপ্রিয়তা যাঁদের প্রধান আরাধনা তাঁরা এমনটা করেন না, পারেন না করতে।

লরেন্স বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে এক ধরনের আত্মসচেতনতা লক্ষ করেছেন। এই আত্মসচেতনতা বুর্জোয়াদের বৈশিষ্ট্য। তারা নিজেদের নিয়ে ভাবে সর্বসময় এবং আত্মভাবে নিষ্পিষ্ট থাকে সর্বসময়ে। এর ফলে অন্য কাউকে ভালোবাসা, অন্যের জীবনে প্রবেশ করা-সে আর তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কোনো বুর্জোয়া ব্যক্তি যখন প্রেমে পড়ে তখন অন্য একজন মানুষের সঙ্গে প্রেমে পড়ে না, নিজেরই একটা ধারণার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, প্রেম প্রেম খেলা করে। প্রেমিকাও তা-ই, সে-ও বন্দি আত্মসচেতনতার অতিবদ্ধ কামরায়। ফলে নিজেদের বাইরে, উদার উন্মুক্ত কোনো প্রান্তরের বা প্রাঙ্গণের নিরপেক্ষ এলাকায় যে তারা মিলিত হবে তা আর সম্ভব হয় না। পাউন্ড, এলিয়ট, জয়েস বুর্জোয়া সমাজের সাংস্কৃতিক মুখপাত্র, এঁদের চিন্তা-

চেতনায় আত্মসচেতনতা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো পরিব্যাপ্ত। যা-ই লিখেছেন শিল্পবিচারে সুন্দর হয়েছে; কিন্তু নৈতিক বিচারে আত্মসচেতনতার দ্বারা, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার মানসিকতার দ্বারা গভীরভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। চিন্তা-চেতনায় ইয়েট্‌স্ বুর্জোয়া নন, তিনি অভিজাততন্ত্রের সমর্থক, তাঁর জগতে জমিদার থাকবে আর থাকবে কৃষক, থাকবে না মধ্যবর্তী মধ্যবিত্ত। শেষ জীবনে ইয়েট্‌স্ যে একটা টাওয়ার কিনেছিলেন বসবাস করবার জন্য সেই বাস্তবিক ঘটনা প্রতীকের মতো তুলে ধরে তাঁর মানসপ্রবণতার সত্যকে। অর্থাৎ তিনিও জনসাধারণের নিকটবর্তী নন, বুর্জোয়াদের প্রতি বিদ্বিষ্ট বটে, কিন্তু সামন্তবাদের প্রতি আসক্ত। যে রোমান্টিক আয়ারল্যান্ড তাঁর অন্বিষ্ট তা সামাজিক পরিচয়ে সামন্তবাদী বৈকি।

কনরাড যে বিংশ শতাব্দীর সংশয়বাদকে নিজের সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রভূমিতে সংস্থাপন করেছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি খুঁজছিলেন (এবং পাচ্ছিলেন না) আনুগত্য ও ব্যক্তিগত সম্মানবোধের সেই গুণ যা সামন্তসমাজের অপরিহার্য অনুষঙ্গ ও অন্যতম ভিত্তিস্তম্ভ। তিনিও প্রত্যাবর্তনে অভীপ্সু, কিন্তু তেমনভাবে নন যেমনভাবে ইয়েটস বিশ্বাস করেন প্রত্যাবর্তন এবং তেমনভাবে অতিঅবশ্যি নন, যেমনভাবে লরেন্স কামনা করতেন পুনরুজ্জীবিত করবেন প্রাক্তন অনুভব ও মূল্যবোধসমূহকে। কনরাড ও লরেন্স উভয়েই বুর্জোয়াবিরোধী। 'The Return' নামে একটি গল্পে কনরাড বুর্জোয়া সমাজকে প্রায় হৃদয়হীন সুইফটীয় নির্মমতায় আক্রমণ করেছেন। ওদিকে লরেন্সের আক্রমণ গদ্যে-পদ্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, কবিতায়, নাটকে বার বার এসেছে। বুর্জোয়াকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন তিনি। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনিও বিশ্বাস করেন অভিজাততন্ত্রে, যদিও তাঁর বীরদের আভিজাত্য ধন-সম্পদ বা বংশগৌরবের ওপর নির্ভর করে না, করে ব্যক্তিগত গুণাবলির ওপর। লরেন্স হারিয়ে যাওয়া স্বর্গ খুঁজছেন, জীবনে সেই আদিমতা ফেরত আনতে চাইছেন, সভ্যতার তথাকথিত বিকাশে যা অবলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। মোটকথা, এই লেখকরা সাধারণ মানুষে আস্থা রাখেন না, শ্রমশক্তির মুক্তির সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন না।

সেই জন্য তাঁরা এমনকি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও উদারনীতিতেও বিশ্বাসী নন। যদিচ গণতন্ত্র ও উদারনীতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও হয়তো কাজ চলতে পারত, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আর চলবে না। এখন সমস্যা আরো জটিল হয়েছে, জীবনের আরো গভীরে প্রবেশ করেছে তাই এখন সহজ সমাধান আর সম্ভব নয়। কনরাডের মতো ঔপন্যাসিকেরা মনে করেন যে, সমস্যার কোনো সমাধানই আসলে নেই। বাঘ যেমন তার গায়ের দাগগুলো ইচ্ছে করলেই বদলাতে পারে না, মানুষও যতই চা'ক, যতই চেষ্টা করুক, ঘষুক কিম্বা মাজুক নিজের স্বভাব কিছুতেই পাল্টাতে পারবে না। কাজেই অগ্রগতির যে সকল জয়ধ্বনি আমরা শুনি সেগুলো অর্থহীন হট্টগোল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ইয়েট্‌স্ আইরিশ জাতীয়তাবাদের পক্ষে কাজ করেছেন বটে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে

হতাশ হয়েছেন, রাজনীতির ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছেন শেষ দিকে। তাঁর বীর-প্রীতি ফ্যাসিবাদের অভিমুখে প্রলম্বিত। তিনি সামন্ত সমাজে প্রত্যাবর্তন চাইছেন। পাউন্ডের ফ্যাসিবাদস্তুতি কোনো দুর্ঘটনা নয়, এর বীজ তাঁর চেতনায় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যেই উপ্ত ছিল, অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এলিয়টও ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, সাহিত্যের নয় শুধু, সংস্কৃতিরও। তিনিও গণতান্ত্রিক নন। জয়েসও যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন এমন কোনো নিদর্শন নেই। লরেন্স তো বুর্জোয়া মূল্যবোধের জন্ম-শত্রু। তিনি ফ্যাসিবাদের সাহিত্যিক প্রবক্তা, তিনি উদারনীতিকে মনে করেন কাপুরুষতা। গণতন্ত্র ও উদারনীতি যে জীবনের জটিল ও গভীর সমস্যাসমূহের সমাধান দেবে না এ সত্য এই লেখকেরা যথার্থই বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেই পথে যাননি, যে পথে বুর্জোয়া মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করে বামপন্থী সমাজবিপ্লবীরা চলে গেছেন। যে-পথ উদার ও প্রশস্ত। তাঁরা চলে গেছেন প্রতিক্রিয়ার পেছন-মুখো, সঙ্কীর্ণ, বিপরীত পথে।

কয়েক বছর আগে ঔপন্যাসিক সি.পি. স্নো এক বক্তৃতায় দেখিয়েছেন যে, আধুনিক যুগে ইউরোপ-আমেরিকার সংস্কৃতি দুই বৈরী শিবিরে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। একদিকে আছেন শিল্প-সাহিত্যের কর্মীরা, অপরদিকে বিজ্ঞানী ও প্রয়োগকুশলীরা। শিল্পীসাহিত্যিকেরা উত্তরোত্তর বর্ধিত বিজ্ঞানবিরোধিতায় লিপ্ত হচ্ছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবিতপূর্ব অগ্রগতি দেখে এঁরা রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং সেই আতঙ্ক আর্তচিৎকার রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। লেখকেরা অনেকেই যে বিজ্ঞানবিরোধী সে-সত্য অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। বিশেষভাবে যে ছয় জন প্রধান লেখকের বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি তাঁরা সকলেই বিজ্ঞানকে দেখেন শত্রুপক্ষ হিসেবে। তাঁরা ভয় পান এর কর্মতৎপরতায়। বলাই বাহুল্য যে, তাঁদের বিজ্ঞানভীতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত। তাঁরা চলে যান, চলে যাবেন পেছনে, তাঁদের চিত্তে আছে এক ধরনের নস্টালজিয়া। তাঁরা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁদের অবদান দেশের উজ্জ্বলতম সাহিত্যিক কীর্তিসমূহের অন্ত-র্গত। বুদ্ধিতে, বিবেচনায় সামান্য নন তাঁরা কোনোমতেই, তথাপি তাঁরা যে অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো অবৈজ্ঞানিকতা ও আদিমতার পক্ষ সমর্থন করছেন, শুধু সমর্থন করছেন না, নিজেদের প্রগতিবিরোধী মনোভঙ্গির প্রতি জনসমর্থন গড়ে তুলবার চেষ্টায় নিয়োজিত হচ্ছেন সেই ঘটনা সমকালীন সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক জীবনের চরিত্রকেই উন্মোচিত করে দিয়েছে। এঁরা শুধু মুখপাত্রই নন, এঁরা ভুক্তভোগীও।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের সমসাময়িক জীবনে যে গ্লানি এসেছে সে-বিষয়ে এই লেখকেরা স্বভাবতই তীক্ষ্ণরূপে সচেতন। শিল্পবিপ্লবের কদর্য দিকগুলো, তার ছাই ও ধোঁয়া, তার নিষ্পেষণ ও যান্ত্রিকতা সমস্ত কিছু এঁরা দেখেছেন, দেখেছেন তার boredom ও horror, এবং খুঁজেছেন যদি-বা, তবু পাননি খুঁজে glory—যার কথা

এলিয়ট উলেখ করেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড সম্পর্কে বলতে যেয়ে। আর্নল্ডের স্কলার জিপসি তবু যা হোক অক্সফোর্ড ছেড়ে প্রকৃতির আবেষ্টনে জিপসিদের সঙ্গে জীবনযাপনে নতুন এক সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলেন, এলিয়টের 'হলো মেন'দের কপাল অতটাও সুপ্রসন্ন নয়, তাদের ভেতরে কিছুই নেই, সমস্তটাই ফাঁপা, হায়রে, খড় দিয়ে ঠাসা। জীবনের এই অধঃপতিত দশাকে লেখকরা গ্রহণ করেননি, বিকল্প জীবনের কথা কেউ ভেবেছেন, কিন্তু সেই জীবন এতই দূরের যে তার আলোকে বর্তমানকে প্রত্যাখ্যানের ঘটনাই বরঞ্চ আরো কিছু বেশি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রত্যাখ্যানই বড়, অন্বেষণ ও অর্জনের তুলনায়।

যে ঘটনা লেখকদের সবচেয়ে বেশি বিরক্ত ও মর্মাহত করেছিল তা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মানব-সভ্যতার ঘটনাবহুল ইতিহাসে যুদ্ধ কোনো নতুন বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। যুদ্ধ বহু হয়েছে, কিন্তু সে-সব যুদ্ধ ছিল স্থানীয় যুদ্ধ, এই একটা যুদ্ধ ঘটল যা স্থানীয় নয়, যাতে জড়িয়ে পড়ল সমগ্র বিশ্ব। এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈশিষ্ট্য যে, এই যুদ্ধে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ ঘটল মানুষের, তেমনটা ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। যুদ্ধ সমস্যা আনল নতুনতর। অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক সমস্যা। পুরাতন বিশ্বাসগুলো এমনভাবে ঘা খেল যে তারা চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়ল। নতুন বিশ্বাস জন্ম নিল বটে, রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, কিন্তু সে-বিশ্বাস আকর্ষণ করল না পুঁজিবাদী সমাজকে, ভয় পাইয়ে দিল বরঞ্চ। ফলে নানাবিধ অবৈজ্ঞানিকতা, আদিমতা, প্রত্যাবর্তন-ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দিল মানুষের মনে। এলো হতাশা, বিষাদ, নৈঃসঙ্গ। প্রবল হল boredon ও horror, প্রায় নির্বাপিত হয়ে গেছে মনে হল gloryর সম্ভাবনা।

১৯১৯ সালে লেখা একটি কবিতায় ইয়েট্‌স্ পরিস্থিতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তার বাস্তবতাই চিত্রটিকে বিশেষভাবে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

Things fall apart; the centre cannot hold,
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

ভাঙছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এ থেকে মুক্তির উপায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা ছিল না, যেখানে জানা ছিল সেখানে হয়তো বিশ্বাসে প্রবলতা ছিল না, যেখানে প্রবলতা ছিল সেখানে পথটা ছিল একেবারেই ভ্রান্ত।

যুদ্ধ যে ঘটল তার কারণ আপাতদৃষ্টিতে যাই হোক, আসল কারণ পুঁজিবাদী জগতের সঙ্কট। সেই দিক থেকে বিশেষ কোনো একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য এ যুদ্ধ ঘটেনি, যুদ্ধ ঘটেছে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে। হত্যাকাণ্ড না-ঘটলে হয়তো অন্য কোনো কাণ্ড উপলক্ষে ঘটে যেত যুদ্ধ। যেমন ফলটি পাকলে আপনা থেকেই পড়ে

যায়। জোরে বাতাস বইলে তাড়াতাড়ি পড়ে, বাতাস না-বইলেও পড়ে, পাখিতে ঠোকর দিলেও পড়তে পারে খসে।

আসল কথা এটাই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ সঙ্কট ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছিল। সেই জটিলতা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, সেই একই জটিলতা সাহিত্য-সংস্কৃতির এলাকায় নানাবিধ সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী যখন শেষ হয়ে আসছে তখনও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একবার সঙ্কটের কথা শোনা গিয়েছিল। পুঁজিবাদ তখন সামন্ত বাদকে পরাভূত করে করে নিজের বিজয়কে সুসম্পূর্ণ করেছে। সেই সময়ে সাহিত্যের সামনে মনে হল আর কোনো পথ নেই খোলা। আলেকজান্ডার পোপের যে হিরোয়িক কাপলেট সেটাই এক সময়ে যথার্থ ও যথেষ্ট ছিল সংবিতের ও বক্তব্যের প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু তারপর কী? পোপের পরে পোপ থেকে ভিন্ন কোনো ধরনের কবিতা লেখা কি সম্ভবপর? ড. জনসন মনে করতেন সম্ভবপর নয়, ড. জনসন দেখতেই পাননি কবিতা কী করে আর এগুতে পারে, কোন্ দিকে, কোন্ পথে? অথচ পথ ঠিকই এসে গেল। নতুন ও প্রশস্ত পথ। রোমান্টিক কবিতার পথ। বুর্জোয়া বিকাশের যে-নবীন উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস সেদিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকাশপথ খুঁজে নিচ্ছিল সেই একই শক্তি সাহিত্যিক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সাহিত্যের সঙ্কট সাহিত্য সমাধান করল না; করল অর্থনীতি, করল সমাজবিকাশের ধারা।

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ নিজের শক্তিকে যেমন সুসংহত ও সুদৃঢ় করেছে ঠিক তেমনি, একই সঙ্গে নিজের অভ্যন্তরেই জন্ম দিয়েছে স্ববিরোধিতার। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠেছে এবং স্বদেশে শ্রমিকশ্রেণির ওপর এবং বিদেশে সমগ্র সমাজের ওপর শাসন অর্থাৎ শোষণকে কায়েমি করেছে। বিশ্বযুদ্ধ বাইরের কোনো কারণে বা প্ররোচনায় ঘটেনি, ভেতরের দ্বন্দ্বে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল বলেই তাকে ঘটতে হয়েছে। এবং এই বিশ্বযুদ্ধ, প্রথমে একটি, তারপরে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ, প্রমাণ করে দিল সঙ্কট কত গভীর, তার সমাধান কত কঠিন। যেমন ফরাসি বিপ্লব ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তেমনি এবং ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটে গেল বিংশ শতাব্দীতে-রুশ বিপব, কিন্তু সেই বিপ্লব যে পুঁজিবাদের ধ্বংস চায় তা বুঝতে কষ্ট হল না, তাই তার প্রভাব গভীর বা ব্যাপক হতে পারল না পুঁজিবাদী বিশ্বে। অর্থাৎ কিনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নের সাহিত্যিক সঙ্কট যে ভাবে নতুন পথে উত্তরণের মধ্য দিয়ে সমাধান খুঁজে পেয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালের সাহিত্যের পক্ষে তেমন কোনো সাধারণ সমাধান লাভ করা সম্ভব ছিল না। সাহিত্যিক কারণে নয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাঘটিত কারণে। একদিকে পুঁজিবাদের সংকট এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের ভয় সংস্কৃতিতে জন্ম দিল নানা ধরনের অবৈজ্ঞানিকতা ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা। ফ্যাসিবাদের সাংস্কৃতিক লালনভূমিতে অবৈজ্ঞানিকতা থাকে, থাকে বীরের প্রতি আস্থা, যে-আস্থা ব্যক্তির নিজের প্রতি অনাস্থারই উল্টোপিঠ। মার্কসবাদ যেখানে জনসাধারণকে বীর হিসেবে দেখে, ফ্যাসিবাদ তেমনি বীর হিসেবে দেখে বিশেষ বিশেষ মানুষকে। আমাদের আলোচ্য

লেখকেরা কেউ জনশক্তিকে তথা শ্রমকে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে দেখেননি, তাঁদের অধিকাংশই আস্থা রেখেছেন শক্তিমান ব্যক্তির শক্তিতে। পুঁজিবাদ যেমন ভরসা করে পুঁজি-বিনিয়োগকারীর ওপর, এঁরাও তেমনি ভরসা করেছেন ব্যক্তি-মনীষার সামাজিক বিনিয়োগের ওপর। ফ্যাসিবাদ এক ধরনের কুসংস্কার, এবং এই লেখকদের প্রায় সবাই কোনো না কোনো ভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এমনকি ঘোরতর সংশয়বাদী কনরাডও মনের মধ্যে পোষণ করেন কতিপয় সামন্তবাদী কুসংস্কার। নামান্তরে যারা মূল্যবোধে যেমন তেমনি বিশ্বাস করতেন আনুগত্যে ও সম্মানে।

এঁদের অনেকেই জীবনের চাইতে শিল্পকলাকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করেন। এ বোধটাও পুঁজিবাদী সংস্কৃতির অবদান। পুঁজিবাদ যেমন মানুষের চেয়ে অধিক মূল্য দেয় মনুষ্য-উৎপাদিত পণ্যকে, এবং পণ্য-মূল্য দিয়ে মানুষের মূল্য নিরূপণ করে, ঠিক তেমনি ব্যাপার দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে আঙ্গিকে অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণও পুঁজিবাদের সঙ্গে সংশিষ্ট। পুঁজিবাদ যন্ত্রকে অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে, শ্রমের তুলনায়। সাহিত্যেও ঘটেছে তেমনি ঘটনা, যন্ত্র বেশি দামি হয়ে উঠেছে। বস্তুত যন্ত্র যন্ত্র থাকছে না, নিজেই মালিক হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদী সমাজে যে-আত্মসচেতনতা থাকে মানুষের, সেই আত্মসচেতনতাও টেকনিক-সচেতনতার ভেতর দিয়ে প্রসারিত হয়ে গেছে। নিজেকে ভয় করেন লেখকেরা, আর-পাঁচজন মানুষের মতোই; তাই টেকনিকের ক্রীড়া-কৌতুক দিয়ে নিজেকে ভোলানো, ব্যস্ত রাখা। আধুনিক কাল মিশ্রণের কাল, নানান বস্তু নানান দেশ থেকে এসে মিলেছে, এক হতে পারেনি, কিন্তু একত্রিত হয়েছে। সেই মিশ্রণ দেখি আধুনিক সাহিত্যের টেকনিকে সুন্দরভাবে এসে মিলেছে।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের মধ্যে এক ধরনের বৈজ্ঞানিকতা আছে। কিন্তু সাহিত্যে ফ্রয়েড আবার বিজ্ঞানবিরোধীও বটে। কেননা ফ্রয়েড অবচেতন-অচেতন জগতের ভয়াবহতা দেখিয়ে মানুষকে কেবলি ভয় পাইয়ে দেন, সমাজ-পরিবর্তনের বিষয়ে হতাশ করেন। মনে হয় মানুষ নিয়ন্ত্রক নয়, ক্রীড়নক শুধু, তার ভাগ্য তার হাতে নেই, আছে গোপন, লুকানো কোনো শক্তির হাতে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড অবৈজ্ঞানিকতার চর্চা করার সুযোগ করে দিয়েছেন, সুযোগ এনে দিয়েছেন মার্কসবাদ-বিরোধিতার।

লেখকের পাঠক-বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করেছি। লেখক নিজের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন-তিনি নিজেই সেটা বোধ করেন। যেন একটা অর্থহীন অবাস্তব জগতে বসবাস করছেন তিনি, এখানে বিচার একটা চলছে ঠিকই, কিন্তু কে করছে কার বিচার? কোন অধিকারে? কার পাপ কোথায়? বিমূঢ় লেখক খুঁজে পান না সে-প্রশ্নের জবাব। চারদিকে জীবনের এই যে আপাত-অস্থির ভীষণ চলমানতা, এর অর্থকে তিনি জানেন না। কিন্তু সেই চলমানতার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনিও ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত। সেই চলমানতা, সেই অনির্দেশ্য, অনির্দিষ্ট যাত্রার বহুভঙ্গিম দ্যোতনা তাঁর লেখায় আছে। দ্যোতনা আছে, অর্থ নেই। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন-যেন বোঝেন না তিনি।

এই চলমানতা ইতিহাসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। চলছে, ইতিহাস চলছে। কিন্তু কোন্ দিকে? সামনের দিকে নয়। আলোচ্য ছয় জন প্রধান ইংরেজি লেখকের মধ্যে একজনও বলছেন-না যে, ইতিহাস সামনের দিকে এগুচ্ছে। বলছেন-না যে, নতুন সমাজ পেছনে নেই, আছে আমাদের সামনে। তাঁরা হয় বলছেন ইতিহাস চক্রাকারে চলছে, আমরা এগুচ্ছি না, পেছোচ্ছি না, ঘুরে ঘুরে, বারে বারে, ফিরে ফিরে আসছি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই। অর্থাৎ অগ্রগতি বলে কিছু নেই, প্রগতি সম্ভবপর নয়। নয়তো তাঁরা বলছেন, ইতিহাস হেঁটে চলেছে পেছনমুখো, না-হাঁটলেও তাকে হাঁটতে হবে পেছন দিকেই। মার্কসবাদীও ইতিহাসকে সম্মান করেন; কিন্তু সে-ইতিহাস চক্রের মতো আপন কক্ষপথে ঘোরে না, পেছনেও চলে না, সে যায় সামনের দিকে-প্রতিনিয়ত। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে ইতিহাস দেখি মিথ ও ট্রাডিশনের রূপ নিয়ে আসছে। সে ব্যাখ্যা দেয়, আর দেয় আশ্রয়। আজকের ঘটনা ব্যাখ্যা করে গতকালের ইতিহাস দিয়ে এবং আগামীকালের মুখোমুখি হতে চায় ঐতিহ্যের একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে নিয়ে, সেই ঘাঁটিতে নিজেকে স্থাপন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকরা নিজেদেরকে আগের কালের মানুষের তুলনায় অধিক সৌভাগ্যবান বিবেচনা করতেন, তাঁরা নিজেরা সভ্যতার যে সকল চমৎকার অবদানসমূহ সম্ভোগ করছেন, হায়, তাঁদের পূর্বপুরুষরা সে-সমস্ত অবদান থেকে বঞ্চিত ছিলেন, সেই জন্য, আহা, বেচারারা তেমন ভালো কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি, খুঁত রয়ে গেছে পরতে পরতে। এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। এ কালের লেখকের কিন্তু সে আত্মবিশ্বাসটুকুও আর নেই। সেই জন্য এ কালে অতীত-রোমন্থন এত অধিক।

কিন্তু সব কথার গোড়ার কথা অবশ্যি এইটে যে, সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতাই প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে। সমাজে প্রগতিশীল অংশ নিশ্চয় একটা ছিল, কিন্তু প্রগতিশীল আন্দোলন প্রবলতা পায়নি বলেই তা সাহিত্যে তেমন বড় কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। সাহিত্যের চরিত্রের মধ্যেই এক ধরনের আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়াশীলতা আছে। এই অর্থে যে, সাহিত্য বরাবরই পেছনমুখো, মিথ্ ও ট্রাডিশন-প্রীতি তার স্বভাবের মধ্যে আছে, তাকে প্রগতি-অভিমুখী করতে হলে যে বিশ্বাস ও উদ্যম প্রয়োজন তা এই লেখদের সমাজে ছিল না, লেখকদের মধ্যেও ছিল না। তাঁরা সমাজের প্রতিনিধি, আবার সমাজের হাতে ক্রীড়নকও।

## দুই.

উপরে যে রেখাটি আমরা তৈরি করেছি এর ভেতরে ছয় জন লেখককে যদি স্থাপন করি তবে দেখতে পাব এঁরা কে কিভাবে এবং কী পরিমাণে উলেখিত সাধারণ প্রবণতাগুলোকে নিজেদের লেখার মধ্য দিয়ে ধারণ ও লালন করেছেন। আমরা স্মরণ রাখব যে, এঁরা এঁদের কালের ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, এঁদের সমসাময়িক

লেখক আরো অনেক ছিলেন, তাঁরা গদ্য লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, কিন্তু আলোচ্য লেখকদের তুল্য শিল্পোৎকর্ষ তাঁদের রচনায় আমরা পাই না।

তিন জন কবির মধ্যে বয়সে ইয়েট্স্ বড়। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রবল আবেগে। সেই আবেগ তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যে ছিল না। তাঁর চারপাশের ইংরেজ সমাজেও বিশেষভাবেই অভাব ছিল আবেগের। বলাই বাহুল্য, আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে আবেগের স্থান নেই, হিসাবটা সেখানে আদৌ আবেগের নয়, হিসাবটা লাভলোকসানের। কিন্তু ইয়েট্স্ এসেছেন আয়ারল্যান্ড থেকে, সেখানে শিল্পবিপ্লব তখনো আসেনি; সে দেশ তখনো পরাধীন। কবিতায় তিনি আবেগ আনলেন। নিজের সঙ্গে ঝগড়া থেকে কবিতা আসে, অন্যের সঙ্গে ঝগড়া থেকে রেটরিক্ষইয়েট্স্ নিজেই বলেছেন। নিজের সঙ্গে ঝগড়া ছিল, কবির পক্ষে মুখোশ-পরিধানের আবশ্যকতা বিষয়ে সজ্ঞান ছিলেন তিনি, নানা ধরনের ভঙ্গি আছে তাঁর কবিতায়, বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি, যদিও বীরত্ব সম্ভব ছিল না তাঁর সমাজে। এই ভঙ্গিসমূহ প্রমাণ করল যে সমাজের সঙ্গে ঝগড়া ছিল তাঁর। তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি আইরিশ সাহিত্যে পুনর্জাগরণ আনতে চেয়েছেন, কিন্তু কোন্ আয়ারল্যান্ড তাঁর অভীষ্ট? আজকের আয়ারল্যান্ড নয়, যে আয়ারল্যান্ডের নাগরিক জীবন চিত্রিত হয়েছে তাঁর স্বদেশবাসী জেম্স জয়েসের উপন্যাসে সে-দেশ নয়, আগামীকাল যে আয়ারল্যান্ড শিল্প ও বাণিজ্যে ভরপুর হয়ে উঠবে সেই দেশও নয়, তাঁর দেশ পেছনের আয়ারল্যান্ড; Celtic Twilight-এ বিশ্বাসী তিনি রোমান্টিক আয়ারল্যান্ড চান তিনি, যা সামন্তবাদী, যেখানে জমিদার আছে, প্রজা আছে, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী কর্মচারী নেই। ইতিহাসকে সম্মুখে প্রসারিত রূপে দেখেন না ইয়েট্স্, দেখেন বৃত্তের ভেতর আবর্তনশীল রূপে।

তিনি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করেন আধিদৈবিক জগতে। একটা নতুন ধর্মমত গড়ে তুলতে চান কবি ইয়েট্স্। দুঃখ করে বলেছেন তিনি, "I was unlike others of my generation in one thing only. I am very religious and deprived by Huxley and Tyndall of the single-minded religions of my childhood, I had made a new religion, almost an infallible church of poetic tradition, of a fardel of stories, and of personages, and of emotions, unseparable from the first expression, passed on from generation to generation by poets and painters with some help from philosophers and theologians." এই উক্তির মধ্যে ধর্মের তথা আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইয়েটসের গভীর উপলব্ধির কথা আছে। পুরনো ধর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাই নতুন ধর্ম তৈরি করতে হবে। এ কাজটা কঠিন তবু এ কাজ না করে উপায় কী? তিনি নতুন ধর্ম সৃষ্টি করবেন। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সাহসিকতার ও বীরত্বের পরিচয় আছে। কবি ও শিল্পীদের যে উচ্চমূল্য ইয়েটস দিচ্ছেন তা-ও লক্ষ করবার বিষয়। শিল্পীরাই নেতা, দার্শনিকরা নন, দার্শনিকরা সহায়ক শ্রেণি। কিন্তু নেতৃত্ব থাকছে অল্প লোকের হাতে। অল্প লোক বলবে, বহু লোকে শুনবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি

ইয়েটস যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ বোধ করি এই যে, তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সংস্কৃতির প্রতিনিধি যেখানে একজন কবি (অভিজাত শ্রেণির মানুষ) যে গান করেন, কৃষক ও জেলে সেই গান অনায়াসে, নিজেদের গলায় তুলে নিয়ে। হায়, তিনি জানতেন না যে, এমনকি অনগ্রসর বঙ্গভূমিতেও শ্রেণিদূরত্ব এমন ছিল যে, জমিদারের গান আর প্রজার গান এক হতে পারেনি, হওয়া ছিল অসম্ভব। জমিদার ও প্রজা ভিন্ন ভিন্ন পাখি সব দেশেই। বিশেষ করে পরাধীন দেশে।

ইয়েটস একটা আধিদৈবিক জগৎ গড়ে তুলবেন (উল্লেখ করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ইয়েটস এমন একটা জগৎ-সৃজন দেখে থাকবেন)। সেই জগতের চরিত্রটা কী? এ সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট উক্তি আছে এলিয়টের অধুনা-দুষ্প্রাপ্য অভঃবৎ ঝঃৎধহমব এড়ফং বইতে। এলিয়ট এই জগৎটাকে বলেছেন, "the wrong supernatural world." "It was not a world of spiritual significance, not a world of real Good and Evil, of holiness and sin, but a highly sophisticated lower mythology summoned, like a physician, to supply the fading pulse of poetry with some transient stimulant so that the dying patient may utter his last words।" চমৎকার ছবি। ইয়েটস ভালো-মন্দের শুভ-অশুভের বাছ-বিচার করছেন না, এখানে যেন ঝগড়া নেই, এখানে মিল-মিশ শুধু, শুধু সমন্বয়। তাই নৈতিক বিচারে ক্ষুদ্র এই জগৎ, অত্যন্ত sophisticated বটে, কিন্তু আসলে নিম্নস্তরবর্তী। কবিতার প্রয়োজনেই এসেছে এই জগতের মিথলজি, জীবনের প্রয়োজন আসেনি। যেন কবিতা অধিক মূল্যবান জীবনের চেয়ে।

ইয়েটসের ইতিহাস চক্রাকারে ঘোরে। বার বার পেছনের দিকে তাকান তিনি, এ্যাথেন্সের দিকে, বাইজেন্টাইমের দিকে। বাইজেন্টাইম যেন তাঁর হারানো স্বর্গ। তিনি লিখেছেন, "I think that in early Byzantium, may be never before or since in recorded history, religious, aesthetic and practical life were one, that architects and artificers—though not, it may be, poets, for language had been the instrument of controversy and must have grown abstract—spoke to the multitude and the few alike।" পশ্চাদমুখিতার সঙ্গে শিল্পের বিশেষ মূল্যসচেতনতাও লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে লক্ষ করবার বিষয় যে, কবি বিশেষভাবে বিব্রত জীবনের বিভাজনে, মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্বে, যে-দূরত্ব পুঁজিবাদ আপন কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছে। মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি পুঁজিবাদের বিষময় ফলগুলোর একটি। মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। এমনকি নিজেই সে বিচ্ছিন্ন নিজের থেকে। এই বিভাজনের সমাধান কী? অবশ্যই একটি নতুন সমাজ গড়া। কিন্তু সে-সমাজ সমাজতান্ত্রিক নয়, তা সামন্ততান্ত্রিক। ইতিহাস সামনে এগুচ্ছে না, এগুবে না, ইতিহাস পেছনে যাবে।

ইয়েটস বীর ও বীরত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রশংসা করতেন শক্তির, দুঃসাহসের, সৌন্দর্যের ও অহঙ্কারের। তাঁর পক্ষপাত দুর্বলের বা বিনয়ীর প্রতি নয়, পক্ষপাত শক্তসমর্থ মানুষের প্রতি। এই কবি বুদ্ধিকে অবিশ্বাস করতেন। সেই মনের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না, যেমন-

A levelling, rancorous, rational sort of mind
That never looked out of the eye of a saint
Or out of drunkard's eye.

জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছেন, কিন্তু ক্রমশ বিরক্ত হয়েছেন রাজনৈতিক ক্রিয়া দেখে। টমাস মানের একটি উক্তি 'In our time the destiny of man presents its meaning in political terms'—উদ্ধৃত করে ইয়েটস একটি কবিতায় লিখেছেন :

How can I, that girl standing there
My attention fix
On Roman or on Russian
Or on Spanish politics?
Yet here's a travelled man that knows
What he talks about,
And there's a politician
That has read and thought,
And maybe what they say is ture
Of war and war's alarms,
But O that I were young again
And held her in my arms!

কিন্তু দোষ কি রাজনীতির নাকি বার্ধক্যের? রাজনীতি সম্পর্কে যে ধারণা এখানে প্রচ্ছন্ন তা-ও অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে রাজনীতি তাঁকে হতাশ করেছে। Easter ১৯১৬-তে তিনি যে হিংসা ও রক্তপাত দেখেছেন, তা-ও তাঁকে বিমূঢ় করেছিল, তিনি দেখেছিলেন রাজনীতি কেমন করে মানুষের হৃদয়কে পাথরে পরিণত করেছে।

ইয়েটসের বাস্তববাদিতা অসামান্য। একদা তিনি লিখেছিলেন, "then in 1900 everybody got down off his stilts; henceforth nobody drank absinthe with his black coffee, nobody went mad, nobody committed suicide; nobody joined the Catholic church; or if they did I have forgotten," অর্থাৎ কবিরা নেমে এলেন জীবনের সমতলে, তাঁরা আর রণ-পা পরে হাঁটছেন না, তাঁরা আর মাতাল বা উন্মাদ হচ্ছেন না, আত্মহত্যা করছেন না, প্রাচীন ধর্মে প্রত্যাবর্তন করছেন না-তাঁরা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন, বাস্তবতাকে গ্রহণ করছেন। ইয়েটস নিজেও তাই

করেছেন, তাঁর কবি জীবনের ইতিহাস ক্রমশ অধিক বাস্তববাদী হওয়ারই ইতিহাস। স্বপ্নময়তা পার হয়ে, কুয়াশা ঠেলে, গায়ের বিচিত্রবর্ণ পরিচ্ছদটি ফেলে দিয়ে জীবনের দিকে এগুচ্ছেন তিনি। কিন্তু তবু, এগুনো সত্ত্বেও, জীবনের সাধারণ প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন তিনি। এলিয়টের সমকালীনতা নেই তাঁর মধ্যে। না-থাকুক, তার চেয়ে বেশি করে যা নেই তা হল সাধারণ মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ, যে-আকাঙ্ক্ষা নতুন সমাজ চায়, নতুন জীবন চায়-সামন্তবাদী নয়, সমাজবাদী সমাজ।

এই কালের ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার যে অবিস্মরণীয় চিত্র The Second Coming কবিতায় তিনি দিয়েছেন ("Things fall apart; the centre cannot hold") সেই চিত্রের সঙ্গে "Surely some revelation is at hand; Surely the second coming is at hand" এই মর্মে আশারও একটি ছবি আছে। কিন্তু কে আসছেন? কোন্ নতুন যিশু? তেমন আশা তো নেই। আসছে ভয়াবহ কিম্ভুত এক জীব :

Somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving it slow thighs, while all about
Reels shadows of the indignant desert bird

এতে আশাবাদী হবার সুযোগটা কোথায়?

বিজ্ঞানবিরোধিতা, বীরে আস্থা, ধর্মানুসন্ধান, রাজনীতিতে বিরক্তি নানা দিকে দিয়ে একই লক্ষ্যের দিকে যেন অগ্রসর হচ্ছেন ইয়েটস, ফ্যাসিবাদের প্রতি সমর্থনের দিকে। তাঁর কাছে ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠাও মনে হয়েছে নতুন এক অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব।

কবি হিসেবে ইয়েটস ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি যতটা পেরেছিলেন হিউম ও পাউন্ড। ইয়েটস ছিলেন রোমান্টিক, কিন্তু যুগটা অপেক্ষা করছিল, প্রস্তুত হয়েই ছিল ক্লাসিসিজমের জন্য। রোমান্টিসিজম আবেগের ওপর যতটা গুরুত্ব দেয়, আধুনিক কাল ততটা গুরুত্ব দিতে চায় না, আবেগকে ভয় করে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা। অন্যদিকে রোমান্টিসিজম ব্যক্তির বিকাশে ও সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, ক্লাসিসিজম ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে চায় না, ব্যক্তি সেখানে শুধু নিজের নয়, অনেকের প্রতিনিধি। হিউম, পাউন্ড, এলিয়ট এঁরা তিনজনই ক্লাসিসিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, নিজেদেরকে তাঁরা প্রতিপক্ষ হিসেবে খাড়া করেছিলেন রোমান্টিসিজমের।

টি.ই.হিউম একজন প্রধান কবি নন। তিনি অনেক লেখেননি, অনেক দিন বাঁচেনওনি। কিন্তু তাঁর প্রভাব পড়েছিল কবিদের ওপর। এই কবির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাপবোধ ছিল কেন্দ্রীয়স্থান দখল করে। মানুষ পাপী প্রাণী এই তাঁর বিশ্বাস। যে-বিশ্বাস খ্রিস্ট ধর্মে আছে। কাজেই মানুষ সীমাবদ্ধ প্রাণী। মানুষে এই অবিশ্বাসই তাঁকে রোমান্টিসি-জমে অবিশ্বাসী করেছে, তিনি ফ্যাসিজমের দিকেই

ঝুঁকেছিলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অসন্দিগ্ধ ছিলেন, রাসেল যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে চলেছিলেন তাতে তাঁর গভীর ক্ষোভ ছিল, তিনি সমসাময়িক সমাজকেও গভীরভাবে ঘৃণা করতেন। হিউম যুদ্ধেই মারা যান যুদ্ধ এমনই নির্মম, সমর্থককেও রেয়াত দেয় না।

হিউমের তুলনায় পাউন্ডের প্রভাব আরো বেশি বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রভাব শুধু যে পাউন্ডের ব্যক্তি-মনীষার ওপর নির্ভরশীল ছিল তা নয়, বুর্জোয়া সমাজের একাংশ, প্রধান অংশ, যার জন্য অপেক্ষা করছিল সেই প্রতীক্ষিতকেই যেন পেয়ে গেল পাউন্ডের মধ্যে। পেয়ে গেল প্রতিক্রিয়াশীলতার একজন বিজ্ঞ ও সমর্থ প্রতিনিধিকে, ঠিক যেমন ভাবে পাউন্ড পেয়ে গিয়েছিলেন কনফুসিয়াসকে। পাউন্ড লেখার রীতিতে নতুন নতুন চমক এনেছেন, অনেক লেখককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছেন (বিশেষ করে জয়েস ও এলিয়টকে), কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, নৈতিক জীবনে তিনি যে-প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেই প্রবণতা তাঁর যুগের বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও আকর্ষণীয় ছিল। যেমন ধরা যায়, তাঁর রচনার মধ্যে একটা চলমান ব্যস্ততা আছে এবং তদ্‌বিপরীতে স্থিতি নেই। সেই যে চলার জন্য চলা সেটা সত্য ছিল তখনকার সমাজেও। সমাজেই প্রকট ছিল উদ্দেশ্যহীনতা। সেই যে তাঁর লেখার মধ্যে নানা জাতির সংস্কৃতি এসে মিলেছে সেই সংমিশ্রণ, সেই কসমোপলিটানিজমও সমসাময়িক জীবনে বিদ্যমান ছিল। পাউন্ড নিজের দেশে থাকতে পারেননি, অর্ধ-সভ্য (তাঁর ভাষায়) স্বদেশী সমাজে ছিন্নমূল ছিলেন তিনি, ইংলন্ডে চলে এসেছেন, ইংলন্ড থেকে ইউরোপে চলে গেছেন। শিকড় গাড়তে এই অসামর্থ্য ওই কসমোপলিটনিজমের একটা লক্ষণ। তাঁর রচনার মধ্যে একটা অবয়বহীনতা আছে, ইয়েটস খুব সুন্দর করে বলেছেন যে, পাউন্ডে স্টাইল আছে, ফর্ম নেই। তা-ও যেন তাঁর সমকালের সংস্কৃতিরই মুখচ্ছবি। পাউন্ডের Cantos পাউন্ডের ভাষাতেই একটা rag bag, তার মধ্যে, সেই ব্যাগের ভেতর, অনেক কিছু, সব কিছু ভরে দেওয়া, ঠেসে দেওয়া যায় অনায়াসে।

যুগসংস্কৃতি ব্যাপারটা কী? Guide to Kulchur-এ পাউন্ড বলেছেন THE CULTURE OF AN AGE is what you can pick up, and/or get in touch with, by talk with, the most intelligent men of the period"। সংস্কৃতিকে কোথায় খুঁজব? জনজীবনে? উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কে? মোটেই না, সংস্কৃতি পাওয়া যাবে its most intelligent men of the period যারা, তাঁদের কাছে, সংস্কৃতি সেইখানে জমা আছে, যেই ব্যাঙ্কে জমা থাকে টাকা। তাহলে সংস্কৃতি বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে, ভাসমান সে, চলমান নিশ্চয়ই। এবং তাকে সহজেই সংগ্রহ করা যায়, ব্যাঙ্কে যেমন টাকা পাওয়া যায় কাউন্টারে দাঁড়িয়ে, তেমনি সংস্কৃতিও পেতে পারি বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে কথাবার্তায়, মেলামেশায়, মাখামাখিতে। বুদ্ধিরই ব্যাপার সংস্কৃতি, হৃদয়ের ব্যাপার নয়। পাউন্ডের কাব্যে যে প্রেম নেই তার ব্যাখ্যা এই চেতনায় পাওয়া যেতে পারে। তিনি বুদ্ধির কথা বলছেন, হৃদয়ের কথা বলছেন না।

উপরের উদ্ধৃতির বড় হরফগুলো পাউন্ডের নিজের। ভাষা নিয়ে খেলছেন মনে হয় তিনি প্রায়ই। ভাষাকে ভেঙেচুরে দিয়েছেন নানা ক্ষেত্রে। স্বৈরাচারী একনায়কের মতো করে। সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন, "Literature is news that STAYS news"। সাহিত্য এখনকার ব্যাপার, চমৎকার, চমকপ্রদ কিছু ব্যাপার। শিল্পে অভিনবত্ব চাই, শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে to make it new। নতুনত্ব আনো, আনো অভিনবত্ব। এই সমস্ত ধ্যানধারণার উপস্থাপন উত্থাপনের মধ্যে এক ধরনের খেলা-খেলা খেলা আছে, এক প্রকারের ছেলেমানুষি। কিন্তু এই ছেলেমানুষি নির্দোষ নয়, এ খেলায় বিপদ আছে। সকলেই জানেন, বিশ্বযুদ্ধের সময় পাউন্ড ফ্যাসিবাদকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন, মুসোলিনির বেতার থেকে ফ্যাসিবাদের পক্ষে প্রচার করেছেন, পরে তাঁর বিচার হয়েছিল আমেরিকায় এবং তাঁর যে জেল হয়নি সে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক নেই বলে বন্ধুবান্ধবদের ঘোষণার কারণেই। Oxford Book of Modern Verse-এর ভূমিকায় ইয়েটস তাঁর সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন, "he is an economist, poet, politician, raging at malignants with inexplicable characters and motives, grotesque figures out of a child's book of beasts."

পাউন্ড জানতেন যে কবিতায় ভাবনা থাকবেই, এ যুগে চিন্তা ছাড়া কবিতা লেখা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী সভ্যতা তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি সুদপ্রথাকে ঘৃণা করেন। আন্তর্জাতিক কুসিদজীবী ইহুদি সম্প্রদায় তাঁর দু'চোখের বিষ। সুদ প্রথাই অমঙ্গল আনছে পৃথিবীতে। এই ইহুদিরাই দেশে দেশে মহোৎসাহে সুদের ব্যবসায় চালাচ্ছে। ইহুদি-বিশ্বের নতুন কোনো ঘটনা নয়। ইহুদি যেহেতু বাইরে থেকে এসেছে, যেহেতু সে অনেক টাকা করেছে, বিত্ত লাভ করেছে অধিক, যেহেতু সে বাঘের মতো সুন্দর নয়, শেয়ালের মতো ধূর্ত (কল্পনা করা হয়), তাই তাকে, ইহুদিকে, ঘৃণা করা সহজ। পাউন্ড ঘৃণা করেছেন একটা আদর্শবাদিতার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে। পাউন্ড নীতিনিরপেক্ষ নন। পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংস কামনার ব্যাপারে তিনি চরমপন্থী। কিন্তু বড় কথা, এক্ষেত্রে তিনি বামপন্থী নন, চরম দক্ষিণপন্থী। সেই জন্য ফ্যাসিবাদের কাছে গেলেন, মার্কসবাদের কাছে না-গিয়ে।

পাউন্ড বীর খুঁজছিলেন, জেফারসনের মধ্যে, হেনরি এ্যাডামসের মধ্যে। বীর মনে হয় দেখা দিই দিই করছিল। শেষ পর্যন্ত যথার্থ বীরের সন্ধান পাওয়া গেল মুসোলিনিতে। এই বীর পুঁজিবাদের দুর্বলতাগুলো দূর করে দেবেন, malignants with inexplicable characters and motives গুলোকে দেবেন শেষ করে। তদুপরি মুসোলিনির ইটালি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল। মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রকার আশ্রয়। ইটালি শিল্পকলার তীর্থভূমি এ-ও তিনি মনে করেছিলেন। ফ্যাসিবাদের জয় ঘোষণা নাকি করেছেন তিনি এই কারণেও যে, ফ্যাসিজম শিল্পের মর্যাদা দেবে বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। শিল্পকলা অনেক সময় জীবনের চেয়েও অধিক মূল্যবান মনে হয়েছে তাঁর

কাছে। (এটাও বক্রাঘাতমূলক ঘটনা যে, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ বরঞ্চ এই যে ফ্যাসিজম শিল্পী, সাহিত্যিককে কোনো প্রকার স্বাধীনতা দেয় না।)

পাউন্ড চীন বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। এলিয়ট বলেছেন, "It must be pointed out that Pound is the inventor of Chinese poetry for our time"। কিন্তু কোন্ চীন? যে চীন পরে বিপ্লব করেছে সেই চীন মোটেই নয়। পাউন্ডের চীন বিপ্লব-বিরোধী, সনাতন জীবন-যাত্রায় বিশ্বাসী। সেখানে জীবন বদ্ধ আনুগত্যের শৃঙ্খলে। সেখানে যে যেখানে আছে সে ঠিক সেখানেই থাকবে। সে-সমাজের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হচ্ছেন কনফুসিয়াস। কনফুসিয়াস ভক্তি শেখান। কনফুসিয়াস সক্রেটিস নন, সক্রেটিস তর্ক করান, কনফুসিয়াস গল্প বলেন। কনফুসিয়াসের কাছে সত্য জানাই আছে, অপেক্ষা শুধু সত্য বলার এই ধরনের ভান। সত্য কে জানে? আমি জানি, আমি, সমাজে যার স্থান উচ্চে। তুমি জানো না, নিচে তুমি, অতএব তুমি কান পেতে শোনো। কনফুসিয়াসের চীন ফ্যাসিবাদের সমর্থক। পাউন্ড যে এই চীনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তার একটা অতিরিক্ত কারণ নিশ্চয়ই দূরের প্রতি আকর্ষণ, যেমন লরেন্স হয়েছিলেন মেক্সিকোর কোয়েট-জলকোটল ধর্মের প্রতি। ছেলেখেলা বটে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মাও সে তুঙের চীন কনফুসিয়াসের মধ্যে দেখেছে শাসকশ্রেণির স্বার্থের পাহারাদার একজন চতুর ক্রীতদাসকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই দৃষ্টিভঙ্গি পাউন্ডের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পাউন্ডে ভ্রমণ আছে দৃশ্যগোচর। তাঁর Cantos-এর নায়ক অডিসিয়ুস। কিন্তু এই অডিসিয়ুস হোমারের নন, দান্তের নন, এমনকি টেনিসনেরও নন। ইনি গৃহ খুঁজছেন, এ্যাডভেঞ্চার নয়। অডিসিয়ুস Cantos-এর কাঠামোও, শুধু বীর নন। এই অডিসিয়ুস পাউন্ড নিজে, তাঁর যাত্রা শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে ফ্যাসিবাদে পৌঁছে।

এই কবি হুইটম্যান থেকে স্বতন্ত্র। হুইটম্যান প্রকাশ্য রাস্তার কবি, উন্মুক্ত দুঃসাহসের কবি। পাউন্ডে হুইটম্যানের সেই উষ্ণ আলিঙ্গন, সেই অসচেতন দুঃসাহস নেই। হুইটম্যান গণতন্ত্রের গান গেয়েছেন, পাউন্ড ভিন্ন মতের। এলিয়ট এক সময়ে বলেছিলেন, পাউন্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়েই বলেছিলেন যে, হুইটম্যান হলেন একজন গদ্য-লেখক, পাউন্ড হচ্ছেন কবি। এই ব্যবধান মানি না-মানি, মানতেই হবে যে, পাউন্ড এক ধরনের কবি, হুইটম্যান আরেক ধরনের। পাউন্ডের কবি-বন্ধু উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস পাউন্ডের often painful self-consciousness-এর উল্লেখ করেছেন। এই বুর্জোয়া ব্যাধি পাউন্ডে আছে। আর আছে বুর্জোয়া বিষণ্নতা।

বিষণ্নতা এলিয়টের কাব্যজগতেরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিষণ্নতা তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি থেকেই এসেছে। এলিয়টে সমাজের যে ছবি পাই সেখানে boredom বড় সত্য, horror-ও আছে, কিন্তু glory খুব কম। এলিয়ট glory খুঁজছেন, The Waste Land-এ একটা অন্বেষণ আছে, আছে পানির জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু পানি পাওয়া যাচ্ছে না, অনুর্বরতা ঘুচছে না, পোড়ো জমি পোড়োই পড়ে থাকছে।

এলিয়ট বিশ্বাসপ্রবণ কবি, বিশ্বাস করবার মতো মতবাদ তিনি পেয়েছেন বৈ কি, সাহিত্যে ক্লাসিসিজমপন্থী, রাজনীতিতে রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, এবং ধর্মে এ্যাঙ্গলো-ক্যাথলিক বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন তিনি, নিজেই। সেই পরিচয় অবশ্যই সঠিক। এ যুগে ইংলন্ডের বুদ্ধিজীবী সমাজেও রাজতন্ত্রে বিশ্বাস পাওয়া কঠিন, আমেরিকা থেকে এসে এলিয়ট যে রাজতন্ত্রের প্রেমে পড়ে গেছেন তার একটা কারণ আমেরিকায় রাজা নেই; দ্বিতীয় ও বড় কারণ, তিনি গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী।

বিশেষভাবে গণতন্ত্রে অবিশ্বাসের কারণেই এলিয়ট ঐতিহ্যের মূল্য সম্পর্কে এত বেশি সচেতন। তাঁর নিজের দেশে কোনো একটা বিশেষ ঐতিহ্য স্থিতিশীল রূপে গড়ে ওঠেনি বলেই হয়তো-বা এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এলিয়টের ওই ঐতিহ্য তাঁকে আশ্রয় দেয়। এ শুধু কাব্যক্ষেত্রে ব্যবহার্য কোনো উপাদান নয়, এ হচ্ছে বিশ্বাসের অঙ্গ। চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা। এর মধ্যে ঐতিহ্যেই আছে এক ধরনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা। ঐতিহ্য বদলায় না। সম্প্রসারিত হয় শুধু। ঐতিহাসিক ভাবে আমরা প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছি এমন নয়। আমরা সামনে এগুবো অতীতকে সামনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে। এই পদক্ষেপের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ঋণী পূর্ব-পুরুষের কাছে। ইতিহাসের অর্থ ইতিহাসে নেই, আছে ইতিহাসের বাইরে, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে। এই ধারণা প্রগতির সমর্থক নয়, এ ধারণা এমনকি মানববাদীও নয়। সমকালীন ইতিহাসকে তিনি মনে করেন, একটি "immense panorama of futility and anarchy."

ইতিহাসের কোন্ সময়টা প্রিয় ছিল এলিয়টের? সেই সময়টা, যখন ধর্মবিশ্বাস প্রবল ছিল মানুষের মনে। ইয়েটস-পাউন্ডের মতো শিল্পকে তিনি বড় মনে করছেন না, জীবনই বড়, কিন্তু জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আছে, আবশ্যকতা আছে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে। শেকস্পিয়রের কালের সঙ্গে দান্তের কালের তুলনা করে এলিয়ট মন্তব্য করেছিলেন, "I prefer the culture which produced Dante to the culture which produced Shakespeare; but I would not say that Dante was the greater poet or even that he had the profounder mind"। কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, বড় কবি বা বুদ্ধিজীবীর জন্ম দিয়েছে কি দিতে পারেনি এই বিবেচনার ওপর কোনো সংস্কৃতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করে না, উৎকর্ষ নির্ভর করে ধর্মবাদিতার ওপর। শেকসপিয়রের সময়টা ধর্মবাদিতার সময় ছিল না। সেই সময়টাতে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছিল, "I find the age of Shakespeare moved in a steady current, with back eddies certainly, towards anarchy and chaos"। আরো বলেছেন, "The philosophical basis, the general attitude toward life of the Elizabethans is one of anarchism, of dissolution, of decay." অর্থাৎ সর্বত্রবন্দিত রেনেসাঁসকে পছন্দ করছেন না এলিয়ট; প্রত্যাবর্তন চাইছেন মধ্যযুগে, যে-যুগকে বলা হয় অন্ধকার যুগ তারই আশ্রয়ে।

এলিয়ট সম্পর্কে উদারনীতিকে লেখক ই.এম. ফরস্টার বলেছিলেন, "In respect to the horror that they find in life, men can be divided into three classes. In the first class are those who have not suffered often or acutely; in the second, those who have escaped through horror into a further vision; in the third, those who continue of suffer."। এই শ্রেণিভেদ যদি গ্রহণ করি তবে, ফরস্টারের মতে, এলিয়ট অবশ্যই প্রথম শ্রেণির নন, তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির, he continues to suffer। এলিয়টে বিশ্বাস আছে, প্রতিকার নির্দেশ করা আছে রোগের, কিন্তু রোগের বর্ণনাই অধিক আকর্ষণীয় তাঁর রচনায় রোগের হেতু নির্ণয় নয়, চিকিৎসার ব্যবস্থাপনাও নয়। টেনিসন বিষয়ে এলিয়ট একদা বলেছিলেন যে, টেনিসন ধর্মীয় কবি তাঁর বিশ্বাসের কারণে নয়, তাঁর সংশয়ের কারণে। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, "a framework of accepted and traditional ideas" জিনিসটা একজন কবির পক্ষে মঙ্গলজনক, বেকের মধ্যে যে জিনিসটার অভাব ছিল বলে তাঁর ধারণা। এলিয়েটও আধুনিক তাঁর বিশ্বাসের জন্য নয়, অবিশ্বাসের কারণেই। তাঁর বিশ্বাসটা সামান্য বস্তু, অবিশ্বাসের বিরান মাঠে তাঁর ভ্রমণের তুলনায়। এলিয়ট আধুনিক বিশ্বাসে নন, অবিশ্বাসে। আমরা বিষণ্নতার কথা উলেখ করেছি। বিষণ্নতার পেছনে এই বোধও কার্যকর যে, মানুষ হচ্ছে পতিত প্রাণী। এলিয়ট ধার্মিক বিশেষভাবে এইখানে, মানুষের এই পাপসচেতনায়। এ চেতনা বোদলেয়ারে আছে, সুইফটেও ছিল। তিনি বড় ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। বীরে তাঁর আস্থা নেই। কিন্তু বিশ্বাস করেন মানসিক প্রত্যাবর্তনে। এলিয়টের জীবনদৃষ্টি, সংস্কৃতিচেতনা, ইতিহাসবোধ সর্বত্রই অভাব আছে উদারতার। বড় তিনি কাব্যদক্ষতায়, গভীর তিনি অনুভবশক্তিতে, কিন্তু আদৌ উদারপন্থী নন দৃষ্টিভঙ্গিতে। The Waste Land শেষ হয়েছে উপনিষদের 'শান্তি, শান্তি, শান্তি' উচ্চারণে, কিন্তু তাঁর বিশেষ কোনো অনুরাগ না-ছিল প্রাচ্যের প্রতি না-বিধর্মীদের প্রতি। তিনি ভয় পান আন্তরিক হতে, যে জন্য তিনি ওয়ার্ডওয়ার্থের কবিতা যে ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি এই তত্ত্বকে অস্বীকার করে বলেন, কবিতা হচ্ছে আত্ম-অতিক্রম। বর্তমানকালে আন্তরিকতা জিনিসটা ভয়ঙ্কর, কেননা মানুষ ভয় পায় আন্তরিক হতে এলিয়ট বলেন ব্লেক প্রসঙ্গে।

পাউন্ড বলেছেন, কবি হিসেবে এলিয়েটের প্রস্তুতি ছিল যথার্থও উপযুক্ত, কেননা এলিয়ট নিজে নিজেই নিজেকে trained ও modernized করেছিলেন। ট্রেনিং ছাড়া কবিতা লেখা যায় না, এ মতে এলিয়টও বিশ্বাসী। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য রচনায় আস্থা ছিল না তাঁর। এইখানে তাঁর কালের যান্ত্রিকতার ও প্রয়োগবিদ্যার মুখপাত্র তিনি। আঙ্গিকপ্রিয়তা তাঁর মধ্যে প্রায় ততোটাই আছে যতটা আছে বুর্জোয়া সমাজে। কৌশল ভিন্ন আধুনিক হওয়া অসম্ভব।

এলিয়ট সম্পর্কে ইয়েটস লিখেছেন, "Eliot has produced his great effect upon his generation because he has described men and women that get out of bed or into it from mere habit; in describing this life that has lost

heart his own art seems grey, cold, dry.” এলিয়টের আধুনিকতা তাঁর সমসাময়িক জীবনের আধুনিকতারই প্রতিভূ। এই বৃত্তের কবি তিনি, বুর্জোয়া বৃত্তের, তাঁর ধর্মবিশ্বাস এই বৃত্তান্তর্গতই এর বাইরের নয়। ইয়েটস অবশ্যি আরো বলেছেন, “I think of him as satirist rather than poet.” সে-মন্তব্য অবশ্য অযথার্থ, এলিয়ট নিশ্চয় কবি, একটি বৃত্তের কবি, অনাকর্ষণীয় এক বৃত্তের অত্যন্ত শক্তিশালী একজন কবি। তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গ আছে, সে-ব্যঙ্গ পোপের মতো নয়, সুইফ্‌টের মতো নয়, যদিও পোপের সঙ্গে তাঁর এই সাদৃশ্য আছে যে, তিনিও তাঁর সমাজের মুখপাত্র।

কনরাড এসেছিলেন পোল্যান্ড থেকে। তাঁর পিতা অংশগ্রহণ করেছিলেন বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আন্দোলনে। পিতা নির্বাসনদণ্ড পেয়েছেন এবং মারা গেছেন কনরাডকে অল্পবয়স্ক শিশু রেখে। মায়ের হাতে মানুষ তিনি, মা ছিলেন বিপ্লববিরোধী অরাজনৈতিক পরিবারের মানুষ। সেই বাল্যকাল থেকেই রাজনীতির প্রতি একটা কেন্দ্রীয় অবিশ্বাস গড়ে উঠেছে মনে। অথচ এযুগে রাজনীতির বাইরে যে জীবন নেই তা কনরাড জানেন। রাজনীতি কেমন করে মানুষের জীবনে প্রবেশ করে, মানুষকে জড়িয়ে ধরে, মানুষের জীবনের সজীবতা নষ্ট করে দেয় তা তিনি দেখিয়েছেন, অনেক রচনায়। অর্থনীতি অর্থাৎ বস্তুগত স্বার্থ কেমন করে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, সাম্রাজ্যবাদ কেমন করে মানুষকে অমানুষ করছে, স্বৈরাচারী অত্যাচার কেমন করে উন্মত্ততার সৃষ্টি করে, তার এমন চিত্র কনরাড দিয়েছিলেন যেমনটি ইংরেজি উপন্যাসে এর আগে কখনো পাওয়া যায়নি। পরেও নয়।

কিন্তু তিনি রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। রাজনীতি সমাজে পরিবর্তন আনবে, নতুন সমাজ গড়ে তুলবে এমন আশা কখনো করেন না। বিপ্লব ও বিদ্রোহের মধ্যে তফাৎ করে আপন পিতাকে তিনি বিদ্রোহী বলেছেন, বিপ্লবী না-বলে। বিপ্লবী সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটা বদলে দিতে চায়, বিদ্রোহী চায় সংশোধনের। সংশোধন প্রয়োজন হতে, সর্বাত্মক রদবদল সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। শুধু তাই নয়, যে-কনরাড সংশয়ের দিকে থেকে আধুনিকেরও আধুনিক, জীবন যাঁর কাছে, রাসেলের ভাষায়, আগ্নেয়গিরির আপাতত-শান্ত কিন্তু প্রকৃত-বিপজ্জনক উপরভাগ দিয়ে হেঁটে যাওয়া, তিনি আস্থা রাখতেন কতিপয় আপাতত-সর্বকালীন কিন্তু বস্তুত সামন্তবাদী মূল্যবোধে, যেমন আনুগত্যে ও ব্যক্তিগত সম্মানে। এই মূল্যবোধগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে মূল্যবান ছিল বটে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও যন্ত্রের যুগে তারা পরিত্যক্ত হয়েছিল। কনরাডের মূল্যবোধ পেছনকার দিনের। আধুনিকের এ এক একগুঁয়ে অনাধুনিকতা এবং বলা যাবে, প্রতিক্রিয়াশীলতা।

কনরাড কাজে বিশ্বাস করতেন, যেমন করতেন বীর-পূজারি কার্লাইল। কার্লাইল বুর্জোয়া সভ্যতার সমালোচক, অর্থ যেখানে সমস্তকিছুর নিয়ন্তা সেই ব্যবস্থাকে ঘৃণা করেন তিনি, কিন্তু তাঁর মতে, মুক্তির চাবি আছে বীরদের হাতে, এই বীরেরাই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রবল হয়ে ফ্যাসিস্ট একনায়কের চেহারায়

আত্মপ্রকাশ করেছেন। কনরাড বীরে অবিশ্বাসী। বীরও সাধারণ মানুষই। কাছে যাও, তাকিয়ে দেখ, দেখবে সে-ও মানুষ, সে তার অন্তর্গত প্রবৃত্তি ও ভীতির দ্বারা পরিচালিত, পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীবনটা মোটামুটি অর্থহীন, কাজ এর মধ্যে কিছুটা অর্থ আনয়ন করে। কিন্তু এই কাজ মানুষকে অনেক দূরে যে নিয়ে যাবে তা নয়। জাহাজের নাবিকেরা কাজের মধ্যে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত ও জীবন্ত রাখে, কিন্তু যে-মুহূর্তে জাহাজটি বন্দরে পৌঁছে গেল সেই মুহূর্তে এক মৃত্যু আসে, জাহাজের সেই জীবন তখন আর জীবন্ত নয়। কার কাজ কে করে এই প্রশ্নও কনরাড কখনো উত্থাপন করেননি। কাজের শ্রেণিচরিত্র কী, কার স্বার্থে কে কাজ করছে, কে করছে ফল লাভ এই সমস্ত বিবেচনাকে তিনি সামনে আসতে দেননি। শ্রমশোষণের সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে অগ্রাহ্য করেছেন তিনি, যদিও উপনিবেশিক শোষণের অবিস্মরণীয় ছবি আছে তাঁর Heart to Darkness খণ্ডোপন্যাসে।

প্রগতি, অগ্রগতি এ সমস্ত মিথ্যা কথা। কনরাড অবশ্যই কিপলিঙের মতো নন, জীবনকে তিনি দেখেছেন ট্র্যাজেডি হিসেবে। কিন্তু মানুষ যে উন্নত হবে তা সম্ভব নয়, তিনি মনে করেন। মানুষ সেখানেই আছে সেখানে তার পূর্বপুরুষরা ছিল। নিপীড়ন আগের মতোই চলছে, ঠিক আগের মতো নয়, আজকের যুগে নিপীড়নের পদ্ধতি ও কৌশলগুলো আরো সূক্ষ্ম ও দক্ষ হয়ে উঠেছে। Heart of Darkness-এর মার্লো যখন অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকার কেন্দ্রভূমির দিকে যাচ্ছে তখন তার মনে হয় যে, সে চলেছে মানুষের মনের কেন্দ্রীয় অন্ধকারের দিকেই, যে-অন্ধকার আজো তেমনি আছে যেমন আদিম বর্বরতার যুগে ছিল। বর্বর আফ্রিকাবাসীর চাইতে অধিক বর্বর হচ্ছে সুসভ্য অর্থলোলুপ ইউরোপীয়রা মার্লো বুঝতে পারে। তাই তো অগ্রগতির চেষ্টা পণ্ডশ্রম, প্রগতির ধারণা ভ্রমাত্মক। ইতিহাস কোনো চলমান প্রবাহ নয়, সে এক বদ্ধ জলাশয়। সবচেয়ে ভালো জীবনকে মেনে নেওয়া। অন্যত্র ঝঃবরহ নামে এক চরিত্র মার্লোকে বলছে, দার্শনিক ভঙ্গিতে, “A man that is born falls into a dream like a man who falls into sea. If he tries to climb out into the air inexperienced people endeavour to do he drowns...No! I tell you! the way is to the destructive element submit yourself, and with the exertions of your arms and feet make the deep, deep sea keep you up...” উঠতে চেয়ো না, পড়ে যাবে, ডুবে মরবে। লেগে থেকো। গ্রহণ করো, বিদ্রোহ করো না। পানি আছে, তুমিও আছ, এর বাইরে কোনো আশা নেই।

কনরাডের দৃষ্টিভঙ্গি অভিজাতধর্মী। আমরা তাঁর মধ্যে সামন্তবাদের প্রতি পিছুটান দেখি। আমরা দেখি শিল্পকলায় তিনি আঙ্গিককে মূল্যবান মনে করছেন। সামন্তসমাজের আচার-আচরণ, ভদ্রতা-সভ্যতা-সংযম যেমন ভাবে গুরুত্ব পায়, কনরাডের লেখার তেমনিভাবে রীতিকৌশল, আঙ্গিক মূল্য পেয়েছে।

কনরাডের নায়কেরা একাকী। অপরাধ আছে, আছে গোপনকথা। এই একাকিত্বও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে অন্য মানুষদের কাছ থেকে। এই একাকিত্ব আধুনিক সমাজ থেকে এসেছে। একাকিত্ব ঘোচে যখন মানুষ একের সঙ্গে অপরে সম্মিলিত হয়, বিশেষ ভাবে ঘোচে যখন সম্মিলন ঘটে কোনো একটা আদর্শের ভিত্তিতে। কনরাডের নায়কেরা কাজে মিলিত হয়, কিন্তু সেই কাজ আদর্শভিত্তিক নয়। আদর্শ যখন আসে তখন তা বরঞ্চ তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকেই খর্ব করে। রাজনৈতিক আদর্শে যাঁরা কাজ করছেন কনরাড তাঁদের বুঝতে পারেননি, বা বুঝতে চাননি, তিনি মনে করেছেন এরা পরিশ্রমবিমুখ, কর্মপলাতক। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতাকে ঢাকছে তারা আদর্শবাদিতার আচ্ছাদনে। 'চার অধ্যায়ে' সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সঙ্গে কনরাডীয় ধারণার আত্মীয়তা বিদ্যমান। এই ভ্রম বুর্জোয়া সমাজের সাধারণ ভ্রম। কনরাডের জগতে প্রেমও কোনো শুভ শক্তি নয়, প্রেম বরঞ্চ যন্ত্রণারই আকর। বারংবার দেখাচ্ছেন তিনি কেমন করে মানসিক সম্পর্কগুলো ব্যর্থ হয়ে যায়। কী করে প্রেম হয়ে দাঁড়ায় কর্তৃত্বের স্পৃহা। মানুষ কী করে শত্রুতা করে মানুষের সাথে।

জেমস জয়েসের নায়কেরাও নিঃসঙ্গ। তাদের জগতেও প্রেম কোনো শুভ শক্তি নয়। জয়েসের নায়কেরা তাই কোথায় যাচ্ছে জানে না। তারা আত্মসচেতন এবং আবদ্ধ। বুর্জোয়া তারা। বিচ্ছিন্ন নিজেদের পরিবেশ থেকে। শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, তারা নির্বাসিত। আয়ারল্যান্ডের লোক জেমস জয়েস আয়ারল্যান্ডে থাকেননি, বিদেশে থেকেছেন। এবং তাঁর নায়কেরাও নির্বাসিত মানুষই।

A Portrait of the Artist as Young Man-এর নায়ক স্টেফান ডেডালুস আপন গৃহকে ত্যাগ করল প্রথমে, তারপর তার ধর্মকে ও তার দেশকে। এই পরিত্যাগের অর্থ ক্রমাগত নিঃসঙ্গ হওয়া, ধাপে ধাপে বিচ্ছিন্ন হওয়া। Ulysses-এ দেখি স্টেফান আয়ারল্যান্ডে ফিরে এসেছে, ছিল সে প্যারিসে। তার মা মারা গেছেন, তাই আসতে হয়েছে ফেরত। সমুদ্রের কাছে একটি সামরিক টাওয়ারে থাকছে সে। ওদিকে লিওপল্ডব্লুম, বিজ্ঞাপনের এজেন্ট সে এযুগের একেবারে যথার্থ প্রতিনিধি, সে-ও অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না জীবনের। সে ছেলে খুঁজছে যেন, তার আপন ছেলে মারা গেছে খুব অল্পবয়সে। আর স্টেফান যেন পিতা খুঁজছে। লিওপল্ড নিঃসঙ্গ, সে ইহুদি একজন, ইহুদিদের মতোই সামাজিক অবস্থানে ও মনে-প্রাণে সে বিচ্ছিন্ন। এই অন্বেষণ হোমারের নায়কের অতিদীর্ঘ, বিড়ম্বিত, অন্বেষণের মতই। অথচ কত তফাত। যেন হোমারের নায়ক নতুন করে জন্ম নিয়েছে, ১৯০৪ সালের ডাবলিন শহরে। সেই প্রেমহীন নোংরা শহরের এক দিনের জীবনের মহাকাব্য জয়েসের উপন্যাস। এই মহাকাব্যে গৌরব নেই, শুধু গ্লানি ও ব্যর্থতাই আছে। এতে কোনো দুঃসাহস নেই। সমুদ্র নেই, অজানা-অচেনা দ্বীপ নেই, এমনকি সমুদ্রযাত্রার কোনো কল্পনাও নেই (যেমন আছে এমনকি টেনিসনের ছোট্ট 'ইউলিসিস' কবিতায়)।

এই নতুন ইউলিসিসের বন্ধ জীবন বুর্জোয়া সভ্যতার আবদ্ধ দশারই প্রতিভূ। এই সভ্যতার আর বিকাশ সম্ভব নয়, এখানে আশা নেই অগ্রগতির। অনেক কিছুই আছে, কিন্তু কোনো কিছুরই বিশেষ কোনো মূল্য নেই, সমস্ত কিছু সমান সমান, একইভাবে মূল্যবিহীন। এর থেকে কেউ যে বেরিয়ে যাবে তা-ও যেন সম্ভব নয়, একে পরিবর্তিত করা কল্পনাতেও অসম্ভব। চতুর্দিকে অত্যন্ত অধিক বিশৃঙ্খলা। বাইরের ছোট জীবনের চেয়ে বড় ভেতরের জীবন, তবে সেই জীবন যে বড় ঘটনায় আকীর্ণ তা নয়।

জয়েসের বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই। কোনো বিশেষ অবস্থান থেকে মূল্যায়ন করছেন না জীবনের। সেই জন্য আঙ্গিক শুধু আঙ্গিক থাকছে না, অনপেক্ষ একটা মূল্য প্রতিষ্ঠিত করছে সে। রীতি ও পদ্ধতিই অভিজ্ঞতার তাৎপর্য নির্ণয় করছে,৩বুর্জোয়া সভ্যতায় যেমনটি করে।

এই ঔপন্যাসিকের ইতিহাস সামনে চলে না, চাকার মতো ঘোরে শুধু একই বিন্দুর চতুষ্পার্শ্ব। আপন রচয়িতার মুখপাত্র হিসেবেই বুঝি স্টেফান ডেডেলুস অভিমত দেয়, "History is a nightmare from which I am trying to awake." Finnegans Wake-এ যে রচনাদক্ষতা আছে তা অত্যাশ্চর্য, যে ভাষা প্রয়োগ আছে তার উজ্জ্বলতা অবিস্মরণীয়, কিন্তু এর অন্তর্গত মানবিক অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত তাৎপর্যটা কী? মানবিক মূল্যে কতটা মূল্যবান এই উপন্যাস? উপন্যাসের শুরু এটি বাক্যের মধ্যে, আর শেষ ঐ বাক্যেরই প্রথমাংশে। অর্থাৎ ইতিহাস এগুচ্ছে না, যেখানে শুরু হয়েছে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে সেখানে এসেই শেষ হয়েছে। ইতিহাসের এই ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদীদের ইতিহাস-চিন্তার ব্যবধানটা একেবারে মূলগত। মার্কসবাদীদের ইতিহাস কেবলি এগুচ্ছে সামনের দিকে।

Ulysses সম্পর্কে এলিয়ট লিখেছেন, "I hold this book to be the most important experession which the present age has found, it is a book to which we are all indebted and from which none of us can escape." এ মূল্যায়ন খুবই স্বাভাবিক, এলিয়ট ও জেমস একই বৃত্তের মানুষ, একই ভাবে বন্দি। বিপরীত পক্ষে উদারনীতিক ফরস্টার ঐ একই উপন্যাসে মহৎ কিছুটা দেখতে পাননি। Ulysses-কে তিনি বলেছেন, the epic of grubbiness and disillusion." ফরস্টারের কথাগুলো প্রায় অনুদারই, "Joyce tries to spatter the universe with dirt and to make all our habits and ideals (art, religion and society in particular) seem ludicrous and repulsive." এলিয়ট যে-ঋণের কথা বলেছেন সে ঋণ কার? লেখকের, না সমাজের? সমাজের তেমন কোনো ঋণ নেই, লেখকের আছে, থাকতে পারে। কিন্তু লেখকও যদি ঋণী হন তবে আরেকজন লেখকের কাছে ততোটা নন, যতটা সমাজ-সংস্কৃতির কাছে। জয়েস কোনো হঠাৎ ঘটনা নন, তিনি তাঁর সংস্কৃতিরই অভিব্যক্তি।

ডি. এইচ. লরেন্স নানা দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকারের মানুষ। তিনি অসংশোধনীয় রূপে ইংরেজ, এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির মানুষ। এলিয়ট ও লরেন্স এত দূরের পরস্পর থেকে যে, কোনো কোনো সমালোচক বিশ্বাস করেন যে, এলিয়টকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের পক্ষে লরেন্সকে ঘৃণা করা আবশ্যক। লরেন্স মুক্তিতে বিশ্বাস করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিচূর্ণন অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন। তিনি সংগ্রাম, সংঘর্ষ, যুদ্ধ চান। নিরাসক্তি, সংশয়, নিরপেক্ষতার বুর্জোয়া মূল্যবোধ তাঁর কাছে তীব্রতম বিদ্বেষের বস্তু। আত্মসচেতনা বিতৃষ্ণার বিষয়। আঙ্গিক তাঁর কাছে স্বল্পমূল্য। এলিয়ট যে-অর্থে হ্যামলেটের মতো, লরেন্স সেই অর্থে ডন কুইকসটের সঙ্গে তুলনীয়। অনেকের থেকে আলাদা তিনি। 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্ব পরিত্যাগ করেন অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে। জীবনের চেয়ে শিল্প বড় এ কথা বলতে পারে তাঁর উপন্যাসের খর্বাকৃতির মানুষ লোরকে, যার স্বভাব একেবারেই ইঁদুরের মতো। লরেন্স চরমপন্থী, সংস্কারপন্থী নন, সংশোধনবাদী নন।

কিন্তু চরমপন্থাতেও ডান-বাম আছে। তাঁর চরমপন্থা ডান দিকের, বাঁ দিকের নয়। মার্কসবাদী নয়, ফ্যাসিবাদী। বুর্জোয়া সভ্যতা খান্ খান্ টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলবেন তিনি, কিন্তু কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার জন্য নয়, যন্ত্রহীন, প্রাক্তন সমাজে ফিরে যাওয়ার জন্য। যেন তিনি ভয় পেয়ে গেছেন যন্ত্রযুগ দেখে, কিন্তু ভাবতে পারছেন না তেমন সমাজব্যবস্থার কথা যেখানে যন্ত্রকে সমবেত হস্তে শাসন করবে সমাজ, যেখানে যন্ত্র মানুষের উপকার করবে, দূর করবে মানুষের দারিদ্র্য। যন্ত্রহীন সমাজে দরিদ্রের কী দশা হবে, কেমন করে ঘুচবে জাগতিক অভাব সে-কথা লরেন্স ভাবছেন না, যন্ত্রের যন্ত্রণায় এতই অস্থির আছেন যে যন্ত্রকে ভাঙাই মনে হচ্ছে প্রথম কর্তব্য।

এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শূন্যতায় জন্ম হয়েছে অবৈজ্ঞানিকতার, আদিমতায় বিশ্বাসের, যৌনজীবনকে অতিরিক্ত মূল্যদান প্রবণতার, সর্বোপরি ফ্যাসিবাদপ্রীতির। The Plumed Serpent-এ যে ভয়াবহ কোয়েট-জেলকোটল ধর্মের পুনর্জন্ম নিয়ে লরেন্স ব্যস্ত তার প্রধান আকর্ষণ অন্তর্গত ফ্যাসিবাদে। ফ্যাসিবাদী বীরপূজা লরেন্সে খুব বেশি করেই আছে। বীরের প্রতি এমন বিশ্বাস তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনো লেখকে নেই। আর যে-পাঁচজন সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করছি তাঁদের কারুরই নেই। শ্রমিকশ্রেণির অনেকগুলো গুণ লরেন্স পিতৃসূত্রে পেয়েছেন। জীবনকে তিনি অকপট উষ্ণতায় গ্রহণ করেছেন, তাঁর চেতনায় দ্বিধা নেই, কপটতা নেই, সরলতা ও স্পষ্টবাদিতা আছে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে। তাঁর রচনায় স্বতঃস্ফূর্ততা সকল সময়েই কর্মচঞ্চল। ন্যায়-অন্যায়ের বিরোধ সেখানে সার্বক্ষণিক। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি যদি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে যুক্ত না-হয় তাহলে বহুযুগের নিপীড়নে নির্যাতনে-সৃষ্ট কুসংস্কার ও মানবিক অন্ধকার থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। সেই কুসংস্কার ও অন্ধকার দেখি কার্যকর লরেন্সের রচনায়। তিনি ফিরে যেতে চাইছেন পেছনের

ইতিহাসে, আদর্শায়িত করছেন আদিমতাকে। যন্ত্রহীন নতুন সমাজ গড়ার কাজে নেতৃত্ব দেবে কে? অর্থাৎ লরেন্সের মতে, সংগঠন নয়, আন্দোলন নয়; নেতৃত্ব দেবে ব্যক্তি। অর্থাৎ ব্যক্তিকে বড় করে দেখছেন, ব্যক্তির ভূমিকা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন সমষ্টির ভূমিকাকে। এই ব্যক্তি অভিজাত। অবশ্য তার আভিজাত্য জন্ম বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল নয়, নির্ভরশীল ব্যক্তিগত গুণের ওপর। নেতা যিনি তাঁকে দেখামাত্র চেনা যাবে নেতা বলে, অঙ্গুলিসঙ্কেতের আবশ্যক হবে না, প্রয়োজন হবে না কোনো বক্তৃতার। এই নেতার কাছে জনসাধারণ যাবে, গিয়ে নতজানু হয়ে তার পায়ের কাছে বসবে, বসে বলবে, "You are greater than we. Be our lords. Take our life and our death in your hands, and dispose of us according to your will. Because we see a light in your face, and a buring on your mouth." (The Ladybird)। জীবনেও আপনি, মরণেও আপনি। অর্থাৎ কিনা দাসত্বেই মুক্তি লরেন্স বলছেন।

ফ্যাসিবাদের অপর ভিত্তি জাতবৈরিতাও প্রবলভাবে আছে লরেন্সে। সেখানেও কুসংস্কারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে আছে, যা তাঁর আঁকা একটি সহিসের চোখে ছিল, "hard, straight, fearless British stare." অব্রিটিশ লোকদের তিনি কখনো কৃপা কখনো অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। ইহুদিদের ঘৃণা করতেন। প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি উন্নাসিকতা ছিল। ওটোলিন মোরেলকে লেখা এক চিঠিতে বলছেন, "I became more and more surprised to see how far higher, in reality, our European civilization stands than the East, Indian and Persian, ever dreamed of." ঐ চিঠিতেই রবীন্দ্রভক্তি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য সরাসরি, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়, "But this fraud of looking up to them—this wretched wordhip-of-Tagore attitude—is disgusting, Better fifty years of Europe even as she is...All it (East) can hope for is to be fertilized by Europe so that is can start on a new phase." ব্যাপারটা স্পষ্ট, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকার মধ্যেই আছে প্রাচ্যের মুক্তি। পাশ্চাত্যের উৎকর্ষবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং টেনিসনের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন, যদিও ভিক্টোরীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি টেনিসনকে অনেক বেশি গ্রাম্য বলে মনে করা হয়। লরেন্স রক্তের বিজ্ঞতায় বিশ্বাসী, উষ্ণ রক্ত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য পথ-প্রদর্শক বুদ্ধির তুলনায়। রক্তের, অর্থাৎ অন্ধ আবেগ ও যুক্তিহীন প্রবৃত্তির, বিপজ্জনক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি। ফ্যাসিবাদ এই ধরনের নেতৃত্বই কামনা করে। নিজেকে তিনি ধার্মিক বলেছেন বারে বারে, অর্থাৎ যুক্তিবাদী নন তিনি। রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে ফ্যাসিবাদের জন্মের আগেই জন্ম তাঁর এই সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের।

ট্রিলিঙের বক্তব্যে ফেরত যেতে পারি। পাঠকেরা উদারনীতির দিকে এগুচ্ছেন, লেখকেরা পিছিয়ে আসছেন। এর কারণ অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক। যদি খোঁজ নেওয়া যায়, দেখা যাবে পাঠকদের ভেতরেও লেখকদের প্রতিক্রিয়াশীলতা আছে। পাঠকেরা নিজেদের চিন্তাচেতনার গভীরে যান না, না-গেলেও চলে তাঁদের, কিন্তু

লেখকদের যেতে হয়, এবং সেই সত্যসমূহকে জড়িয়ে ধরে থাকা প্রতিক্রিয়াশীলতা। এর জন্য দায়ী লেখকরা যতটা নন, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী তাঁদের সমাজ। সমাজেরই প্রতিনিধি তাঁরা, এবং সমাজের হাতে নিপীড়িতও তাঁরা, আর-পাঁচজন মানুষের মতোই।

উদারনীতির ব্যর্থতাও স্মরণীয়। ফরস্টার সম্পর্কে ট্রিলিঙ বলেছিলেন যে, ফরস্টার বড় লেখক হতে অস্বীকার করেছেন। তা করেছেন বৈ কি। করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর উদারনীতির কারণে। পুঁজিবাদী সভ্যতার সঙ্কটের যুগে উদারনৈতিক চিকিৎসা-বিধি অচল হয়ে পড়েছে। এ যুগে তাই মতবাদ প্রধানত দুটোই, মার্কসবাদ ও ফ্যাসিবাদ। উদারনীতির মধ্যবর্তিতা ও সমন্বয়পন্থা সঙ্কট-উত্তরণে সাহায্য করে না। সেই না-করার সত্যই প্রমাণিত ফরস্টার যে A Passage to India লেখার পরে আর বড় কিছু লিখতে পারলেন না সেই ঘটনার মধ্যে। প্রবন্ধ লিখলেন, বক্তৃতা-বিবৃতি দিলেন, যোগ দিলেন সভাতেও, কিন্তু উপন্যাস আর এল না। বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল জগৎকে সংঘবদ্ধ করতে পারলেন না একটি সামাজিকতার মধ্যে। যেন বিভ্রান্ত তিনি কোন দিকে যাবেন তা জানেন না। বিপরীতে, আলোচ্য লেখকদের শক্তির একটা বড় উৎস এখানে যে, তাঁরা দিগ্‌ভ্রান্ত নন। কনরাড যে সংশয়বাদী সে-কথা জোর গলায় বলাতে তাঁর সংশয় নেই। তিনি নিম্নকণ্ঠ নন উদারনীতিকদের মতো। উদারনীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার স্মারকচিহ্ন ফরস্টারের ওই-ব্যর্থতা। উদারনীতি মৃদু সমালোচনা করে, কিন্তু প্রকৃত সমাধান দেয় না। উদারনীতি ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে; ক্রুদ্ধ ও আর্ত চিৎকারের উত্তেজিত বিশ্বে শান্ত সে-স্বর শোনা যায় কি যায় না। সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়াশীলতা সুসংহত হবার সুযোগ পেয়েছে আরো একটি ক্ষেত্র থেকে। সেটা হল শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষীণশক্তি। এই লেখকদের কালে তাঁদের সমাজে এমন কোনো বড় প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি যা তাঁদেরকে দ্বিতীয় পথের সন্ধান দিতে পারত, পারত সাহস দিতে, পারত দিতে আশা।

ফরস্টার বলেছিলেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের শেষ লগ্নে জন্মেছিলেন তিনি, তাঁর সাহসের অভাব ছিল, জন্মাতেন যদি কিছু পরে তবে তিনি নির্ঘাত মার্কসবাদীই হতেন। পরের লেখকরা কেউ কেউ তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, সংগঠনেও যোগ দিয়েছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু বেশিদূর এগোননি কেউই। ওই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে কলঙ্কমুক্ত হয়েছেন শেষ পর্যন্ত। কারণটা সময়গত নয় শুধু, শ্রেণিগত এবং সংস্কৃতিগতও। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে অনেক গুণ আছে, কিন্তু সেখানে যে প্রতিক্রিয়াশীলতাও আছে তা নিঃসন্দেহে লক্ষ করবার বিষয়।

এই আলোচনা অবশ্যই একপেশে হল। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে প্রগতিশীলতাও নিশ্চয়ই আছে। যেমন বার্নার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০) ছিলেন, ছিলেন এইচ. জি. ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৬৪)। কিন্তু এঁদের কাউকেই দেখছি না যে, শ্রমশক্তির মুক্তির ওপরে যে সভ্যতার সঙ্কট-মুক্তি নির্ভরশীল এই সত্যটিকে মেনে নিচ্ছেন। শ'

বিশ্বাস করতে দীর্ঘ জীবনে, ওয়েলস বিজ্ঞানে। শ' ওয়েলসের তুলনায় বড় লেখক। কিন্তু কত বড়? যাঁদের নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তাঁদের সমান মর্যাদা বার্নার্ড শ' পাননি। না-পাবার কারণের একটা সূত্র পাওয়া যায় এলিয়টের একটি বক্তব্যে। এলিয়ট বলেছেন, “The immediate influence of—shall we say—Mr. Bernard Shaw in the period of his most potent influence, I suppose, at the beginning of this century, must have been more appreciable and more widely diffused, than that of much finer minds; and one is compelled to admire a man of such verbal agility as not only to conceal from his readers and audiences the shall-owness of his thought, but to persuade them that in admiring his work they are giving evidence of their own intelligence as well. I do not say that Shaw could have succeded alone, without that mere plodding and laborious minds with which he associated himself, but by persuading low-brows that they were high-brows and that the high-brows must be socialists, he contributed greatly to the prestige of socialisam.” কথাগুলো বলা হয়েছে লন্ডন কনজারভেটিভ ইউনিয়নের একটি সাহিত্যিক মধ্যাহ্ন ভোজে (১৯৫৫ সালে)। রক্ষণশীলদের ভোজসভায় একজন রক্ষণশীলের উক্তি এটি। এর মধ্যে যে একটা অহঙ্কার আছে সেটা মোটেই অস্পষ্ট নয়। এই অহঙ্কার শ্রোতাদের অহঙ্কার বাড়িয়ে দেয়, তাদের এই আত্মবিশ্বাসকে স্ফীত করে যে, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী না-হয়ে শুধু ঐ না-হওয়ার জোরেই উচ্চ-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া যায়।

শ' অবশ্যি নিজেই নিজের পক্ষকে দুর্বল করে দিয়েছেন এই শব্দাধিক্য-প্রিয়তার কারণে, সবকিছুকে পরিহাসযোগ্য করে তুলবার এই প্রবণতায় যে দুই বৈশিষ্ট্য মূলত ফেবিয়ান সুবিধাবাদিতারই অভিব্যক্তি। কিন্তু শ' যে এলিয়টের মতো গভীর প্রভাব ফেলতে পারলেন না তার প্রকৃত রহস্য এই যে, সে-কালের এলিট এলিয়টের ভাষাতেই কথা বলত, তারা তাঁর মতোই দেখত ও ভাবত। এলিয়ট ছিলেন তাঁর শ্রেণির মুখপাত্র। তাঁর জন্যেই তারা প্রতীক্ষা করছিল, এবং তাঁকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

কিন্তু প্রগতিশীলদের কর্মধারার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বোধ করি প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রগতিশীল ভূমিকা। লরেন্স বলেছিলেন কথাটা, “But one sheds one’s sickness in books—repeats and presents again one’s emotion, to be master of them.” ব্যক্তি সম্পর্কে যা সত্য সমাজ সম্পর্কে যা অসত্য নয়। রোগকে দেহের বাইরে বের করে দেওয়া রোগের চিকিৎসা বটে। সেদিক থেকে এই লেখকদের প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিক্রিয়াশীলতার উন্মোচন বলা চলে। তা উন্মোচন বটে, কিন্তু বিমোক্ষণ কী? বলা যাবে কি যে রোগটা বেরিয়ে গেছে? না, তা বলা যাবে না। না, বেরিয়ে যায়নি। রোগটা আসলে সামাজিক। সমাজ চেয়েছে অসুখকে টিকিয়ে রাখবে। সমাজেরই জয় হয়েছে যেমন হয়। প্রগতিশীলতার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার

উপাদান একই লেখকদের মধ্যে যুগপৎ থাকতেও কোনো বাধা নেই। আলোচ্য লেখকদের মধ্যেও প্রগতিশীলতার উপাদান ছিল, কিন্তু সে-অংশকে তেমনভাবে বরণ করা হয়নি, যেমনভাবে বরণ করা হয়েছে বিপরীত উপাদানগুলোকে। সে-জন্য লেখককে দায়ী করতে পারি যেমন, তেমনি পাঠককেও অব্যাহতি দিতে পারি না। ট্রিলিঙের বক্তব্যের সঙ্গে যোগ করতে হয় এই কথাটা যে, উদারনীতি আসলে রক্ষণশীলই, যতই-না ভঙ্গি থাকুক তার মধ্যে প্রগতিশীলতার।

## আলোচ্য লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

### ডব্লু. বি. ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩০)

আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জন্ম। পিতা ছিলেন খ্যাতনামা চিত্রকর। প্রথমজীবনে ইয়েটস জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণা দিয়ে লন্ডনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি আইরিশ সাহিত্য সমিতির। আয়ারল্যান্ডের জাতীয় নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন, নাটকও লিখেছেন সেই উদ্দেশ্যে। কাব্যজীবনের শুরুতে লিখতেন আয়ারল্যান্ডের প্রকৃতি, উপকথা ও বীরদের নিয়ে। কবি হিসেবে সারাজীবনই অগ্রসর হয়েছেন, পুরাতন রীতি পরিবর্তন করেছেন, বাদ দিয়েছেন অলঙ্কার ও বাহুল্য। বিষয়বস্তুতেও এসেছে নতুন নতুন জটিলতা। তাঁর লেখায় সব সময়েই ছিল এক ধরনের রোমান্টিকতা। তিনি বিশ্বাস করতেন আবেগে। ইয়েটস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এক সময়ে। ১৯২৩-এ সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। নানাবিধ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন তিনি।

### এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২)

জন্ম আমেরিকায়। ইউরোপে আসেন ১৯০৮ সালে। তারপর বসবাস শুরু করেন লন্ডনে। নিজে কবিতা লেখেন, এবং অন্যের লেখাকে বিশেষ করে ইয়েটস, এলিয়ট ও জয়েসের রচনাকে নানাভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেন। লেখকদের পরামর্শ দিতে সব সময়ে প্রস্তুত থাকতেন। ইমেজিস্ট নামে এক নতুন কাব্যান্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক লরেন্সের লেখার রীতি পছন্দ করতেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করতেন না। চীন, জাপান ও ইটালির কবিতার অনুবাদ করেন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ড ছেড়ে প্রথমে প্যারিস ও পরে ইটালিতে বসবাস শুরু করেন। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত কাব্য হচ্ছে Cantons। অর্থনীতির বিষয়ে কৌতূহল ও উৎসাহ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইটালীয় বেতারে ফ্যাসিবাদের পক্ষে প্রচার করেন। সে জন্য আমেরিকায় তাঁর বিচার হয়, এবং পরে মানসিক বৈকল্যের অজুহাতে মুক্তি পান।

## যোসেক কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪)

জন্ম পোল্যান্ডে। পিতা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং নির্বাসনে মারা যান। ১৮৭৪ সালে ফরাসি জাহাজে নাবিক হিসেবে যোগ দেন। পরে ইংরেজদের জাহাজে চাকরি নেন, ১৮৯৪ সালে জাহাজের কাজ ছেড়ে সাহিত্য মনোনিবেশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অ-ইংরেজ লেখকদের মধ্যে তিনি প্রধানতম। বস্তুত অন্য কোনো বিদেশি ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর মতো স্বীকৃতি লাভ করেননি। সাহিত্যচর্চা শুরু করেন পরিণত বয়সে, ইংরেজি শিখেছেন নিজের চেষ্টায়, লেখক হিসেবে ইংল্যান্ডকেই নিজের দেশ মনে করতেন। ইংরেজি উপন্যাসে দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তার সংযোজন আর আগে তাঁর মতো করে কেউ করেননি। মানুষের নৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার অবিস্মরণীয় চিত্র এঁকেছেন। দুঃখকেই জীবনের প্রধান সত্য বলে জেনেছেন। প্রধান রচনার মধ্যে আছে : The Nigger of 'Narcissus' (1898), Lord Jim (1900), Heart of Darkness (1902), Nostromo (1904), The Secret Agent (1907), & Under Western Eyes (1911).

## টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫)

জন্ম আমেরিকায়। ১৯১৫-তে এসে স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন। শিক্ষাজীবন কেটেছে হার্ভার্ড, সরবোন ও অক্সফোর্ডে। Criterion নামে একটি প্রভাবশালী সাহিত্য-সাময়িকী সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় ১৯২২ সালে The Waste Land কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘকাল ইংরেজি কবিতার প্রধান ব্যক্তিত্বদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়েই এ্যাঙ্গেলোই ক্যাথলিসিজ ধর্মমত গ্রহণ করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব-বিস্তারকারী প্রবন্ধ লিখেছেন। কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ও নিরীক্ষামূলক কাজ আছে। শুধু ইংরেজি সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্যেও এলিয়টের প্রভাব পড়েছে। ক্লাসিসিজমে বিশ্বাসী ছিলেন। ইংরেজি কাব্যের ভাষাকে সংস্কার করে তাকে মুখের ভাষার কাছে নিয়ে আসেন, সেই হিসেবে কাব্যভাষার সংস্কারকও তিনি। প্রথমে চাকরি করতেন ব্যাংকে, পরে যুক্ত হন একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। ১৯৪৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

## জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)

জন্ম আয়ারল্যান্ডে। আইরিশ ক্যাথলিসিজমের সঙ্কীর্ণতায় ক্ষুব্ধ হয়ে আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে যান। তারপর ইউরোপের নানান শহরে বসবাস করেন। দারিদ্র্যের মধ্যেই থাকতে হয়েছে, জীবিকা নির্বাহ করেছেন ইংরেজি পড়িয়ে। চোখের অসুখে কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে Ulysses (১৯২২)। এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। ১৯০৪ সালের জুন মাসের ডাবলিন শহরের একদিনের

ঘটনাবলি নিয়ে এই বৃহৎ উপন্যাস। রচনাটিকে ঔপন্যাসিক আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক বলা হয়, কেননা এতে stream of consciousness-এর ব্যবহার আছে। জয়েসের আঙ্গিকগত নানা নিরীক্ষা নানা দেশের সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। অন্য দুটি প্রসিদ্ধ রচনা হচ্ছে—A Portrait of the Artist as a Young Man (১৯১৫) এবং Finnegans Wake (১৯৩৯)।

## ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০)

তাঁর পিতা ছিলেন প্রায়-অক্ষরজ্ঞানহীন খনিশ্রমিক, মাতা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাননি, স্কুলশিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করে সাহিত্যরচনাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর চেয়ে বয়সের বড় একজন বিবাহিতা জার্মান মহিলাকে বিয়ে করে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন গৃহের সন্ধানে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডে টিকে থাকতে পারেননি যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখার এবং স্ত্রী জার্মান হওয়ার কারণে। পরে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল অশ্লীলতার। আগাগোড়াই রোমান্টিক তিনি। এবং সব সময়েই বিতর্কমূলক। প্রবলতা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইয়েটস তাঁকে পছন্দ করতেন, কনরাড করতেন না। কনরাডের লেখা তাঁর কাছে বিষণ্ন মনে হত। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব অবিসম্বাদিত। চিন্তাধারাও ছিল মৌলিক। তাঁর ইংরেজি গদ্য অতুলনীয় বলে স্বীকৃত। কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, নাটক প্রায় সবকিছুই লিখেছেন। শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর মধ্যে আছে Sons and Lovers (1913), The Rainbow (1915), Women in Love (1920) & Lady Chatterley’s Lover (1928)।

## ক বি তা

.........................................................................................

# প্র থ ম দ শ কে র ২১ জ ন ক বি র ২১ টি ক বি তা

১.

## জা হা না রা পা র ভী ন

.....................................

### অপরাধ

এক চিলতে বারান্দার দোতলা বাড়ি
বাড়িতে প্রচুর হাওয়ার আসা-যাওয়া
আর আসত চড়ুই ।
ছানাপোনাসহ চড়ুই, মা শিকার করতেন কখনো কখনো ।

বন্ধ দরজা, জানালা, ঘুলঘুলি
পাখিদের ছুটোছুটি, আর্তচিৎকার
এখনো মনে আছে মায়ের নিষ্ঠুরতা ।

শিশু সন্তানের পাতে মা তুলে দিতেন পাখি-মাতার মাংস
যার সন্তানেরা তার জন্য অপেক্ষমাণ নিকটবর্তী গাছে

বাড়ির গ্রিলে বসা চড়ুইয়ের কাছে তাই
ক্ষমা চাই আমার মায়ের অপরাধের ।

২.

## সোহেল হাসান গালিব

.......................................

## পথ ও সুড়ঙ্গ

অমন একটা-দুটো পথ এখানে সবার জানা ।
পলায়ন আর পাড়ি জমাবার কথা যতটা ভাবেনি
শিকারির হাত থেকে ফস্কে যাওয়া পাখি,
তার থেকে গভীর বেদনা-ভয়সহ ভাবনার মধ্য দিয়ে
নেমে গেছে এইসব পথ
মালভূমি ছেড়ে বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে; ঘর থেকে
ছুটে গেছে হাওয়া, দৃষ্টির গোপন আলো
স্ত্রীকে ছেড়ে পরিচারিকার মলিন ত্বকের দিকে ।
তার ধারে রথ, পালকি ও পথিক সকলেই আছে ।

পথের বৃত্তান্ত থাক । তারচে বরং সুড়ঙ্গের কথা বলি ।
অন্ধকার দেয়ালের গায়ে শ্যাওলার গন্ধ,
বুক ভ'রে আধেকটা শ্বাস না-নিতেই
কাছে আসে উনিশ শতক, হুতোম পেঁচার ডাক ।
অভিশপ্ত পাথরের মূর্তিটিকে দ্যাখো । পায়ের উপর দিয়ে তার
সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছে একটা দীঘল কালো সাপ
শীতল সংকেত কিছু টের পাও তুমি, শুনতে কি পাও
রক্তহিম আর্তনাদ, ঐ পাথরের?

সুড়ঙ্গের বাঁকে বাঁকে কত পাথরের মূর্তি ।
যদি কোনো এক ফাঁকে নেমে আসে প্রত্নচাঁদের ইশারা
প্রেতযুগ হঠাৎ পেরিয়ে!
ফোকরের জন্যে তাই কান্না ওঠে সুড়ঙ্গভুবনে,
সেই কান্না ঘিরে নাচে হিমোগ্লোবিনের ঢেউ ।

এইখানে আলো শুধু পাবে হিরেফুল, কয়লার গুহা এই মনে হয়
অভ্রসাগরের কূলে বসে উথালপাথাল করা সবুজ পুরীতে ।
আর মনে হয়, কচ্ছপের কথা, খরগোশের কথা
ঘুমন্তের পাশ দিয়ে ঠিক চলে যাবে কেউ
ডাক দিয়ে ঘুম তবু ভাঙাবে না ।

৩.

## মা জু ল  হা সা ন

.........................

## বসন্ত বিধায়

বসন্তমঙ্গল, এখন আমি কোন দিকে যাব? কোন লঙ্গিচ্যুডে?
আজও অজানাই রইল লিগার কিংবা টাইওনের মানে
কোথায় তুমি অলৌকিক বাগান? চালতাপাতার ছেলে তুমি বিচ্ছু এক
থেকে থেকে কেঁপে উঠছ দেবী-ডলের স্তনকম্প দেখে
আর বলতে হচ্ছে আমাকেই
আরব্যরজনীর লণ্ঠন ক্ষমা করবেন আমি ফিউশান বুঝি না
সান্তিয়াগোর গর্বিত ম্যাটাডোর ক্ষমা করবেন আমি খেলা বুঝি না
খোঁয়াড় থেকে, বইয়ের কুমারী গন্ধ থেকে, বারিস্তার পেয়ালা-ঝড় থেকে
আমার কেবলি মনে পড়ে যায় ববিন ও বেলফুলের কথা

তবু লিখছি শহরে বসন্ত আজ । আজ বোবাদের রঙিন মিছিল ।

৪.

## আ ফ রো জা  সো মা

................................

### রূপকথা নয়

কোথায় রংধনু সে হিসেব তোমার
আমি আছি চাঁড়ালের দেশে;
তবুও এ দেশ আমার ।

বাঁশঝাড়ে মাঝরাতে কেঁদে ওঠে যে পাখি
সে আমার অনাত্মীয় নয়
জাল ফেলে আশাহত ফিরে আসে যে
সে আমার খেলার সাথী,
তার অভুক্ত সংসারে আছে আমার স্বজন ।

আমাকে দিও না দোহাই
নগরের কবি, তোমার সুনাম আমার
স্বপ্নের সাথী নয় ।

বলতে পারো, স্বাতী তারা
যে কি-না দূরে আছে,
যে কি-না কিছু নয় রাজার কাছে
জনপদে সেই এক বন্ধুর নাম;
আকালে সে গল্প জুগিয়েছে ।

মঞ্চ তোমার হোক,
দুধে ভেজা পদাবলি নিয়ে তুমি
রাজার দরবার রাঙাও ।
আমরা কুলি ও কামিন জন,
আমার ভাই লিমনের পঙ্গুত্বের দিনেও
ভয়বন্দি সবাই গোল হয়ে বসে
শুনছি তোমার রাজশংসা বচন ।

দূরে থাকা নগর-কবি, চণ্ডালেরা জেনেছে
বাঁশঝাড়ে কেঁদে-ওঠা ঘুঘু পাখি
সে তোমার নয়;
তিতুমিরের বাঁশের কেল্লায়
যে গল্প জন্ম নিচ্ছে তা তোমার নয় ।
আমাদের ঘরে ঘরে বেড়ে উঠছে যে
কালিয়া মোহন্ত, কংকা মাঝি আর
ঘাড়ত্যাড়া কৈবর্ত যুবক
এরা কেউ মগধ বা বৈশালীর রাজকবি নয়
এরা সব চণ্ডাল, লিমনের ভাই;
রাজাকে জানিও একদিন এরাই সব রূপকথা লিখবে ।

৫.

## মে হে দি  রা সে ল

...................................

## স্বাতীনক্ষত্রের দিন: ২

তোমার ভেতরে এক সুগন্ধি ঝরনার খোঁজে
ঝাঁক বেঁধে আসে লোভী মানুষের দল
ভিখিরির মতো তারা, হীনমন্যতায় নতমুখ
গর্বিত চলনে ধাবমান তুমি, যেন কোমল সারস;
মানুষের পাপবোধ, লালিত লোভের পুঞ্জ
তোমাকে পারে না ছুঁতে কোনোদিন ।

সীমাহীন ক্লেদ আর নষ্ট কালিমার ভেতর
তবুও কেমন তুমি, নিজের নিয়মে সহজ
সাবলীল পবিত্রতা এক, সবুজ সময়;
মানুষেরা কেবল স্বভাবজাত নোংরামি ঘেঁটে

বের করে আনে অন্তর্গত পুঁজ, কালো রক্ত ।
তোমার সুগন্ধি থেকে কিছুটা দাও ওদের
ওই দুঃখী, পরাজিত মানুষের কালিমাকে
তুমি দাও শুদ্ধতার প্রলেপ, শুশ্রূষার স্নান
আবার জীবনে তারা ফিরে পাক প্রবাহের গান ।

৬.

## স ফে দ ফ রা জী

................................

## সন্ধ্যাতারার সংসার

একশো একটি ভর্ৎসনা সয়ে যাওয়ার পর তুমি এক সুখী জীবনের দেখা পেতে পারো, আবার না-ও পারো– এই কারণে হয়তো ধূলি ও চিতার পৃথিবীতে ধ্রুব বলে কিছু নেই, সত্য বলে কিছু নেই, শুধু নতজানু দীর্ঘশ্বাস আর গোপন ক্ষত রয়েছে ।
যেখানে অবতারের ছদ্মবেশে আগুনের ঘোড়া অহর্নিশ নেচে চলে, গোপনে, তার পিঠে বসে নিরানব্বই চক্ষুঅলা কোনো ছায়াদানব হু হু করে হাসে, আর অকারণে পথে-ঘাটে, হাওয়ার গভীরে বুনে যায় অলীক নক্ষত্রমুদ্রা, জতুগৃহ ও বেদনার চোরা ফাঁদ ।
হয়তো স্বপ্নের ময়ূর তাড়া করে ছুটতে ছুটতে
নিজের অলক্ষ্যেই মানুষ
আটকে যায় সেই ফাঁদে, সেই গৃহের মায়া ও
ম্যাজিকে যেখানে নির্মম ভর্ৎসনাচাবুকের সঙ্গেই
দেখা হয় শুধু, জীবনে, মৃত্যুর অধিক ।

৭.

## ফে র দৌ স  মা হ মু দ

..................................................

## সিরাজউদ্দৌলা এবং আমার গল্প

নীলচে কোনো অক্ষর ছুঁয়ে যখন ইতিহাসের রাজ-রাজড়াদের সাথে হ্যান্ডশেক করি
সেদিন আর ঘুমাই না এই ভয়ে, যদি আমার মুণ্ডুটা ফেলে দেয়
ইতিহাসের জল্লাদ ।
যদি
জেগে না-উঠি গ্রীষ্মপ্রধান এই নদীর দেশে । নদীকে মুগ্ধতা আপ্যায়ন  করে
শুনেছি বহুবার পানির তলার তবলা;
একবার লঞ্চ থেকে টুপ শব্দে পড়ে গিয়েছিল আমার বিয়ের জুতো,
নিজেকে মনে হয়েছিল সিরাজউদ্দৌলা । এই কথাতেই, হ্যাঁ
এই কথাতেই–
ওরা বলেছিল আমার মাথায় গোলমাল আছে ।
আসলে, গোলমাল তো আছেই; নইলে আমি কেন নিজের নামটা
ভুলে
স্মরণ করি শৈশবের বাজপড়া তালগাছটাকেই ।

৮.

## জা হি দ  সো হা গ

............................

## দুপুরের কবিতা

ব্লাউজের ভেতরই এর সুরভি পাওয়া যায় । নইলে স্তন দুটোয় গলা চকোলেট কেন! পপিক্ষেতে দীর্ঘকাল ব্লেড আর রৌদ্রের ডানায় ঘুমন্ত থেকে সবে ভাবছি আমাকে বুঝি ডেকেছিল স্বৈরিণীর জঙ্ঘা । কিন্তু আমার তো রক্তে অ্যালকোহল, মানে

বিষণ্নতার ঋতুতে ফলছে নিষ্ফল বিদ্যুৎ যেন ভীত হয়ে উঠছি বদ্বীপে গুল্মলতায়। কিন্তু এমন তো ছিল না নারী মানে যে মাংসের ফোয়ারা সে কথা ভাবি না আজো তাহলে একটা মাছরাঙা হাঁটুঅব্দি জলে দেখে শুধুই মাছের কঙ্কাল!

এখন প্রতারণার মতো নারী আর পুরুষের রাত্রির বরফ জল। যাতে হয়তো উপচে উঠবে শ্যাম্পেনের মেদ। যাকে আমি সমুদ্র ভেবে মরে থাকব চিলের নীলঘন আকাশে। আমার মতো পুরুষের তো দুঃখ করারও কিছু নেই।

৯.

## ল তি ফ  জো য়া র্দা র

.................................

## যাব কি যাব না

যখন ট্রেন এল রাত্রি দ্বিপ্রহর
সবাই ঘুমিয়ে আছে...
শুধু জেগে আছে মাতাল শহর।

যাব কি যাব না, চোখে জ্বলছে আগুন...
মনের দরজায় কড়া নাড়ে দীর্ঘ সময়ের নির্ঘুম–
জনতার কাতার– কোটি কোটি হাতছানি–
ধকধক বুক, তবু যেতে চায় মন!

মাটি বিবর্ণ হয় বৃষ্টির জন্য যেমন
আমার ভেতর আমি তেড়ে উঠি তেমন:
আমি ঈশ্বর আমি জনতা আমিই ‘বিপ্লব বিপ্লব’
দীর্ঘ দীর্ঘ সময়ের এক দীর্ঘ নির্ঘুম! ...

১০.

## শ র মি ন  নি শা ত

.............................................

# যে রোদে ছায়া লেগে থাকে

রোদের ঘোরে দুপুর কাছাকাছি এলে
নির্জনতাকে ডেকে আনে একটি দাঁড়কাক
ঠিক তখন খাঁ-খাঁ দুপুরের রোদ
আমাকে একা পেয়ে বসে–

কাচারিঘরের চালের উপর বসেই কাকটি ডাকতে থাকে
দু'-একদিন রান্নাঘরের টালির উপরও বসে
মাটিতে তখন হা-হা কুকুরের জিহবা ভাসে–

ভাবি এইসব বুঝি দুঃসংবাদ বাহক
অথবা প্রতিপক্ষের চর
অথবা আগাম তথ্য দিতে আসা কেউ

তাড়িয়ে দেব নাকি দেব-না
তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলেই
অজানা ঘটনার অদৃশ্য টানে আটকা পড়ি

কর্কশ কাকটি ডেকেই চলে
ডেকে ডেকে দুপুরেরও মনটাকে কর্কশ করে তোলে

কয়েক মুঠো মুড়ি ছুড়ে দিলে
দাঁড়কাক নিচে নেমে আসে
একপা-দু'পা করে ঘুরে-ঘুরে খায় আর ভয়ে-ভয়ে হাঁটে

কাককে চিনতে চেষ্টা করে দুপুরের রোদ
যে-রোদে ছায়া লেগে থাকে
কাকের ছায়া বড় অস্থির ছোটে
কর্কশ ডাকেরও ভেতর নিস্তব্ধতা এত

অনেকক্ষণ পর আমি কাকটিকে উড়ে যেতে দেখি–
দুপুরের রোদকে উবে যেতে দেখি–
যে-রোদে ছায়া লেগে রাত্রি নামে–
রোদ নাই ছায়া নাই– এখন গভীর রাত;
অন্ধকার দেখি, দিনের শব...

১১.

কা জী ব র্ণা ঢ্য

.......................

## জন্মসত্য

বের হতে হতে ভিতর ভুলে গেছি
ভিতরে রন্ধনশালা
মা রান্না করছেন জন্মসত্য

বাইরে হাঁটতে হাঁটতে ভুলে গেছি
পায়ের নিচে শৈশব মাটি
নদীর ধারায় মা রান্না করছেন
ভুবন যন্ত্রণা

পেঁয়াজ কাটা আর ধোঁয়া তাড়ানোর ভান করে
চোখের স্নেহে নিভাচ্ছেন চুলো
মা জানেন না
আগুন কখনো নিভে না
আগুনের দৃশ্য নিভে যায়।

১২.

## অ ভি জি ৎ  দা স

..........................

### হাহাকার

মাটির সঙ্গে কৃষকের যে সম্পর্কসূত্র তার ভেতরে লাঙলের ফলার অনিবার্যতা কতটা গভীর এ নিয়ে ভাবতেই একটা হামিংবার্ডের ডানা নাড়বার চঞ্চলতার চেয়েও কম সময়ে আমার ভাবনারা অন্যত্র বসতি গড়ল, আর সেই মুহূর্তটাকে ধরতে তেড়ে আসছে অসংখ্য ক্লিকনির্ভর ডিজিটাল বাটন!

অন্নপ্রাশনের দুপুরে কৃষকের সাথে মাঠের দূরত্ব বিষয়ে শিশুটি বক্তৃতা করে সমাগত অতিথিবৃন্দের উদ্দেশ্যে। এই শিশুটি যেদিন বড় হয়ে ধবল ত্বকের বিদেশিনী সাথে করে বিলুপ্ত পেশাজীবী নিয়ে গবেষণা করতে আসবে ফিরে গ্রামে, তখন তো লোকজ যন্ত্র হিসেবে লাঙল আর সম্প্রদায় বলতে কৃষককেই বেছে নেবে! তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'হাহাকার' ছাড়া আর কিই-বা হতে পারে!

১৩.

## সু ম ন  সা জ্জা দ

..........................

### জুয়াড়ি

লোকেরা জমি কেনে, জমি। ধরিত্রীর গায়ে দেয় সীমানা প্রাচীর।
আনন্দ-হাওয়ায় নাচে নাম-ধাম-ঠিকানা-সাকিন।

ঘরের সামনে থাকে তিন ধাপ সিঁড়ি।
এক ধাপ জন্ম এক ধাপ জীবন এক ধাপ মৃত্যু বিচ্ছিরি।

সামান্য লম্পট আমি খেলি তিন তাস, জন্মজুয়াড়ি ।
ঘর নাই বাড়ি নাই বৃক্ষতলে বাস । সাড়ে তিন হাত

মাটির নিচে ঢোকে কি বাতাস? আড় চোখে দেখে নিই
প্রতিটি বাড়ির সামনে দোল খায় প্রতিবেশিনীর শুকাতে দেয়া শাড়ি ।

লোকেরা জমি কেনে । দাগ নকশা খতিয়ান ।
লোকেরা হিসাব করে আয়-ব্যয় শতকরা হার ।

লোকেরা জমিতে তোলে দখিনদুয়ারি ঘর ।
লোকে বলে, তাই দেখে মিটিমিটি হাসেন ঈশ্বর!

**১৪.**

## মা সু দ  প থি ক

...........................

## কৃষক আন্দোলন

আমাদের অতিপ্রিয় গাভীটি হারানোর পর
আমিও নিখোঁজ হয়েছিলাম

কেননা গাভীটি ছিল প্রজনন উন্মুখ
তার গর্ভে ছিল যে ভ্রূণটি, সে আর কেউ না
ছিলাম আমিই

১৫.

## মা দ ল  হা সা ন

.........................

### বাঁশিঅলা

নিশ্চিত, কিছুই শেখাবে না বাঁশিঅলা
ইঁদুর তাড়াবে না সে একথাও ঠিক
শুধু চায় জনে জনে বাঁশি কিনে নিক
তবু 'চলে যাও' একথা যাচ্ছে না বলা

কেননা তখন সুরের সমুদ্রে চূড়া
জেগে উঠেছিল এক ডুবো পাহাড়ের
আর তাতে বসেছিল সমুদ্র-ঘুঘুরা
রিকশা, গাড়ি সব স্থির আর আহারের
কথা ভুলে গেল ওই পথের শিশুরা,
কান্না নয়, হাসি শোনা গেল অনেকের ।

গান শেষে যেই চলে গেল বাঁশিঅলা
ডুবো পাহাড়টা পুনরায় গেল ডুবে
সুরের সমুদ্র শান্ত, নীল, রজঃস্বলা,
সমুদ্র-ঘুঘুরা সব উড়ে গেল পুবে ।

১৬.

## মি জা নু র র হ মা ন বে লা ল

.................................................

## শোককুমারী

কালো কালো ছায়াদল হাঁটে
ছায়ার পিছনে মানুষ...

চারদিকে তুমুল প্রার্থনা কংক্রিটের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি
সড়কে সড়কে
সড়ক উঠছে জাদুর ঘরের উঠোনে
উঠোন জুড়ে গোল্লাছুট
মুক্তবাজার, অর্থবাজার, মগের মুল্লুক!

চাঁদকুমারী কালো মেঘে ডুবে গেলে
মানুষের পিছনে ছায়া, ছায়ার পিছনে ভুল, ভুলের পিছনে জীবন

এই জীবনের অমীমাংশিত খণ্ড-খণ্ড খতিয়ান যদি
কালো মেঘের জলে
ভিজে যায়

শোককুমারী প্রথম মাসিকের থোকা-থোকা কালো রক্তান্ধকারে
অনায়াসে সমাবেশ করবে
শোক-পাথর কোটি মানুষ...

১৭.

## মা সু দ  হা সা ন

..........................

### ছায়া

একা, যখন যন্ত্রণার কথা ভাবি, অন্ধ ছায়ার ওপর হাত বোলাই তখন বোকা হয়ে যাই। ছায়ারা তো অন্ধকারেরই রূপ। যে একদা হিজলবনে এসেছিল মেঘকালো অন্ধকার হয়ে। একি তার ছায়া-রূপ।

তাকে ছুঁতে পারিনি। সে এক লাবণ্যময় গরিমা নিয়ে স্বপ্ন-মাখা দিনের প্রতিচ্ছবি আঁকে, নিজের। ছুঁতে গেলে ছায়ারা একা, চিৎকার করে।

সে আমাকে বন্দি করেছে। হৃদয়ের তন্তুগুলো ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়েছে। অভিশপ্ত আমি ছায়াচ্ছন্নের কাছে বারবার ছুটে যাই, আনন্দ উল্লাসে শিউরে উঠি– চিনতে পারি না তারে, অন্ধকারে।

১৮.

## পি য়া স  ম জি দ

...........................

### শিল্পী

কাকভোরে ঘুম ভেঙে যায় মা'র।
সেই সকাল থেকে শুরু হয়
তার শিল্পকলার আয়োজন।

গনগনে উনুনের আঁচ সইতে সইতে

আর নাশতার টেবিল সাজানোর মধ্য দিয়ে
তিনি রচনা করেন
অনুপম ভৈরবী ।

দুপুরের দিকে এই গীত
আরো ঘন হয়
মধ্যাহ্নভোজের চকমকি বাহারে ।

সূর্য ডুবতে না-ডুবতেই
আবার তার ওপর ভর করে
রন্ধন-পূরবী ।

রাতের খাবার শেষে
আমরা টের পাই
দিনভর মায়ের গেঁথে তোলা
গানটার সম্পূর্ণ সুর-তাল-লয় ।

পঁচিশ বছর ধরে দেখছি
মায়ের এমন নিবেদিত সংগীতসাধনা ।
এখন আর কাউকে
তার চেয়ে বড় শিল্পী মনে হয় না ।

১৯.

## তা রি ক  টু কু

.....................

### পথ

চির অন্ধকার আসে নিজেরই মুখশ্রী চিরে। আমরা পাশাপাশি বসে আছি, বহু দূরে একটি পথ আমাদেরই কথা যেন বিসর্পিলভাবে বলে যায়। এইখানে ঘড়ি নেই। তাই সময়চিহ্নিত আলোটিও নেই।

ধরা যাক রাত্রি :

আমি কি আর্দ্রা বা কেতুকে পাহারা দিচ্ছি? তাহলে কি তোমাদের এ ভোজসভায় এসে আমার অনুপযুক্ততাগুলো বোঝা যাবে। পাশে কোনো পশু এসে দাঁড়িয়েছে পা থেকে রুধির ঝরছে। নিজেই অবাক হয়ে নিজের চুইয়ে পড়া রক্ত দেখছে। আমরা পথটির দিকে চেয়ে আছি।

কোথাও ঢুলি বাজছে।

ধরা যাক বিকেল :

বহু উল্লাসধ্বনি ফেলে এসেছি। কত উপকথা আর অশ্রু ফেলে ওই সূর্য গড়িয়ে নামছে।
এখন গোধূলি, কোনো কোনো পাতার রং লাল। কী রকম ভার নিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। এমন ভাবনায় বিহ্বল আমি কথার তোরঙ্গ খুলে বসেছি।

রাস্তায় উন্মাদের গানের মাঝে ছায়া আর চির অন্ধকার দোদুল্যমান।
রাস্তায় উন্মাদের গানের মাঝে ছায়া আর চির অন্ধকার দোদুল্যমান।

এর মাঝেই পাখি ডাকছে, ছাত্রেরা বাড়ি ফিরছে। একটি আপেলের মাঝখান থেকে গড়িয়ে নামতে থাকা আভা যেন আরও রক্তবর্ণ হয়ে ওঠেছে। এর নামই কি সুর, আলোর সাথে সাথে নাচছে, নিভে যাচ্ছে।

**২০.**

## চা ণ ক্য বা ড়ৈ

........................

## স্কুলদিন

বালিকা, তোমার স্কুলদিন হালোটের পথ ধরে চলে যায়। কাগজসাদা স্কার্ফ ওড়ে ঘুড়িছেঁড়া উদ্দাম হাওয়ায়। বাতাসের কবলে আজ তুমি; বাতাসের কবলে আজ অপরিণত স্তনের লাজুক সম্ভ্রম।

সহপাঠীর অজস্র দৃষ্টিব্যূহ ভেঙে সবুজ খেতের আলো তুমি এক টিয়েরঙ পরি অথবা সফেদ পারাবত হয়ে ওড়ো; তোমার ওড়ার পদ্ধতি অভ্যাস করে অসংখ্য তিলরঙ ডানার চিল।

তোমার স্কুলদিন টেন্‌স, অ্যালজেব্‌রা-আতঙ্কিত; গরিব পিতার ঘরে প্রেমচিঠি লুকানোর গুপ্ত সিন্দুক খুঁজে হয়রান কাঙ্ক্ষিত বাসনায় কল্পিত; তরুণ শিক্ষকের সুন্দরী গৃহিণী, বয়স্কা শিক্ষিকার লাজুক পুত্রবধূ, স্কুলের প্রধান ফটক থেকে বাড়ি অব্দি জীবনের ভোমরা হাতে দাঁড়ানো অসংখ্য যুবকের শিশ্নতোষ অলীক ফ্যান্টাসি কামনার জল।

তোমার স্কুলদিন স্বপ্নপুষ্পকরথে চড়ে আসা প্রার্থিত পুরুষে কল্পবিভোর অগণন অনাম্নী নক্ষত্র-আগুনে মিট মিট জ্বলে...

২১.

## আ প ন  মা হ মু দ

.............................

### বটগাছ

আমার মাথায় শেকড় রেখে একটা বটগাছের বেড়ে উঠবার কথা ছিল কথা ছিল নিদাঘ দুপুরে পাতা নেড়ে নেড়ে সে সবুজের নেতৃত্ব দেবে, ছায়াদের অভিভাবক হবে, পাখিদের আশ্রম তার কিছুই হল না আমার ফলাকাঙ্ক্ষী মা-বাবা বটগাছের পরিবর্তে আমার মাথায় মধ্যবিত্তীয় একটা ফলের বীজ বপন করে দিয়েছেন আর কতটা পরিচর্যা করলে গাছটা সামাজিক হবে, ধার্মিক হবে, সুস্বাদু ফল দেবে তারই দেখভাল করছিলেন আমার শিক্ষক-শিক্ষিকারা

তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমি এখন একটা সুশীল ফলগাছ নিয়মিত অফিসে যাই বাড়িতেও টাকা পাঠাই

আমার আর বটগাছ হওয়া হল না।

## প্র থ ম  দ শ কে র  ২১  জ ন  ক বি র  ২১  টি  ক বি তা র  ৩ টি  আ লো চ না

...............................................................................................................

## একই কবিতা নিয়ে তিন অলোচকের তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া

[এ-সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতার কবি সকলেই প্রথম দশকের। এ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলোর কবির নাম মুছে দিয়ে এবং যে ক্রমানুসারে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে সেই ক্রম এলোমেলো করে দিয়ে এগুলোর ওপর আলোচনা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম দেশের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধক, গল্পকার ও কবি সুব্রত বড়ুয়া, নব্বইয়ের

কবি পাবলো শাহি ও দ্বিতীয় দশকের কবি মামুন অর রশীদ-কে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে এঁরা আলোচনা তিনটি সমাপ্ত করে গোলাঘরে ছাপার জন্য দিয়েছেন। এঁদের কাছে গোলাঘর-এর পক্ষ থেকে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কবিতার সঙ্গে কবির নাম না-থাকায় আলোচকত্রয় কবির নাম উল্লেখ না-করে শুধু কবিতার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা তিনটি সম্পন্ন করেছেন। এতে আলোচনা কবি-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়। তিন কবি-আলোচকের মূল্যায়নে নিশ্চয়ই ভিন্নতা থাকবে; এটি হয়তো সত্যিই কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার। কবিতাগুলো কেমন হয়েছে এবং এর ওপর আলোচনা কেমন হয়েছে সেই রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠকের ওপর বর্তায়। নতুন দশক মানে নতুন সময় মানে নতুন প্রত্যাশা আর নতুন সৃষ্টি– সেই নতুনের খোঁজে নেমে আমরা যাঁদের কবিতা এ-সংখ্যায় ছাপতে পারলাম না, তাঁদের এমনটি ভাববার দরকার নেই যে, আমরা শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এই ২১টি কবিতা ছেপেছি। অন্য সৃষ্টির মতো কবিতাও মৃত্যু পর্যন্ত ধারণ এবং সেইমতো চর্চা করে যাওয়ার বিষয়; কাজেই এই সংখ্যায় যাঁদের কবিতা ছাপা হল না, তাঁদের কবিতা পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গোলাঘর-এ ছাপা হবে। যাঁদের কবিতা এই একুশের মধ্যে ছাপা হল না, তাঁদের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি। যাঁদের চর্চা এখনও বড় কোন কাল বা সময় অতিক্রম করেনি, তাঁদের নিয়ে বিশেষ তালিকা তৈরির হীন উদ্দেশ্য আমাদের অন্তত নেই। কাজেই আশা করা চলে, আমাদের ওপর কারোরই ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আর থাকল না।

উল্লেখ্য, পাবলো শাহি'র "বাক্যের অযৌক্তিক প্রকাশ-ই কবিতা : প্রথম দশকের কবিতায় এই ব্যাপারটি প্রায় অনুপস্থিত?"-এমন বাক্য দ্বারা আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, তিনি প্রথম দশকের কবিতাকে ভালো বলেলন নাকি মন্দ বলেলন; তবে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চইলে তিনি বলেন, তাঁর মতে কবিতার সংজ্ঞা হলো, বাক্যের অযৌক্তিক প্রকাশ-ই কবিতা, **যা** প্রথম দশকের কবিতায় প্রায় অনুপস্থিত। মামুন অর রশীদ-এর আলোচনায় একুশজন কবির ক্ষেত্রেই 'শুভেচ্ছা', 'অভিনন্দন' ইত্যাদি ধরনের শব্দ ছিল, যা সম্পাদনা করা হয়েছে। –সম্পাদক দ্বয়]

# শূন্য দশকের কবিতা: বুক বাঁধি আশায় তবু

সুব্রত বড়ুয়ার

১. মানুষের নিষ্ঠুরতার কোনো সীমা নেই। শেষও নেই। এই সত্য উচ্চারণই কবির লক্ষ্য। সহজ সরল স্বীকারোক্তি। নিরাভরণ। নির্মেদ কবিতাটি বুকের মধ্যে গিয়ে আঘাত করে। এর বেশি আর কী!

২. সুড়ঙ্গের অন্ধকার ও রহস্যের সঙ্গে মিশে গেছে কবির বক্তব্য। অনুভূতি শুধু কবিরই বটে, তবে চিত্রবর্ণনায় তার কিছুটা পাঠকেরও চিত্তে এসে পৌঁছে যায় বৈকি।

৩. এই কবিতার আত্মমগ্নতার মধ্যে দেশ-দেশান্তরের নানা বিষয় হয়তো অনেক কথাই বলে। কিন্তু সে একেবারে কবিরই নিজস্ব। পাঠকের কাছে তার কতটা পৌঁছে জানি না।

৪. সত্যিই তো রূপকথা নয়, এ কবিতা। নগরের কবি যে স্বপ্ন ও কুসুমের কথা বলেন তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে নিচুতলার মানুষের জীবনকে স্পর্শ করাই কবির অঙ্গীকার। বলতে পারি কবিতা শুধু কবিতাই নয়, জীবনসত্যের আবাহনধ্বনিও বটে।

৫. শুদ্ধতার দিকে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকার কবিরই উচ্চারণ, এ-কথা অস্বীকার করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। তবে সে উচ্চারণ আত্মগত বলেই উচ্চকিত নয় যদিও, তবু তার আহ্বান মৃদু হলেও টের পাওয়া যায়।

৬. সংসার কেবলই মানুষকে নানা বাঁধনে বেঁধে রাখে কবির উচ্চারণে তা আবার মনে পড়ে যায়।

৭. বক্তব্য তো আছেই, প্রচ্ছন্ন যদিও। মনে হয়, আরো কিছু থাকতে পারত যা পাঠককে কবিতার শরীরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে।

৮. নারীই পুরুষের আরাধ্যা, কাঙ্ক্ষিতাও বটে, রহস্যময়ী-শরীর এবং শরীরের সম্ভার ছাড়িয়ে মনের রহস্যলোক ঘিরেও। কথা শুধু এইটুকুই, তবু নানা চিত্রের মধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক-অসম্পর্ক জেগে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত শরীরকেই আশ্রয় করে কি?

৯. ভালো করে বুঝতে পারার আগেই কবিতা থমকে দাঁড়ায়। আরো কিছু কথা কবি শোনালেও পারতেন এমনই তো মনে হয়।

১০. নানা চিত্রকাব্যের মধ্যে কবির অবলোকন ও অনুধাবন, যেন কবির সঙ্গে সবটুকুই দেখা হয়ে যায়।

১১. সত্য অনুধাবনের খ চিত্রের কবিতা, যেন পুরোপুরি উপলব্ধির মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না। আরো কিছু কি পাওয়ার ছিল?

১২. হয়তো কবির কণ্ঠে আপ্তবাক্যই শুনেছি। তাই ভাবতে ইচ্ছে করে আমাদের অনুভব ও উচ্চারণের মধ্যে ফাঁকি কতখানি? ভদ্র-পরিশীলিত-শিক্ষিত মানুষদের আত্মবিচ্ছিন্নতার গল্পই বুঝি শুনি এ কবিতায়। সত্যিই কি হাহাকার করবে ভদ্রলোকেরা?

১৩. ইঙ্গিতময় কবিতাটির সহজ ও সরাসরি বক্তব্য ভালো লাগল তো বটেই সে কথাই কেবল বলার আছে আমার।

১৪. তত্ত্বকথার রহস্য উদ্ধার হল না।

১৫. অনুভূতির আনন্দই কবির কাছ থেকে পেলাম। জীবনে সেটিই তো এক বড় পাওনা।

১৬. কবিতার সব কথা বুঝতে পারার সময়ই তো পাওয়া গেল না– কবির একান্ত আত্মগত উচ্চারণ ছাড়া।

১৭. কবির কী বক্তব্য তা বুঝতে পারা গেল না। কিছু কিছু উল্লেখের মধ্যে কেবল ঝলসে উঠেছে কবির অনুভব।

১৮. মায়ের কর্মচিত্রের নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও কবিতা হিসেবে সার্থকতা এসেছে বলে মনে হল না।

১৯. কবিতার কথার সঙ্গে সঙ্গতি ঘটল না। কথা হয়তো বিস্তর, কিন্তু আমার বোধের বাইরে তার বিস্তার।

২০. কী বলতে চাইলেন কবি তা স্পষ্ট হল না আমার কাছে।

২১. বটগাছের প্রতীকে একজন মানুষ হয়ে ওঠার কাজটি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত কার পক্ষেই-বা সম্ভব? গভীর অনুভূতির এ উচ্চারণ বোধকে নাড়া দিয়ে যেতে চায় নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে কবিতার আশ্রয়ও তো থাকা চাই।

## বাক্যের অযৌক্তিক প্রকাশ-ই কবিতা : প্রথম দশকের কবিতায় এই ব্যাপারটি প্রায় অনুপস্থিত?

...................................................................................................

### পা ব লো শা হি

১.

**অপরাধ**

কবিতার জন্য জরুরি বস্তুগত পরিবর্তন। যা কবি লেখেন তা নয়, যা লেখেন না সেই ভাব প্রকাশ করা। 'অপরাধ' নিরেট বর্ণনা আছে, কবিতা নয় 'নার্সারি কবিতা' বলা যায়।

২.

**পথ ও সুড়ঙ্গ**

'পথ ও সুড়ঙ্গ' ১ম কবিতার মতো নেরেটিভ। ভালো লাগল 'পরিচারিকার মলিন ত্বক' ব্যবহার কিন্তু 'হিমোগ্লোবিনের ঢেউ' কবিতার শব্দ হয়ে ওঠেনি। 'অভ্রসাগরের কূলে উথালপাথাল' 'গভীর বেদনাভয় সহ' বিশ্লেষণের ক্লিশে ব্যবহার কবিতা নয়– বাক্যকেও দুর্বল করে তুলেছে।

৩.

## বসন্ত বিধায়

‘বসন্ত বিধায়’ কবিতায় চমক দেবার চেষ্টা আছে যা কবিতা গ্রহণ করেনি, কবিতার অর্থ আছে ব্যঞ্জনার ভিতর অনেক চমকপ্রবণতার অপচেষ্টার মধ্যেও ‘আজ বোবাদের রঙিন মিছিল’ ভালো লাগল।

৪.

## রূপকথা নয়

‘রূপকথা নয়’ নামে ছাড়া কোথাও কবিতার অতীন্দ্রিয় জগৎ নেই।

৫.

## স্বাতীনক্ষত্রের দিন: ২

‘স্বাতীনক্ষত্রের দিন: ২’ কবিতায় কবিতার প্রাথমিক চেষ্টাও অনুপস্থিত। জানি না এটা কবিতার কোন ব্যঞ্জনা ধরে আছে!

৬.

## সন্ধ্যাতারার সংসার

‘সন্ধ্যাতারার সংসার’ কবিতাটি বাক্যের অযৌক্তিকতা প্রকাশ করে কবিতা হয়ে উঠেছে। ভালো লেগেছে। কবিতার রচনাশৈলীতে নিজস্বতা আছে।

৭.

## সিরাজউদ্দৌলা এবং আমার গল্প

‘সিরাজউদ্দৌলা এবং আমার গল্প’ কবিতাটি ভালো। ভাবকে বিশেষ বস্তু দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা। বস্তুকে কেন্দ্র করে আইডিয়ার প্রকাশ। ‘ইতিহাস’ ‘সিরাজ’ মিশে যায় ‘বাজ পড়া তালগাছটাতে’ ভালো, সুন্দর প্রচেষ্টা।

৮.

## দুপুরের কবিতা

‘নার্সারি’ কবিতা থেকে কবিতা হওয়ার দিকে ধাবিত। ‘ডেকেছিল স্বৈরিণীর জজ্ঝা’ প্রয়োগটি ভালো লেগেছে।

৯.

**যাব কি যাব না**

'যাব কি যাব না' কবিতাটিকে ক্লিশে মনে হয়েছে অন্তত শব্দ ও প্রকরণগত মুন্সীয়ানাতে। অন্তত কবিতা তো প্রকরণগত কৌশল এক অর্থে?

১০.

**যে রোদে ছায়া লেগে থাকে**

'যে রোদে ছায়া লেগে থাকে' শুধু নেরেশন তো কবিতা নয়। মগজ কল্পনা করবে সেই অবকাশ নেই। তবে ভালোলাগা কিছু চিত্র আছে।

১১.

**জন্মসত্য**

'জন্মসত্য' নিজের করে বলার চেষ্টাটি ভালো। তবে কল্পনা করার সুযোগ কম।

১২.

**হাহাকার**

'হাহাকার' কবিতাটি একটি প্রতিবেদনের মতো।

১৩.

**জুয়াড়ি**

'জুয়াড়ি' অত্যন্ত কাঁচা লেখা। কবিতা নেই।

১৪.

**কৃষক আন্দোলন**

'কৃষক আন্দোলন' এর ঠিক আগের কবিতাটির অনুরূপ।

১৫.

**বাঁশিঅলা**

'বাঁশিঅলা'– হতাশ হয়েছি, এগুলোও কবিতা হিশেবে মুদ্রিত হলে, বিপ্লবীরা কী করবেন? ওদের ভাষা কেড়ে নিলে।

১৬.

**শোককুমারী**

‘শোককুমারী’ পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কোনো একটিও নেই এখানে। আগেরটির মতো।

১৭.

**ছায়া**

‘ছায়া’ কবিতার দানা বাঁধবে বাঁধবে বলে শেষ পর্যন্ত দানা বাঁধেনি। তবু চেষ্টাটা ভালো লেগেছে।

১৮.

**শিল্পী**

‘শিল্পী’ ‘সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি’ জীবনানন্দ দাশের এই কথাটি পড়ার অনুরোধ জানায়।

১৯.

**পথ**

‘পথ’ যেরকমটি বাস্তব সেরকমটি শিল্প নয়; শিল্প তো বাস্তবের রিফ্লেকশন।

২০.

**স্কুলদিন**

‘স্কুলদিন’ পূর্ববৎ।

২১.

**বটগাছ**

‘বটগাছ’ এই কবিতার ভাবনা ও রচনাশৈলী নিজস্ব। ভালো লাগল। যদিও শব্দ ব্যবহারে আরও একটু পরিমিতিবোধ থাকলে ভালো হতো।

## প্রথম দশকের কবিতা :
## আধা-সিকি হওয়া, না-হওয়ার দোলাচল

.................................................................

**মা মু ন অ র র শী দ**

১.

**অপরাধ**

এখানে উপস্থাপক, কথক, বর্ণনাকারী (ন্যারেটর) কে?– প্রশ্ন জাগে। 'এখনো মনে আছে মায়ের নিষ্ঠুরতা' আত্মস্মৃতি হাতড়ানো 'আমি' 'যার সন্তানেরা তার জন্য অপেক্ষমাণ' দূর থেকে অবলোকন করা অন্য পুরুষ। একে ত্রুটি বলা যায়, সচেতন নির্মাণ বা ক্যারিশমা বলে চালিয়ে দেয়ার সুযোগ কম।

২.

**পথ ও সুড়ঙ্গ**

এইখানে আলো শুধু পাবে হিরেফুল, কয়লার গুহা– এই মনে হয় অভ্রসাগরের কূলে বসে উথালপাথাল করা সবুজ পুরীতে। আর মনে হয়, কচ্ছপের কথা, খরগোশের কথা–

ঘুমন্তের পাশ দিয়ে ঠিক চলে যাবে কেউ ডাক দিয়ে ঘুম তবু ভাঙাবে না।

৩.

**বসন্ত বিধায়**

পাঠক বলে উঠতে পারে, 'ক্ষমা করবেন আমি ফিউশান বুঝি না'। লংগিচ্যুড (**LONGITUDE**) এর বাংলা রয়েছে দ্রাঘিমাংশ, দ্রাঘিমান্তর, দেশান্তর। কবি আসলে অনেক স্বাধীন; যথেচ্ছা সৃজন করতে পারেন। কিন্তু 'লিগার', 'টাইওন', 'ম্যাটাডোর' শব্দগুলো টার্ম হিসেবে কমিউনিকেশন তৈরিতে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে বলে মনে হচ্ছে।

৪.

## রূপকথা নয়

‘লিমন’ শব্দটি কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে। এ শব্দটির সমকালীন গুরুত্ব থাকার কারণে আর সব শব্দ ম্রিয়মাণ। যদিও কবিতাটির চিরকালীন আবেদন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে তিতুমীরকে বিস্মৃত করে কালিয়া মোহন্ত, কংকা মাঝির জাগরণ আসলে ঐতিহ্য-বিবিক্ত রূপকথার বিপ্লব। প্রচলিত ইতিহাসের অ্যান্টি-ডিসকোর্স তৈরির চেষ্টা সফল হোক। তবে এসিরুমে বসে সাব-অল্টার্ন বা দলিতদের জেগে ওঠার আশাবাদ, আজ কৃত্রিম। ‘দুধে ভেজা পদাবলি নিয়ে তুমি/রাজার দরবার রাঙাও।’– ভালো লেগেছে।

৫.

## স্বাতীনক্ষত্রের দিন: ২

‘তোমার ভেতরে এক সুগন্ধী ঝরনার খোঁজে/ঝাঁক বেঁধে আসে লোভী মানুষের দল’– দারুণ উপলব্ধির মাধ্যমে শুরু। শেষ চার লাইনে কবির আহবান, কালিমা বদলে শুদ্ধ প্রলেপ, জীবনেপ্রবাহের গান– নীতিমূলক কবিতার মতো সমাপ্তি। কোমল সারস–আবুল হাসান ব্যবহার করেছেন ‘প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী’ কবিতায়। এখানে শব্দটি নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেনি।

৬.

## সন্ধ্যাতারার সংসার

ভালো লেগেছে: ধূলি ও চিতার পৃথিবীতে ধ্রুব বলে কিছু নেই।

৭.

## সিরাজউদ্দৌলা এবং আমার গল্প

ভালো লেগেছে। ‘গোলমাল তো আছেই’– মেনে নেয়াটা বাক্যের পরবর্তীঅংশকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। ‘নদীকে মুগ্ধতা আপ্যায়ন  করে’– বোধগম্য নয়।

৮.

## দুপুরের কবিতা

দারুণ কবিতা। কিন্তু জজ্ঞা নিয়ে আবার বিপত্তি ঘটবে নাতো!

৯.

### যাব কি যাব না

ঘুম আর বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব। আমিত্ব প্রকটভাবে প্রকাশিত। প্রথম দশকের কবিতা হিসেবে বিষয় ও শৈলীতে আরও অভিনবত্ব থাকলে ভালো লাগত।

১০.

### যে রোদে ছায়া লেগে থাকে

ক্যামেরা ব্যবহার করলে একে ভিজ্যুয়াল কিছু বানানো যায়। ভালো। 'কাককে চিনতে চেষ্টা করে দুপুরের রোদ'– বেশ কবিতা কবিতা ঠেকল।

১১.

### জন্মসত্য

ভালো লেগেছে। 'মা জানেন'!

১২.

### হাহাকার

প্রথম বাক্যের (অথবা প্রথম অনুচ্ছেদের) ক্রিয়াপদগুলোর কালগত ঐক্য নেই। ফলে বাক্যটির দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। 'এ নিয়ে ভাবতেই', 'ডানা নাড়বার', 'বসতি গড়ল', 'ধরতে তেড়ে আসছে'– এ ক্রিয়াপদগুলো জটিলবাক্যটিকে জটিলতর করেছে। অনেক ব্যবহৃত অ্যাপ্রোচ এটি।

গবেষণা, সম্প্রদায়, পেশাজীবী, অতিথিবৃন্দ, বক্তৃতা– শব্দগুলো নিয়ে কবিতাটি অভিসন্দর্ভ হয়ে যেতে পারে!

১৩.

### জুয়াড়ি

লাইনগুলোর পারম্পর্য তৈরি করে একটা মিনিং হয়। আবার আলাদাভাবেও মিনিং হতে পারে। দুভাবেই চমৎকৃতি তৈরি হচ্ছে না। বৈষয়িক ভাবনামগ্ন মানুষকে দেখে ঈশ্বর হাসেন, এইতো। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃতেও এরকম বলা আছে : ঈশ্বর দুইবার হাসেন, একবার যখন দুই ভাই জমি মেপে ভাগ করে বলে এভাগ আমার, ওভাগ তোমার। আর যখন বৈদ্য বলে 'ভয় কি মা, আমি ভালো করব'।

১৪.

## কৃষক আন্দোলন

অসাধারণ কবিতা। কবিতাটি আগে পাঠ করে যদি কেউ শিরোনাম দেখে তাহলে আরো ভালো লাগবে।

১৫.

## বাঁশিঅলা

মনে হল, শৈলীগত বিবেচনার জন্য ভাবকে কিছুটা হলেও সংকুচিত করতে হয়েছে কবিকে।

১৬.

## শোককুমারী

কবিতার নামটা চমৎকার। কবিতার শরীর নামকে অতিক্রম করতে পারেনি।

১৭.

## ছায়া

একটি 'শব্দ' কবিতায় বহু-অর্থময় 'ধারণা' তৈরি করে। এখানে তার আভাস আছে। পূর্ণতা নেই।

১৮.

## শিল্পী

এ তো কবির ব্যক্তিগত নিবেদন কিংবা ব্লগ। প্রাথমিক পাঠে যে অর্থ পাই তা ঠিক থাকলে, 'অনুপম ভৈরবী' রচনা করা মা সংখ্যায় বিরল। কবিতাটি সর্বমানবের হৃদয় স্পর্শ করার বদলে 'মধ্যাহ্নভোজে'র সুযোগ পাওয়া শ্রেণির কাছে কবিতাটি একটি গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু ফুলক্রিম দুধ মুখে শিশুর ঘোষণা 'আম্মু তুমি লক্ষ্মী', আর 'আমার মা সবচেয়ে সেরা!'– এ-জাতীয় টিভি বিজ্ঞাপনের বাণীকে অতিক্রম করা বেশ কষ্টকর।

১৯.

## পথ

ভালো লেগেছে 'ধরা যাক বিকেল'– এর পর থেকে। বাকিটুকুর সাথে যোগাযোগ তৈরি করতে পারিনি।

২০.

**স্কুলদিন**

এভাবে বালিকার বয়ান থেকে, পুরুষ কবি এবং পুরুষ পাঠকের শিশ্নতোষ অলীক ফ্যান্টাসি কামনার স্রোত থেকে বালিকাকে আলাদা করা যায় না।

গরিব পিতার অবস্থাটি আমাদের না-জানলেও হত। বালিকার প্রতি করুণাজাত প্রীতির জন্যে আর অপেক্ষা নয়। অসংখ্য, অজস্র শব্দে দুর্বলতা রয়েছে। 'অসংখ্য তিলরঙ ডানার চিল'– ভালো লেগেছে।

২১.

**বটগাছ**

'আমার আর বটগাছ হওয়া হল না'– আক্ষেপটির সাথে নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর বন্ধু অমলকান্তি রোদ্দুর হতে না-পারার আক্ষেপটির মিল রয়েছে।

প্র ব ন্ধ / সা হি ত্য ত ত্ত্ব

# মার্কসবাদী নন্দন ও সাহিত্যতত্ত্ব

.........................................................

খো ন্দ কা র  আ শ রা ফ  হো সে ন

## ভূমিকা

১৯৮৯ সালে বার্লিন দেয়ালের সশব্দ পতনের সাথে সাথে একটি বিশাল যুগের সমাপ্তি ঘটেছে বলে একশ্রেণির পণ্ডিতেরা মনে করেন, সে যুগের নাম মার্কসীয় যুগ: মানবেতিহাসের এক বিশাল বিপ্লব ও এক বিস্তারী আদর্শবাদের 'জনক' হয়েছিল যে মার্কসবাদ, তারই কালসন্ধ্যা ভাবা হয়ে থাকে বিশশতকের শেষ দশককে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কসীয় তত্ত্ববিশ্ব সম্পূর্ণ ধ্বস্ত ও পরাস্ত হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। কোনো চিন্তনস্রোতই পুরোপুরি রুদ্ধ হয় না কখনো, এবং মার্কসবাদের ভেতরে এমন কিছু দুর্মর

প্রাণকোষ রয়েছে যাদের মৃত্যু সহজে ঘটবে বলে মনে হয় না। আমাদের বিবেচ্য রাজনীতি ও রাষ্ট্রসংগঠনে মার্কসবাদের কার্যকারিতা বা সাফল্য-বৈফল্য নয়; আমরা দেখব সাহিত্যের ইতিহাসে মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রভাব কতটা গভীর হয়েছে এবং কিভাবে মার্কসীয় সাহিত্যচিন্তনটি বিভিন্ন তাত্ত্বিকের রচনার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। আলথুসার, লুকাচ্, উইলিয়ামস, ঈগল্টনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মার্কসীয় নন্দনচিন্তা পশ্চিমের অ্যাকাডেমিয়াতে কী করে নয়া-মার্কসবাদের জননী হয়ে উঠল তা-ও আমাদের আলোচনায় উঠে আসবে সঙ্গতভাবেই।

একসময় যাকে বলা হত 'সাহিত্যসমালোচনা' তাকে হঠিয়ে মঞ্চ দখল করে নেয় সাহিত্যতত্ত্ব বা 'থিয়োরি' ১৯৮০-এর দশকে। এই থিয়োরির প্রধান যাঁরা নির্মাতা তাঁরা দর্শনীয়ভাবে মার্কসবাদবিরোধী তাত্ত্বিক, এবং তাঁদের প্রধান প্রবণতা হচ্ছে সাহিত্যকে সামাজিক জীবনের পরিপার্শ্ব তথা মানুষের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সংগ্রাম থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা। থিয়োরির প্রবক্তারা সাহিত্যকে মনে করেন স্বায়ত্তশাসিত মানবমনের ফসল, একটি বহিঃযোগসূত্রহীন অন্তর্জগতের মন্ময় ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই প্রবল ধারাটির পাশাপাশি মার্কসীয় নন্দনচিন্তা মানুষের সকল শৈল্পিক প্রকাশকে মনে করে তার প্রতিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিরূপিত। কোনো ব্যক্তি-শিল্পী বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস ক'রে শুধু চেতনার সরসী-নীরে আত্মপ্রতিবিম্ব মুকুরিত হতে দেখেন না। শিল্পী সামাজিক জীব; তার শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের পেছনে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের যে প্রেক্ষাপট, তাকেই সম্মুখবর্তী করতে চায় মার্কসীয় নন্দন। সুতরাং মার্কসীয় নন্দনচিন্তা থিয়োরি-ভাবিত নন্দন থেকে আলাদা, এর বিপরীত এবং কাউন্টারব্যালেন্সস্বরূপ। কিন্তু একটি কথা অনস্বীকার্য যে, পুরো আধুনিকবাদী সাহিত্যের সাথেই মার্কসীয় সাহিত্যচিন্তার দ্বিঘাতবিরুদ্ধতা, এবং এই বিরোধের ঐতিহাসিক মুহূর্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে নিহিত। আধুনিক সাহিত্য আত্মবিবরবাসী, সমাজনিস্পৃহ, বিচ্ছিন্ন, নিজনাভিমূলে-দৃষ্টিনিবদ্ধ মানুষের প্রতিকৃতি এঁকেছে। জয়েস-মান্-ক্যামু-কাফকার উপন্যাসে, বোদলেয়ার-র‍্যাঁবো-এলিয়ট ও তৎপ্রভাবিতদের কবিতায়, সমাজবিবিক্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের আয়রনি হল, যে-মুহূর্তে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনায় বস্তুবাদী-সমাজবাদী নন্দনের উদ্বোধন হচ্ছে সেই মুহূর্তেই জন্ম নিচ্ছে আধুনিকবাদী সাহিত্যের বিপরীত ভাবাদর্শ–যেন জেনাসের দুটি বিপরীতমুখী মুখ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন রচিত হচ্ছে বিষণ্ন একাকী হাস্যকর-করুণ প্রুফ্রকের প্রতিচ্ছবি, কিংবা প্রকল্পিত হচ্ছে দিগন্তবিস্তারী মরুজ্বলা পোড়োজমির কাহিনী *দ্য ওয়েস্টল্যান্ড*-এর মতো কাব্যে, তখন পূর্বদিগন্ত লালে লাল বিপ্লবী আশাবাদের বর্ণচ্ছটায়। বলশেভিক বিপ্লব তখন মার্কসের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকে মানুষের নবীন আশাবাদের প্রতিফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে; পূর্ব য়ুরোপে লেগেছে সে বর্ণের ছোঁয়া। বিশ্বের নানা দেশের মানুষের নবজাগ্রত আশাবাদ ও ইতিভাবনার সাথে পশ্চিম য়ুরোপের নেতিনির্ভর আধুনিকবাদকে কখনো মেলানো যায়নি।

## ভিত বনাম উপরকাঠামো

কার্ল মার্কস সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রথমদিককার রচনায় যেসব মন্তব্য করেন তার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য দু'টি মন্তব্য হল–

মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নিরূপণ করে না, বরং তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

দার্শনিকরা কেবল নানাভাবে জগৎকে *ব্যাখ্যা* করেছেন; মূলকথা হল জগতকে *পাল্টে দেওয়া*।

দুটো বক্তব্যই পশ্চিমি দর্শনের বহুব্যাপ্ত এবং প্রশ্নহীনভাবে-গৃহীত কিছু আপ্তধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। হেগেল প্রভৃতি জার্মান দার্শনিক আমাদের বুঝিয়েছেন যে, জগৎ হচ্ছে চিন্তাদ্বারা শাসিত; ইতিহাস বুদ্ধিবৃত্তির (Reason) বিধিসমূহের দ্বান্দ্বিক বিকাশের দ্বারা নির্মিত, এবং বস্তুগত অস্তিত্ব ভাবগত চৈতন্যের প্রকাশমাত্র। অন্য কথায়, চেতনাই বহিঃপৃথিবীকে নির্মাণ করে : রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনী উঠলো রাঙা হয়ে'। মানুষের আইডিয়াপ্রপঞ্চ, তার সাংস্কৃতিক জীবন, তার বিধিবিধান, তার ধর্ম তার মানবিক ও আধিদৈবিক বুদ্ধিবৃত্তিরই (Reason) সৃজন। মার্কস সূত্রটিকে উল্টে দিয়ে বললেন, মানুষের মানসজাগতিক আদর্শপ্রপঞ্চ তার বাস্তব সামাজিক-অর্থনৈতিক অস্তিত্বের ফসল। সমাজে যে-শ্রেণিটি প্রবল তার বস্তুগত স্বার্থ ঠিক করে দেয় মানুষ তার ব্যক্তি ও যৌথ অস্তিত্বকে কীভাবে দেখবে। সমাজ তথা বহিঃপৃথিবী অন্তর্গত চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ করে। আমরা পৃথিবীকে দেখি যেভাবে অর্থনীতি আমাদের দেখায়। মধ্যযুগে সামন্তব্যবস্থার অধীনে মানুষ যেভাবে পৃথিবীকে অনুভব করত, তা থেকে আজকের পুঁজিবাদী যুগে আমরা যেভাবে পৃথিবী ও জীবনকে দেখি তা পৃথক। তার অর্থ হল, উৎপাদনব্যবস্থা হচ্ছে সকলকিছুর নিয়ামক–এটিই সমাজের ভিত্তি বা ভেতরকাঠামো, যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সমাজের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র, আইন ইত্যাদি সম্বলিত উপরকাঠামোটি।

> "It is the founding principle of historical materialism: that the political, legal and other structures of society, and its ideology (metaphorically making up the superstructure of society) are partially determined by the forces and relations of production (metaphorically, the base of society). (Jackson, 3)

সাহিত্যের এই মার্কসবাদী ধারণা ইঙ্গ-মার্কিন সাহিত্যে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের কাল থেকে চলে-আসা ধারণার বিপরীত। সাহিত্যিক আঙ্গিক পরিবর্তমান সমাজের দর্পণ অনড়, অপরিবর্তমান মানব-অবস্থা বলে কিছু নেই। আবার অন্যদিকে শিল্পী যেহেতু সমাজের বাস্তবতার রূপকার, তাঁর অবারিত স্বাধীনতা থাকতে পারে না : তিনি সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি কর্তৃক পরিশাসিত উপরকাঠামোর মধ্যে থেকে তাঁর সাহিত্য রচনা করছেন যেহেতু, সেহেতু একই ধরনের অর্থনৈতিক পরিবেশে সৃষ্টিরত অন্যসব শিল্পীর

সাথে অবশ্যই তাঁর মিল থাকবে। পাশ্চাত্য-সভ্যতা ভাবতে ভালোবাসে যে আমাদের চিন্তাজগৎ মুক্ত, স্বাধীন, এবং বস্তুগত পরিস্থিতি নিরপেক্ষ। কিন্তু মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব মতে শিল্পী স্বাধীন নয়, যদিও ভ্রান্তভাবে সে মনে করে যে সে স্বাধীন।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব অবশ্য এরকম গোঁয়ারসুলভ কথাও বলে না যে, ধরা যাক, একটি কবিতা সরাসরি সমাজের অর্থনৈতিক ভেতরকাঠামোকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু এরকম অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে কবিতাটির একেবারে অন্তঃস্তলে ছদ্মবেশে হলেও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের দ্বন্দ্ব ক্রিয়মাণ। মার্কসবাদ বোঝাতে চায় যে একটি আপাতমন্ময় শিল্পসৃষ্টির অন্দরমহলে অদৃশ্যভাবে হলেও কোনো-না-কোনো অর্থনৈতিক বাস্তবতা বা সামাজিক দ্বন্দ্বের অবস্থিতি রয়েছে। এধরনের দ্বন্দ্বই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের চালিকা যেহেতু, সেহেতু সাহিত্যের ইতিহাস মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাসেরও আয়নাস্বরূপ।

> Marx was arguing that what we call 'culture' is not an independent reality but is inseparable from the historical conditions in which human beings create their material lives; the relations of exploitation and domination which govern the social and economic order of a particular phase of human history will in some sense 'determine' the whole cultural life of the society.'' (Selden et al, 89)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলসের ধারণাসমূহের দুটি রূপ আছে একটি আদি এবং তুলনামূলকভাবে স্থুল ও যান্ত্রিক রূপ, আরেকটি পরবর্তী পর্যায়ের শীলিত এবং সুষম ভাবনা। প্রথম রূপটি দেখা যায় মার্কস ও এঙ্গেলসের ১৮৪৬-এ প্রকাশিত *The German Ideology* গ্রন্থে। এখানে তাঁরা নৈতিকতা, ধর্ম এবং দর্শনকে বলেছেন 'মানুষের মস্তিস্কে জন্ম নেয়া কিছু ভৌতিক ছায়া', যেগুলো 'বাস্তব জীবন-প্রক্রিয়ার প্রতিবর্ত (reflex) এবং অনুরণন মাত্র।' কিন্তু তাঁরা এই চরম অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন পরে। ১৮৯০ সালে রচিত পত্রাবলিতে এঙ্গেলস বলেছেন যে, তাঁরা (মার্কস ও এঙ্গেলস) যদিও মনে করেন যে, জীবনের অর্থনৈতিক দিক অন্য সকল দিককে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তবু তাঁরা এটাও স্বীকার করেন যে, আর্ট, দর্শন এবং চেতনার অন্যান্য আঙ্গিক 'তুলনামূলকভাবে স্বাধীনভাবে কার্যক্ষম' এবং মানুষের চেতনাকে পাল্টে দেওয়ার শক্তি তাদের রয়েছে। একটি শিল্পকর্ম অথবা সাহিত্যসৃষ্টি একটি বিশেষ যুগের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সৃজন বটে, কিন্তু সেই বিশেষ যুগ কেটে গেলেও তারা মাননবমনকে আনন্দ দিতে পারে। যেমন, আড়াইহাজার বছর আগে রচিত গ্রিক ট্র্যাজেডিগুলো আমাদেরকে এখনও আকর্ষণ করে কেন? যে-সমাজকাঠামো ও যে-আইডিওলজি (দেবদেবীসম্বলিত মিথপরম্পরা) এদের ভিত্তি সে তো কতকাল আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর মার্কস দিয়েছেন অনিচ্ছুকভাবে আর্টের 'চিরকালীনতা'র তত্ত্বকে মেনে নিয়ে, যদিও এর ফলে তাঁকে বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্বের একটি

প্রধান আপ্তধারণাকে মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব সাহিত্যের পেছনের ঐতিহাসিক অবস্থাকে কেন্দ্রীয় মনে করে, এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকেই সাহিত্যের বিচার করতে চায়। চিত্রশিল্পী অঁরি মাতিস (Henri Matisse) একবার বলেছিলেন সকল শিল্পকর্ম ঐতিহাসিক যুগের চিহ্ন ধারণ করে, কিন্তু মহৎ শিল্প সেটিই যাতে এই চিহ্ন সবচেয়ে গভীর। মার্কসের নন্দনভাবনার ওপর হেগেলের দর্শনের প্রভাব ব্যাপক : হেগেলও সাহিত্যকর্মকে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিচারের কথা বলেছেন। কিন্তু হেগেলের মতো আদর্শবাদী দার্শনিকের সাথে মার্কসের পার্থক্য, তিনি শুধু সাহিত্যকে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিচার করতে চাননি, চেয়েছেন ইতিহাসকেই বিপ্লবী দৃষ্টিতে পাঠ করতে।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের *The German Ideology* (১৮৪৫-৬৬) এবং *A Contribution to the Critique of Political Economy* (১৮৫৯) গ্রন্থে বিশদ বর্ণনা করেছেন কীভাবে মানুষের আইডিয়া, ধারণা এবং চেতনার জগৎ তার বস্তুগত জীবন তথা উৎপাদন প্রক্রিয়ার 'শক্তি' কিংবা 'সম্পর্ক'সমূহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শক্তি ও সম্পর্কসমূহ একসাথে মিলে গড়ে তোলে মার্কস-কথিত 'সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন'। আর এই অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে প্রতিটি যুগে একটি উপরকাঠামো,

> "certain forms of law and politics, a certain kind of state, whose essential function is to legitimate the power of the social class which owns the means of economic production." (Eagleton, 5)

কিন্তু উপরকাঠামোর অর্থ আরো বড় এর মধ্যে আকৃত হয় সমাজের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, নান্দনিক প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক চেতনার সুনির্দিষ্ট রূপ, যাকে মার্কস নাম দিয়েছেন 'আইডিওলজি'। আইডিওলজির কাজ হচ্ছে উৎপাদনপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী শাসকশ্রেণির ক্ষমতাকে আইনসম্মত করা। রুশ মার্কসবাদী সমালোচক প্লেখানভের মতে, "The social mentality of an age is conditioned by that age's social relations. This is nowhere quite as evident as in the history of art and literature." (quoted in Eagleton, 5) মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বে আইডিওলজি ও সাহিত্যের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক রয়েই গেছে। অনেক তাত্ত্বিক স্বীকার করেন যে, সাহিত্য সাধারণভাবে সমাজের প্রবল আইডিওলজির অনুসৃজন হলেও এর কিছুটা স্বাধীন চরিত্র থাকা সম্ভব : সাহিত্যের রয়েছে নিজস্ব রীতিনীতি ও আদর্শ, ফলে সাহিত্যের ইতিহাসের বিবর্তন সর্বদা সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসের প্রতিফলক না-ও হতে পারে। ট্রট্স্কি বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ার আঙ্গিকবাদীদের প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলেন তাঁর *Literaure and Revolution* গ্রন্থে, কিন্তু সেখানেও তিনি স্বীকার করেছেন যে, শৈল্পিক সৃষ্টি হল "a changing and a transformation of reality in accordance with the peculiar laws of art."

মার্কস এ-বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন যে ভিত এবং উপরকাঠামোর সম্পর্কটি সুষম নয় :

> "Each element of a society's superstructure–art, law, politics, religion–has its own tempo of development, its own internal evolution, which is not reducible to a mere expression of the class struggle or the state of economy."

এঙ্গেলস ১৮৯০ সালে যোসেফ ব্লখের নিকট লেখা এক চিঠিতে এ-প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তার নির্গলিতার্থ হল, অর্থনৈতিক অবস্থা যদিও সাহিত্যের ভিত্তি, তবু উপরকাঠামোর নানা দিক, যথা শ্রেণিসংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ, সেই সংগ্রামে বিজয়ী শ্রেণি কর্তৃক প্রণীত আইন, এমনকি এই সংগ্রামের প্রতিবর্তগুলো যেমন রাজনৈতিক, আইনগত এবং দার্শনিক তত্ত্বাবলি, ধর্মীয় আইডিয়াসমূহও তাদের প্রভাব রেখে যায় । তাই ভিত্তি ও উপরকাঠামোর মধ্যে যান্ত্রিক এক-বনাম-এক সম্পর্ক নেই । মার্কস লক্ষ করেছিলেন যে, কোনো-কোনো যুগের আর্ট সেই যুগের সমাজের সাধারণ অগ্রসরতার স্তরকে বহুগুণ ছাপিয়ে গেছে। যেমন, প্রাচীন গ্রিক সমাজের বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি ঐ সময়ের গ্রিক সাহিত্যের বিরাট রূপকে কী করে জন্ম দিল? কিংবা এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ড শেক্সপিয়রের সাহিত্যকে? দুর্বল ভিত্তির ওপর কী করে জন্ম নিল বিরাট সাহিত্যের মহীরুহ? গ্রিক সমাজের বস্তুগত ভিত্তি অনগ্রসর থাকা সত্ত্বেও সেখানে রচিত হয়েছে মহাকাব্য, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক বিশাল অগ্রগতির পরও য়ুরোপীয় সাহিত্যে কেন মহাকাব্য রচিত হচ্ছে না? অথবা শেক্সপিয়রীয় ধরনের ট্রাজেডি? এ-প্রসঙ্গে মার্কসের অনুসিদ্ধান্তটি কৌতুককর : তিনি বলেছেন, "certain significant forms within the realm of the arts are possible only at an undeveloped stage of artistic development." প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য কিংবা শেক্সপিয়রীয় সাহিত্য আমাদের টানে সভ্যতার শৈশবের প্রতি নস্টালজিয়ার কারণে। শুনতে কথাটি সেন্টিমেন্টাল ধরনের মনে হলেও এর পূর্ণ অর্থ বোঝার জন্য ১৮৫৭ সালের খসড়া পাণ্ডুলিপি–*Grundrisse*–পাঠ করা দরকার। মার্কসের মতে, প্রাচীন গ্রিক সমাজে আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার মতো শ্রমবিভাজন ছিল না বলে মানুষ ও তার জীবন, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সমন্বয় ছিল অটুট; একধরনের ঐক্যের ধারণা শিল্পীর পক্ষে ধারণ করা সম্ভব ছিল, যে-ঐক্যের সমন্বিত রূপ মহাকাব্যের আঙ্গিকের মধ্যে রূপায়িত। আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার আত্যন্তিক শ্রমবিভাগ সেই ঐক্য ও সমন্বয়ের দৃষ্টিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে বলে আজকের শিল্পীর পক্ষে মহাকাব্যের সামগ্রিকতা সৃজন করা অসম্ভব। তবে মার্কসের কল্পিত ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেই সামগ্রিকতা আবার ধরা সম্ভব হবে ।

> "We find in those ancient societies a primitive 'measure' between man and Nature which capitalist society necessarily destroys, and which socialist society can reproduce at an incomparably higher level." (Eagleton, 12)

## সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ

পশ্চিম য়ুরোপে যখন আধুনিকবাদ (মডার্নিজম)-এর তুমুল উত্থানপর্ব চলছিল জয়েস-উল্‌ফ্‌-পাউন্ড-এলিয়টের কবিতা ও উপন্যাসে, য়ুরোপীয় আর্ট ও সঙ্গীতে পিকাসো, স্ট্রাভিন্‌স্কি ও শোয়েনবার্গের রচনায়, সেইসময় নবজাত সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পসাহিত্যের নন্দন নিয়ে চলছিল নতুন চিন্তাভাবনা। সাহিত্যকে বৈপ্লবিক আদলে পুনর্নির্মাণকে কর্তব্য মনে করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতারা। তাঁরা পশ্চিম য়ুরোপের ব্যক্তিবাদী, নেতিনিবিড় ও সমাজনিস্পৃহ সাহিত্যকর্মকে জনচেতনার জন্য বিপজ্জনক মনে করেছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, এই আধুনিকবাদী সাহিত্যে জনজীবনের সামষ্টিক রূপের প্রকৃত প্রতিফলন নেই। উদাহরণস্বরূপ, জয়েসের উপন্যাসে জনৈক স্টিফেন ডেডেলাসের খিন্ন অন্তর্জীবনের রূপায়ণ কিংবা এলিয়টের পানশালাবিহারী নিষ্কর্মা নিঃসঙ্গ ভবঘুরে প্রুফ্রকের নৈশভ্রমণের চিত্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জীবনসংগ্রামের বাস্তব বিবরণ নয় : এই লেখকেরা আধুনিক সময়ে ক্রিয়মান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। এই কট্টরপন্থী মনোভাবের জনক মার্কস বা এঙ্গেলস নয়, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। বলশেভিক বিপ্লবের পর প্রথম বছরদশেক শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি সরকারি সোভিয়েত মনোভাব ছিল অনেকটা উদার; আধুনিকবাদী নিরীক্ষার প্রতি অনুমোদনও ছিল। কিন্তু তিরিশের দশকে এসে চিত্রটি পাল্টে যায়। ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখক-কংগ্রেসে উদারনৈতিক 'এঙ্গেলসীয়' দৃষ্টিভঙ্গি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় লেনিনের কট্টরপন্থী মতবাদ। ১৯০৫ সালেই লেনিন তাঁর লেখাজোখায় বলেছিলেন যে, সাহিত্যকে হতে হবে পার্টির হাতিয়ার। জর্জ স্টাইনার (George Steiner) Zuvi *Language and Silence* গ্রন্থে মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের দু'টি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন: একটি 'এঙ্গেলসীয়' ধারা, যেখানে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদমুক্ত শিল্পের স্বাধীনতাকে জোর দেয়া হত, আরেকটি 'লেনিনীয়' ধারা যেখানে আর্টকে ভাবা হত বামপন্থার স্বার্থে পুরোপুরি নিবেদিত। কার্ল রাডেক নামের এক মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ১৯৩৪ সালের সোভিয়েত লেখক-কংগ্রেস-এ প্রশ্ন তুলেছিলেন- 'জেমস জয়েস, না সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ?' এবং বলেছিলেন, "জয়েসের জগৎ  অবস্থিত একটি মধ্যযুগীয়-বইয়ে ঠাসা আলমারি, একটি বেশ্যালয় এবং একটি মদের দোকানের মাঝখানে", "এবং আমি যদি কখনও উপন্যাস লিখি তবে সেটা লেখা শিখব জয়েসের কাছে নয়, বালজাকের কাছে।" এখানেই একটি চমকপ্রদ প্যারাডক্সের জন্ম হল: আধুনিকবাদী সাহিত্যের পরিকাঠামোকে বর্জন করে সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিকরা উনিশশতকের বুর্জোয়া বাস্তববাদী ধারাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করলেন। বিপ্লব-পরবর্তী রুশ আঙ্গিকবাদীরা সাহিত্যে একটি নতুন বিপ্লবের চেষ্টা করছিলেন বলশেভিকদেরই আগ্রহে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের এই প্রচেষ্টা লেনিনের অনুমোদন পায়নি। বস্তুত, বিপ্লব-পূর্ব কালে, উনিশশতকের শেষার্ধে রুশ সাহিত্যে যে বাস্তববাদী ধারার বিস্তার ঘটেছিল টলস্টয়ের, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে,

গোগোলের ছোটগল্পে, এবং ইংল্যান্ডে ডিকেন্সের উপন্যাসে, সোভিয়েত বিপ্লবীদের কাছে তাকেই বরং মনে হয়েছিল আদরণীয় ও অনুসরণীয়, সাম্প্রতিকতর সাহিত্যের তুলনায়। এভাবে উনিশশতকীয় 'বুর্জোয়া' সাহিত্যাদর্শ তথা বাস্তববাদ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের লালকুর্তা গায়ে দিয়ে হাজির হল। সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির নাম ছিল *পার্তিনস্ত* ( partinost), যার অর্থ পার্টি-আচরিত শ্রমিকশ্রেণির কল্যাণে পূর্ণ আত্মনিবেদন। লেনিন তাঁর ১৯০৫ সালের প্রবন্ধ 'পার্টির সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য'-এ মত প্রকাশ করেন যে, যদিও লেখকরা যা খুশি লিখতে পারেন, পার্টির লাইন মোতাবেক না-হলে পার্টির মুখপত্রগুলোতে সেসব লেখা ছাপা হবে না। বিপ্লবের পর এই নীতির নতুন রূপ দেখা দিলো *নারদনস্ত* (narodnost) নামে : এর অর্থ 'জনতার আর্ট'। যে-কোনো শিল্পকর্মকে তার যুগের মেহনতি জনতার কাছে বোধযোগ্য ও উপভোগ্য হতে হবে, তাতে থাকবে সমাজচেতনার সংহত রূপ এবং বর্তমানের নিরিখে ভবিষ্যতের সমাজবিকাশের সম্ভাবনাকে দেখার 'প্রগতিশীল' দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রমিকরা শিল্পকারখানায় আত্যন্তিক শ্রমবিভাজনের ফলে দ্রব্য-উৎপাদনের পূর্ণ আনন্দ থেকে বঞ্চিত, যে-আনন্দ পূর্বযুগের কারিগররা পেত। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাহিত্য হবে এমন যাতে মেহনতি মানুষ তাদের সত্তার হারানো সামগ্রিকতা আবার ফিরে পায়। এই তত্ত্বকে *ক্লাসোভস্ত* (klassovost) বা 'আর্টের শ্রেণিচরিত্র' নামেও বর্ণনা করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতারা উনিশশতকের বুর্জোয়া লেখকদের মধ্যে অনেকের প্রশংসা করতেন একারণে যে ঐ লেখকরা, তাদের শ্রেণিচরিত্র যাই থাকুক, তাঁদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি দ্বারা তাঁদের সময়ের সমাজবাস্তবতাকে চিত্রায়িত করেছিলেন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ঐ বুর্জোয়া বাস্তববাদেরই উন্নততর ও চলমান রূপ। উনিশশতকী বাস্তববাদী ধারার লেখকরা, যথা বালজাক, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, স্তাঁদাল, এবং অন্যরা সমাজের বিবিধমাত্রিক সম্পর্কের বুনোটের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের সম্পৃক্তিকে রূপায়িত করেছিলেন। তবে সোভিয়েত কর্তাদের এই উদারতা পরবর্তীকালে হ্রাস পেয়েছিল বহুলাংশে তাঁরা লেখককে পার্টি লাইন অনুসরণের মাধ্যমে 'সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য' রচনার জন্য ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। স্ত ালিন লেখকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, "আপনারা হোন মানবাত্মার ইঞ্জিনিয়ার।" মার্কসবাদের আদিগুরুদের অন্যতম এঙ্গেলস এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিরিশের দশকের স্তালিনীয়রা ভাবতেন যে, শ্রেণিসংগ্রামের যুগের সাহিত্য অবশ্যই হবে শ্রেণির সাহিত্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নিবেদিত সাহিত্য। স্তালিনের কর্তৃত্ববাদী উত্থানের ফলে 'এঙ্গেলসীয়' উদারবাদী ধারার সমর্থকরা কোপের ও তোপের মুখে পড়েন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভিক্তর শ্‌ক্লভস্কি (Victor Shklovsy) বরিস তোমাশেভস্কি (Boris Tomashevsky) এবং বরিস আইখেনবৌম (Boris Eichenbaum)। এঁদের নাম পরে রুশ আঙ্গিকবাদী (Russian Formalists) নামে বিখ্যাত হয়। ১৯৩৪ সালের সোভিয়েত সাহিত্য কংগ্রেসে এঁদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ

ঘোষণা করলে এরা দেশান্তরী হন অথবা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। একটি গ্রুপ পালিয়ে চেকোশ্লোভিয়ার প্রাগ শহরে স্থিত হন এবং তাদের কাজ চালিয়ে যান। এটি পরে প্রাগ স্কুল অব লিঙ্গুইস্টিকসের জন্ম দেয়। প্রধান উদ্‌গাতাদের মধ্যে ছিলেন রোমান ইয়াকবসন (Roman Jakobson) ও জারবংশীয় প্রিন্স নিকোলাই ক্রুবেৎস্কয় (Nikolai Trubetzkoi)।

## গেয়র্গ লুকাচ্

মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান যে দার্শনিকের তাঁর নাম গেয়র্গ লুকাচ্ (Gyorgy Lukaecs)। এই হাঙ্গেরীয় তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণাসূত্র ব্যবহার করে সাহিত্য বিশেষত উপন্যাসে বাস্তবতার ব্যবহার নিয়ে তাঁর ধারণাবলি প্রকাশ করেন *The Theory of the Novel* গ্রন্থে। বাস্তববাদ বা রিয়ালিজম তাঁর মতে সরল একরৈখিক সমাজচিত্রবয়নের নামান্তর নয়; এটি একটি জটিল, গভীর অধ্যয়নের নাম। লুকাচ্ হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের ব্যবহার করার মাধ্যমে সাহিত্যকর্মকে একটি বিকাশমান সিস্টেমের প্রতিফলন হিসেবে দেখেন যার ভেতরে নানা পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি ও স্রোতসমূহ দ্বন্দ্বমুখর রয়েছে। সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত বৈপরীত্য ও টানাপড়েনগুলোর প্রতিফলন ঘটতে হবে বাস্তববাদী সাহিত্যকর্মে, যাতে ঐ সমাজের ঐতিহাসিক ও বস্তুগত সংগঠন (structure) পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়। লুকাচ্ উনিশশতকের শেষপাদে সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে
বিস্তারমান ন্যাচারালিজমকে প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা তাঁর মতে, ন্যাচারালিস্টরা শুধু উপরিতলের বাস্তবতা নিয়ে ব্যাপৃত। অন্যদিকে আরেকটি জায়মান ধারা, ‘মডার্নিস্ট’ ধারাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অনৈতিহাসিক বলে তুমুল সমালোচনা করেন। তাঁর কাছে জেমস জয়েসের উপন্যাস কিংবা স্যামুয়েল বেকেটের অ্যাবসার্ডবাদী নাটককে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। তিনি এমিল জোলা প্রভৃতির ন্যচারালিস্ট উপন্যাসকে খারিজ করেন একারণে যে সেখানে বাস্তবতার খণ্ডিত ও দৈবচয়িত পরম্পরামাত্র প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ সমাজবাস্তবতার ডায়ালেক্টিক সংঘট্ট রূপায়িত হয়নি। অন্যদিকে জয়েস কিংবা ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাসে যা উপস্থিত তা হল বাস্তবতার মন্ময় প্রতিচ্ছবি। দুক্ষেত্রেই প্রতিচ্ছবিটি ফটোগ্রাফিক বা সরাসরি ও সরল। লুকাচের মতে বাস্তবতা কেবল ঘটনাংশের যান্ত্রিক পরম্পরা নয়; এর ভেতরে রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন, যেটিকে ঔপন্যাসিক খুঁজে বের করবেন। তাঁর রচনায় জীবনের জটিল বহুবর্ণিলতার প্রতিফলন থাকবে, যে-বৈচিত্র্যের মধ্যে লক্ষ করা যাবে একটি শৃঙ্খলারও আভাস। সামাজিক বাস্তবতার সকল বৈপরীত্য ও টানাপড়েনগুলোকে একটি আঙ্গিকগত সামগ্রিকতায় ধারণ করতে পারলেই কেবল সেই শৃঙ্খলার শৈল্পিক রূপায়ণ সম্ভব। হেগেলের কাছে মার্কসবাদের ঋণ ইতিহাসের ডায়ালেকটিক বা দ্বান্দ্বিকতার সূত্রটি। ইতিহাস কখনোই সরলরৈখিকভাবে বিবর্তিত হয় না : এর গতি দ্বান্দ্বিক প্রগ্রসরণের।

প্রতিটি সমাজসংগঠনের ভেতর যে উৎপাদনপ্রক্রিয়া তার থাকে নানা অন্তর্গত বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যগুলো শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। যেমন ধরা যাক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার কথা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সামন্তব্যবস্থাকে হটিয়ে দিয়ে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একদিকে, অন্যদিকে বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্যউৎপাদনের পরিমাণের বিশালতাকে সম্ভব করে তুলেছে। অর্থাৎ একদিকে উৎপাদনের মালিকানা হয়েছে ব্যক্তিকায়িত, অন্যদিকে উৎপাদনপ্রক্রিয়া হয়েছে সামাজিকায়িত। এই বৈপরীত্য থেকে জন্ম নিল পুঁজিপতি ও শ্রমিকের স্বার্থের দ্বন্দ্ব। তবে এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই থাকছে দ্বন্দ্ব-নিরসনের ইশারাও : উৎপাদনপ্রক্রিয়ার ওপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, শ্রমিকের মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকায়িত উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে 'সামাজিকায়িত' করা যেতে পারে। লুকাচ্ যখন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়, *The Historical Novel* (১৯৩৭) এবং *Studies in European Realism* (১৯৫০) রচনা করেন তখন তাঁর দৃষ্টিসীমায় মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার উপর্যুক্ত আপ্তধারণা ক্রিয়মান ছিল। লুকাচ্ জেমস জয়েসকে সত্যিকার শিল্পীর মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু জয়েসের ইতিহাসদর্শনকে করেছেন সমালোচনা। তাঁর মতে জয়েসের ইতিহাস-দেখা স্থাণু ও একরৈখিক; জয়েস ইতিহাসের পরিবেশের গতিশীলতার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বকে স্থাপন না-করে একধরনের মহাকাব্যিক সংগঠনের মধ্যে স্থাপন করেছেন, যে-সংগঠন পরিবর্তনরহিত ও দ্বন্দ্বহীন। সাধারণভাবে ফ্রানৎস কাফকা, স্যামুয়েল বেকেট এবং উইলিয়াম ফকনারের তথা সমকালীন আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত ইতিহাসবীক্ষাটি একইভাবে ত্রুটিযুক্ত, খণ্ডিত। এই লেখকরা আঙ্গিকের যেসব নিরীক্ষা করেছেন, যেমন মন্তাজ, অন্তর্মনোলগ, চেতনাপ্রবাহরীতি, সে-সবই 'প্রান্তিক পুঁজিবাদ' (Late Capitalism)-এর উত্তুঙ্গ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে উদ্ভূত, যাদের একমাত্র লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ মন্ময়তাকে অভিব্যক্ত করা। ইতিহাসের গতিময়তা, সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহকে বোঝার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিমানুষের কষ্ট-জর্জরিত আত্মাকে, তার অ্যাবসার্ড অস্তিত্বের মৌমাছিকে হাতের তালুতে নিয়ে নিরীক্ষণ করার এই প্রবণতা আধুনিক সাহিত্যকে ইতিহাস ও প্রগতির বিরোধী করে তুলেছে বলে লুকাচের অভিমত।

কিন্তু একটি যুগের সামাজিক অবস্থার প্রতিচিত্র হিসেবে সেই যুগে রচিত সাহিত্য কতটা নির্ভরযোগ্য এই প্রশ্নের বিবিধ উত্তর দিয়েছেন বিভিন্ন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। এর আগে যেমন বলেছি, ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তববাদী ইংরেজি উপন্যাসের মধ্যে, কিংবা তলস্তয়-দস্তয়ভস্কির রচনায় সমাজের বাস্তবতার চিত্রকে আধুনিকবাদী সাহিত্যের তুলনায় আদরণীয় ভেবেছেন বলশেভিকরা। এই আদর কতটা যুক্তিযুক্ত, যখন আমরা জানি যে, ঐ সাহিত্যকর্মগুলো তাদের যুগের পুঁজিবাদী আদর্শ দ্বারাও অনিবার্যভাবে আকৃত? আদর্শবাদ বা 'আইডিওলজি'র ঘেরাটোপের মধ্যে রচিত ডিকেন্সের *Great Expectations* (১৮৬০-৬১) অথবা জর্জ এলিয়টের *Middlemarch* (১৮৭১-৭২) কি ভিক্টোরীয়

ইংলন্ডের আদর্শগতভাবে রঞ্জিত চিত্রই উপহার দেয় না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মার্কসবাদীরা কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হলেও এখন এটি মোটামুটি স্বীকৃত যে জল থেকে দুধটুকু আলাদা ক'রে নেয়ার হংসসুলভ কৌশল জানা থাকলে আদর্শিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল লেখকের রচনা থেকেও কোনো সাহিত্যকর্মের মূলসারটি তুলে নেয়া সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন টেক্সট থেকে অথর-কে আলাদা ভাবা (পরবর্তী যুগের রোলা বার্তের (Roland Barthes) তত্ত্ব কিংবা Reader Response Theory-এর মধ্যে এর অনুসরণ দেখা যাবে।) টেক্সটকে সমাজবাস্তবতা থেকে পৃথক করা নয় অবশ্য (কাঠামোবাদীরা যেমন করেন), বরং লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে পেছনে ঠেলে দিয়ে টেক্সটের মধ্যে বিধৃত শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসা সম্ভব। এঙ্গেলসের রচনায় এই সূত্রের পত্তন হলেও তার প্রথম যুক্তিগ্রাহ্য প্রয়োগ ঘটান গেয়র্গ লুকাচ্ । লুকাচ্ দেখান যে তথাভাবিত প্রতিক্রিয়াশীল লেখক ফরাসি ঔপন্যাসিক অনরে দ্য বালজাক কিংবা তলস্ত য়ের মহাকাব্যিক পরিধির উপন্যাসগুলোর মধ্যে সমাজবাস্তবতার যে বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া সম্ভব তা তথাকথিত বামপন্থী অনেক লেখকের আভাঁ-গার্দ সাহিত্যের খণ্ডিত আর্শিতে প্রতিফলিত হয় না। তলস্তয়-বালজাক, কিংবা এমনকি হোমার-সফোক্লিসের রচনায় ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন-অভ্যুদয়ের সাথে ইতিহাসের বিশাল-বিপুল তরঙ্গসংঘাত যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাতে পাঠক মুখোমুখি হয় অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্যের। সেই তুলনায় আধুনিকবাদী (এবং তাঁর সমকালীন) সাহিত্য ভগ্ন, অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো একদেশদর্শী, ও সেই কারণে অনির্ভরযোগ্য। লুকাচ্ লিখেন

> Achilles and Werther, Oedipus and Tom Jones, Antigone and Anna Karenina: their individual existence....cannot be distinguished from their social and historical environment. Their human significance, their specific individuality cannot be separated from the context in which they were created. ('The Ideology of Modernism' (1957), in Lodge, 476)

কিন্তু লুকাচের নন্দনভাবনাও একদেশদর্শিতার ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। আধুনিকবাদী সাহিত্যের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ-আধুনিকবাদী সাহিত্যিকরা শুধু আঙ্গিকগত নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাদের সাহিত্য মন্ময়তানির্ভর-তন্ময় বাস্তবতা (objective reality) থেকে দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয় চরিত্রের অন্তর্জগতের দিকে, যে-জগতে বাস্তবের চেয়ে স্বপ্ন, সমাজবাদী রিয়্যালিটির বদলে চৈতন্যগত অধিবাস্তবের নির্মাণ চলে। মন্তাজ, অন্ত র্গত মনোলগ, চৈতন্যপ্রবাহরীতি, রিপোর্তাজ ও ডায়রির ব্যবহার সমাজের গতিশীল, নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা থেকে দূরের এক অন্তর্জলি জগৎ সৃষ্টি করে। কিন্তু লুকাচ্ যে-জিনিসটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন সেটি হচ্ছে, আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নায়ন তথা মানুষের একাকিত্ব ও তার যন্ত্রণার রূপায়ণ করার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যিকরা যা ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি আধুনিক জীবনেরই বাস্তবতা, আধুনিক সমাজবাস্তবতারই ফসল। আধুনিক সাহিত্যিকরা যে-টেক্নিকগুলো ব্যবহার করেছেন সেগুলো তাদের বিষয়ের

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ-উনিশশতকী একরৈখিক ন্যারেশনের মাধ্যমে সে-বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হত না। লুকাচ্ আধুনিকবাদী সাহিত্যের বিষয়বস্তুকেই যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল ভাবতেন, সেহেতু আধুনিক টেক্‌নিকগুলোও তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য ছিল। এমনকি বেটল্ট ব্রেখ্‌ট তাঁর সমাজবাদীভাবনাদীপ্ত নাটকগুলোতে যে মন্তাজ, এলিয়েনেশেন ইফেক্টের মতো কৌশল ব্যবহার করেছেন সেগুলোরও সমালোচনা করেছেন লুকাচ্। সব মিলিয়ে লুকাচের সাহিত্যতত্ত্ব রক্ষণশীল মার্কসবাদী ভাবনারই উত্তরাধিকার। পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা এই কট্টর অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন এরিখ আওয়ারবাখ (Erich Auerbach): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে য়ুরোপ থেকে পলায়িত শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের দঙ্গলে তিনিও ছিলেন অন্যতম। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমান ভাষার অধ্যাপনার পাশাপাশি লুকাচীয় সাহিত্যভাবনার প্রসার ঘটান তিনি। তাঁর বিখ্যাত বই *Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature* (১৯৪৬)-এ সাহিত্যে বাস্তববাদের ব্যবহারের যে-ব্যাখ্যা দেন তা একই সাথে লুকাচীয় তত্ত্বধারণা এবং আধুনিকবাদী সাহিত্যের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দুই প্রান্তকে মেলাতে চেয়েছে। আওয়ারবাখ কালচার এবং সমাজের বৃহত্তর প্রশ্নগুলোকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করেছেন। তাঁর বিচারক্ষেত্র মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনটি রোমান ভাষায় রচিত সাহিত্যে ব্যক্তির কার্যাবলির সাথে তার বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিপার্শ্বের তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ কীভাবে ঘটিয়েছেন লেখকরা, *Mimesis* গ্রন্থে তার বিপুল উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

আওয়ারবাখের মতে, আধুনিক বাস্তববাদের কর্তব্য হওয়া উচিত একই সাথে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ভাণ্ডার হওয়া এবং মানুষের নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা।

## বের্টল্ট ব্রেখট

এ-প্রসঙ্গে বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট এবং তাঁর নাট্যকর্মাবলির উল্লেখ খুব প্রাসঙ্গিক। ব্রেখ্‌ট কখনও মন্ত্রপড়া কম্যুনিস্ট হননি বটে, কিন্তু তাঁর নাটকগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ভিন্নধর্মী উন্মোচন দেখা যায়। ১৯৩০-এর দশক থেকে তিনি বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক বক্তব্যধর্মী নাটক লেখা শুরু করেন, যার নাম দেন *Lehrstücke* বা শিক্ষামূলক নাটক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নাটককে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে না-দেখে তাকে শ্রমিকশ্রেণির চেতনাকে তীক্ষ্ণ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। নাৎসিরা ক্ষমতা দখল করলে ১৯৩৩-এ জার্মানি ত্যাগ করে প্রথমে স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ায়, পরে আমেরিকায় প্রবাসী হন। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলো প্রবাসে রচিত। এদের মধ্যে রয়েছে *Good Woman of Setzuan, Life of Galileo Galilii, Mother Courage and her Daughters, Three-Penny Opera*, ইত্যাদি। ১৯৪৯ সালে পূর্ব

জার্মানিতে ফিরে আসেন। তিনি লুকাচের 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মতে, সাহিত্যে বাস্তববাদী ঘোর, আঙ্গিকগত ঐক্য এবং পজিটিভ নায়কের কেন্দ্রিকতা থাকবে। অন্যদিকে ব্রেখ্‌ট চাইলেন বাস্তববাদী ঘোরকে ছিন্ন করতে। তিনি বিযুক্তি-অভিঘাত অর্থাৎ 'এলিয়েনেশন-ইফেক্ট' সৃষ্টি করতে চাইলেন নাটকে, যাতে দর্শকরা নাটকের দৃশ্য-কাহিনীর আবেগের দ্বারা ঘোরাচ্ছন্ন না-হয়ে পড়ে; চাইলেন দর্শক যেন নাটকের ঘটনাপরম্পরা থেকে মানসিকভাবে বিযুক্ত থেকে ঐ ঘটনাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে সক্ষম হয়। এই বিযুক্তি সৃষ্টির জন্য বেখ্‌ট নাটকে যুক্ত করলেন কিছু অদ্ভুত মাঞ্চিক কর্মকাণ্ড, যেমন, নাটকের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করার জন্যে 'দৃশ্যান্তর'-লেখা প্লাকার্ড হাতে কারুর ঢুকে পড়া, কিংবা ছাদ থেকে কোনো নোটিশবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া, কিংবা স্বয়ং নাট্যকারের মঞ্চে প্রবেশ এবং দর্শকের সাথে বাতচিৎ, ইত্যাদি। ব্রেখট তাঁর নাটকের নাম দেন 'মহাকব্যিক নাটক' বা এপিক থিয়েটার। দুইহাজার বছরের এরিস্টটলীয় নাটকের তত্ত্বকে উল্টে দিলেন তিনি : নাটক আর এরিস্টটল-কথিত করুণা ও ভীতিরসউৎপাদনকারী ন্যারেটিভধর্মী দৃশ্যকাব্য থাকল না, হয়ে উঠল মহাকাব্যের মতো বিশাল পরিসরের। ঘটনার আদি-মধ্য-অন্তের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে অসংলগ্ন ঘটনাপুঞ্জকে একসাথে জোড়া দিয়ে ইতিহাসের দীর্ঘসূত্রিতা আনা হল। তাঁর মতে নাট্যকারের উচিত আন্তঃসম্পর্কিত প্লট এবং অপরিহার্য পরিণামের ধারণাকে পরিহার করা। লুকাচ্‌-কথিত অর্গানিক ঐক্যের কিংবা সুগঠিত প্লটের ধারণা চুরমার ক'রে স্থান ও কালের পরম্পরাকে ভেঙে দেয়া হল। এছাড়া, আঙ্গিক অনুসরণে নাট্যকারকে দেয়া হল স্বাধীনতা-নাট্যকার প্রাচীন, আধুনিক, নাগরিক, গ্রাম্য, লোকজ, শীলিত যে কোনো আঙ্গিক ব্যবহার করতে পারেন, একই সাথে, একই নাটকে। ব্রেখ্‌ট বাস্তবতার ঘোরকে ভেঙে দেয়ার কথা বললেন অভিনেতারা যেন চরিত্রের সাথে একাত্ম না-হয়ে যায়, দর্শকরাও যেন চরিত্রের সাথে লীন না-হয়ে যান। চরিত্রের অবস্থা, আবেগ ও দ্বন্দ্বকে বাইরে থেকে বিচার করতে হবে। ফলে ব্রেখ্‌টীয় থিয়েটার হয়ে উঠল একধরনের সেমিনার যেখানে নাট্যকার একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যাকে উপস্থাপন করছেন, আর দর্শকরা তাদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে সেই সমস্যাকে পর্যালোচনা করছেন। বলা বাহুল্য, বাস্তবতার এহেন ব্যবহার গোঁড়া মার্কসবাদীদের পছন্দ হয়নি। বাস্তবতার প্রকাশকে বিশেষ আঙ্গিকের সাথে একাত্ম করে দেখার লুকাচীয় তত্ত্বকে ব্রেখ্‌টের কাছে মনে হয়েছিল বিপজ্জনক আঙ্গিকবাদ বলে। এমনকি তাঁর নিজের এলিয়েনেশন-ইফেক্টও যদি বহুব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যায় তা হবে পরিত্যাজ্য। শিল্পী পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন-নতুন আঙ্গিক খুঁজবেন, কারণ বাস্তবতা যেহেতু পাল্টায়, তার উপস্থাপনের টেক্‌নিকও পাল্টাতে বাধ্য। পুঁজিবাদ এমন এক শত্রু যে নিরন্তর রূপ পাল্টাচ্ছে, নিচ্ছে নতুন-নতুন ছদ্মবেশ। এর মুখোশগুলো উন্মোচনের জন্য শিল্পীর থাকা উচিত রাজনৈতিক নিষ্ঠা। সুতরাং প্রথমদর্শনে ব্রেখটকে সংশোধনবাদী বলে মনে হলেও মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বে তার

অবদান মূল্যবান, এবং তাঁর আত্যন্তিকতাকে প্রশ্ন করা যায় না। পরবর্তীকালের 'নয়া'-মার্কসবাদীদের উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে লুকাচের কাছে নয়, বরং 'অপ্রাতিষ্ঠানিক' ব্রেখটের কাছে ঋণী বলে মনে হতে পারে।

## ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল : আডর্নো ও বেন্‌জামিন

সাহিত্য ও বাস্তবজগতের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব শুরু থেকেই ভাবিত। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা ধরেই নিয়েছেন যে, সাহিত্য বাস্তব জীবনের ফটোগ্রাফিক প্রতিফলন। (অন্যদিকে যাদের এঁরা শত্রু ভেবে বিতাড়ন করেছিলেন সেই রুশ আঙ্গিকবাদীরা মনে করেন সাহিত্যে প্রাধান্য পায় আঙ্গিক, অর্থাৎ তাকে বিচার করতে হবে ইতিহাস ও সমাজ-পরিপার্শ্ব থেকে বিযুক্ত ক'রে বিশুদ্ধ ফর্ম হিসেবে।) কিন্তু সাহিত্য যদি জীবনকে প্রতিফলিত করে তবে তা এক বিশেষ ধরনের আয়না দিয়ে, যে-আয়নায় জীবন কিছু পরিমাণে বিকৃত, বিস্রস্ত, বিশীর্ণ বা প্রসারিত রূপে প্রতিফলিত হয়। ব্রেখ্‌ট যেমন বলেছেন *A Short Organum for the Theatre* (1948)-এঃ "If art reflects life, it does so with special mirrors."

লিও ত্রৎস্কি বলেছেন, শিল্পসৃষ্টি হল 'a deflection, a changing and a transformation of reality, in accordance with the peculiar laws of art.' (উদ্ধৃত, Eagleton, 47) ত্রৎস্কির এই মতের সাথে রুশ আঙ্গিকবাদীদের মতের কিছুটা সামীপ্য আছে : আঙ্গিকবাদীরা মনে করেন শিল্পের প্রবণতা হল বাস্তবতাকে 'অপরিচিতকরণ' (defamiliarize) করা। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকরা এসে বাস্তবতাকেই পুরোপুরি নাকচ করে দিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিচার্সে জড়ো হওয়া তাত্ত্বিকেরা সাহিত্যতত্ত্বের বদলে যার চর্চা করেন তার নাম ক্রিটিক্যাল থিয়োরি বা সমালোচনাতত্ত্ব। হেগেলীয় মার্কসবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব ইত্যাদির আলোকে সমাজ নিরীক্ষণে ব্যাপৃত এই পণ্ডিতেরা হলেন মাক্স হর্খাইমার (Max Horkheimer), থিওডোর আডর্নো (Theodor Adorno) এবং হার্বার্ট মারকিউস (Herbert Marcuse)। ১৯৩৩ সালে নাৎসিরা বন্ধ করে দেয় এই ইনস্টিটিউট; প্রবক্তা-পণ্ডিতগণ পাড়ি জমান নিউইয়র্কে; যুদ্ধশেষে ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে আসেন ১৯৫০ সালে। নাৎসি জার্মানির ফ্যাসিজম আধুনিক কালচারকে কীভাবে হেজিমনির নিগড়ে বেঁধেছিল, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফ্যাসিজমের অমিত প্রতাপ কীরূপ নৃশংস হয়ে উঠেছিল, দেখেছিলেন এঁরা। (আডর্নোর একটি উক্তি প্রবাদের রূপ নেয় যুদ্ধশেষে– 'আউৎসভিৎসের পর কবিতা লেখা অসম্ভব'।) অন্যদিকে মার্কিন দেশে তাঁরা দেখেছিলেন বাণিজ্যিক মনোভাবের আগ্রাসন। এসব দেখে-শুনে তাঁদের প্রত্যয় হয়েছিল, "art— with philosophy—was the only theatre of resistence to 'the administered universe' of the twentieth century." আডর্নো সরাসরি লুকাচের শিল্পতত্ত্বের বিরোধিতা করলেন। তাঁর মতে বাস্তবের সাথে সাহিত্যের সরাসরি সংযোগ

নেই। বাস্তবতা থেকে আর্ট বিযুক্ত, এবং এই বিযুক্তিই আর্টের বিশেষ তাৎপর্য ও ক্ষমতার উৎস। আধুনিকবাদী সাহিত্য বাস্তবজগতের সাথে দূরান্বিত, তার ফল হয়েছে এই, সে দূরে থেকে, বাইরে থেকে বাস্তবতাকে সমালোচনা করতে পারে। 'While popular art forms are forced to collude with the economic system which shapes them, 'autonomous' works have the power to 'negate' the reality to which they relate.' (Selden et al, 100) যেমন মডার্নিস্ট উপন্যাসে নায়কের অন্ত র্জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে বলে লুকাচ্ তাকে বলেছেন অবক্ষয়ী সাহিত্য; কিন্তু আডর্নোর কাছে ব্যক্তিজীবনের এই নিবিড় চিত্রায়ন বাস্তবতা-সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ যে জ্ঞান দান করে তার মূল্য কম নয়। নিরীক্ষামূলক মডার্নিস্ট আর্ট আমজনতার বোধ ও বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে তাদের সচেতন করে তোলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে, অন্যদিকে সরাসরি প্রোপাগাণ্ডা ধরনের সাহিত্য তাদের বিচারবুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেয়। আমজনতা আভাঁ-গার্দ শিল্পকে সাধারণত প্রত্যাখ্যান করে এ কারণে যে সেটি সমাজের নিয়ন্ত্রণের প্রতি তাদের স্বয়ংক্রিয় সম্মতিকে বিচলিত করে তোলে : "By making down-trodden humans shockingly aware of their own despair, the work of art announces a freedom which makes them fume." (Selden et al, 100)

ওয়াল্টার বেন্জামিনকে বলা হয়ে থাকে তাঁর প্রজন্মের সবচাইতে খেয়ালি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। তাঁর ভাষা জটিল ও দুর্বোধ্য বলে দুর্নাম রয়েছে। প্রথম জীবনে গ্যেটে ও জার্মান বারোক্ থিয়েটারের সমালোচনা লেখায় ব্যাপৃত ছিলেন। শার্ল বোদলেয়ারের ওপর লেখা বেন্জামিনের গ্রন্থটি একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ : *The Paris of the Second Empire in Baudelaire* (১৯৩৮)। বের্টল্ট ব্রেখ্টের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘকালের, এবং তিনি ব্রেখ্টের নাট্যকলা নিয়ে ব্যাখ্যামূলক সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন। বেন্জামিনের মূল খ্যাতি যান্ত্রিক মুদ্রণবিপ্লবের যুগে আর্টের অবস্থান যে কী বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার ব্যাখ্যা রচনা করার জন্যে। তাঁর মতে ফটোগ্রাফি এবং সিনেমার মতো প্রকৌশলগত আবিষ্কার আর্টের স্ট্যাটাসকে চিরকালের জন্য পাল্টে দিয়েছে। একসময় শিল্পকর্ম ছিল একক ও অদ্বিতীয়: একটি চিত্রকর্মের কোনো জুড়ি ছিল না। এখন ফটোগ্রাফি বা ফটোকপিয়ারের মাধ্যমে মিনিটে তার হাজারটা কপি করা সম্ভব। ফলে আর্টকে ঘিরে যে জ্যোতিশ্চক্রটি ছিল (বেন্জামিনের ভাষায় 'aura') তা এখন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ফটোগ্রাফি, বেতার সম্প্রচার ইতাদি আর্টকে পুনর্জনন করছে যান্ত্রিকভাবে, সৃষ্টি হচ্ছে 'অরিজিনালবিহীন কপি'। বেন্জামিন যে-বিখ্যাত রচনায় এই ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন তার নাম 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.' আর্টের সাথে পূর্বে যে প্রায়-ধর্মীয় 'অরা' জড়িত ছিল তার জায়গা দখল করছে শৈল্পিক সৃষ্টি ও শিল্প-উপভোগের এক নতুন নৈতিকতা : সমীহ ও শ্রদ্ধার জায়গায় ভঙ্গিবিচার প্রাধান্য পাচ্ছে; আর্টের বিচারে ঢুকছে রাজনীতি। শিল্পকর্মের রাজনীতি নিয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধের নাম 'The Author as Producer'। বিশ শতকের

ত্রিশের দশকে ওয়াল্টার বেনজামিন যে পয়গম্বরসুলভ ভবিষ্যদর্শন করেছিলেন তার রূপায়ণ আমরা দেখছি এই 'উত্তরাধুনিক' যুগে ।

## আইডিওলজি : আলথুসার ও ম্যাশেরি

মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বে 'আইডিওলজি' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । সাধারণভাবে আমরা 'আইডিওলজি' বলতে বুঝি এমন ধারণাপ্রপঞ্চ যা একটি জনগোষ্ঠি সচেতনভাবে ধারণ করে, যে-ধারণাগুলো তারা ভাষায় রূপ দিতে সক্ষম । যেমন, ধরা যাক, মুক্তবাজার একটি আইডিওলজি এর সমর্থকরা নানা যুক্তিপরম্পরার মাধ্যমে মুক্তবাজারের আদর্শকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে । অথবা কোনো বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার পেছনে থাকতে পারে বিশেষ ধরনের আইডিওলজিগত সমর্থন । আমরা সাধারণত আইডিওলজিকে ইতিবাচক সক্রিয়তা বলে বিবেচনা করি । কিন্তু মার্কসীয় চিন্তায় আইডিওলজি তা-ই যা জগৎকে আমাদের কাছে ভুলভাবে তুলে ধরে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের বাস্তবতাকে আমাদের চোখে ফুটে উঠতে দেয় না, অর্থাৎ সমাজবাস্তবতার চেতনাকে কুয়াশাচ্ছন্ন কিংবা রুদ্ধ করে । টেরি ঈগল্‌টনের ভাষায়

> Ideology is not in the first place a set of doctrines; it signifies the way men live out their roles in class-society, the values, ideas and images which tie them to their social functions and so prevent them from a true knowledge of society as a whole. (Eagleton, 15)

মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্লেখানভের মতে সকল শিল্পকর্মই আইডিওলজিসম্ভূত, এবং এমন কোনো শিল্পকর্ম নেই যেখানে আইডিওলজিগত উপাদান নিহিত নেই । তবে রাজনীতি-তত্ত্বের মধ্যে বা আইন-সংহিতার মধ্যে যেভাবে শাসকশ্রেণির আইডিওলজি সরাসরি ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা নয় । সাহিত্যের সাথে আইডিওলজির সম্পর্ক প্রায়শ অপ্রত্যক্ষ, জটিল ও দূরসঞ্চারী ।

আইডিওলজি-র তাত্ত্বিক ধারণাটির জন্ম ফরাসি বিপ্লবের যুগে । পরবর্তীকালে এর নানা বিবর্তন ঘটেছে । 'Ideology' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন দেস্তুত দ্য ত্রেসি (Destutt de Tracy) ১৭৯৬ সালে (Reign of Terror) -এর সময় কারান্তরীণ অবস্থায় । তাঁর রচনায় তত্ত্বের বিজ্ঞানকে (Science of Ideas) তিনটি শাখায় বিভক্ত করে দেখান তিনি আইডিওলজি, সাধারণ ব্যাকরণ এবং লজিক । এদের মধ্যে আইডিওলজি হল তত্ত্ববিজ্ঞানের 'বিষয়', দ্বিতীয়টি হল 'মাধ্যম', এবং তৃতীয়টি এর 'যৌক্তিকতা' । নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইডিওলজি শব্দটি ব্যবহার করতেন নিন্দাসূচক অর্থে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধী উদারনৈতিক রিপাবলিকান তথা মাদাম দ্য স্তায়েল (Madame de Staël), দেস্তুত ত্রেসি (Destutt

Tracy), কনস্ত্যাঁ (Constant) প্রমুখকে নেপোলিয়ন আখ্যা দিয়েছিলেন 'Ideologues' বলে।

মার্কসীয় তত্ত্বমতে সমাজের ভিত বা base-এর অংশ হল শ্রেণিসম্পর্ক, আর আইডিওলজি হল উপরিকাঠামোর অংশ। সমাজের প্রধানতম আইডিওলজিগুলোর মধ্যে আছে ধর্ম, আইন এবং রাজনৈতিক সিস্টেম। শাসকশ্রেণি যেহেতু উপরকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই এটাও ঠিক করে দেয় ঐ সমাজের রজনৈতিক-আইনগত-ধর্মীয় আইডিওলজি কী হবে। ভেতরকাঠামোর অন্তর্গত অধঃশ্রেণিগুলোকে শেখানো হয়, এই আইডিওলজিগুলোর পালন ও পরিপোষণই তাদের জন্য আদর্শ। শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য নিবেদিত হয় ঐ বিশেষ সমাজের আইডিওলজি, যা অধঃশ্রেণিকে বিভ্রান্তির জালে বেঁধে শোষণের প্রক্রিয়াকে বৈধতা দান করে, এমনকি মহিমান্বিত করে। উদাহরণত, পুঁজিবাদী সমাজে ভোগবাদী কনস্যুমারিজমকে আইডিওলজি হিসেবে প্রচার ও মহিমায়ন করা হয় : বলা হয়, আরো বেশি দ্রব্য ক্রয় করো, আরো বেশি খাও, প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে দেদার ওভারড্রাফট ক'রে হলেও ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ। তৈরি হয় commodity fetishism, যাকে বাংলায় বলা যাক পণ্যপূজা। যেন পণ্য কোনো শ্রমোৎপাদন নয়, বরং স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ংমূল্যবান। শাসকশ্রেণি অন্য শ্রেণিদের বোঝায় যে শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষা হলেই সর্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হবে তাদের মঙ্গলেই সবার মঙ্গল। রাজনৈতিক সংগঠন, বক্তৃতা, মিডিয়া, সিলেবাস সবকিছুর মাধ্যমে এই আইডিওলজির প্রচার চলতে থাকে। এর ফলে সমাজের অ-শাসকশ্রেণিগুলোর মনে সৃষ্টি হয় 'ভ্রান্ত চেতনা'। গেয়র্গ লুকাচ্-এর মতে শাসকশ্রেণির স্বার্থকে সর্বশ্রেণির স্বার্থ বলে চালিয়ে দেয়ার এই চালিয়াতি চলে আইডিওলজির নামে। আন্তনিও গ্রামসি (Antonio Gramsci) তাঁর কালচারাল হেজিমনির (Cultural hegemony) তত্ত্ব দিয়ে বোঝান কেন শ্রমিকশ্রেণি তাদের কিসে মঙ্গল সে-সম্পর্কে ভ্রান্ত আদর্শগত ধারণা পোষণ করে। পুঁজিবাদের বিকাশ-বিস্তারের ইতিহাসের নানা স্তরে তিনটি আইডিওলজি কার্যকর থেকেছে: (১) বিকাশের যুগে ক্ল্যাসিক্যাল উদারনৈতিকবাদ (Classical liberalism); (২) সংহত প্রবৃদ্ধির যুগে সামাজিক গণতন্ত্র (Social democracy); (৩) সমসাময়িক বা বিলম্বিত পুঁজিবাদের (Late capitalism) যুগে নব্য-উদারনৈতিকবাদ (Neo-liberalism)।

'আইডিওলজি'-র ধারণাটি মার্কসবাদের বাইরে জন্ম নিলেও মার্কসীয় চিন্তাধারার কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। মার্কসবাদী লেখকরা এর ভিন্ন-ভিন্ন ব্যাখা দিয়েছেন; তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল তিনটি :

(১) আইডিওলজি হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণি বা গ্রুপের বিশ্বাসপ্রপঞ্চের সমাহার;

(২) আইডিওলজি কিছু ভ্রান্ত চেতনা বা ভ্রান্ত আইডিয়ার সিস্টেম যা সত্যিকার বা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের বিপরীত;

(৩) আইডিওলজি অর্থ এবং আইডিয়া জননের একটি সাধারণ প্রক্রিয়া।

(১) এবং (২) পরস্পর পরিপূরক। শ্রেণিবিভাজিত সমাজে সকল বিশ্বাসই শ্রেণি-অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার, (শ্রমিকশ্রেণি ছাড়া) সকল শ্রেণির বিশ্বাসপ্রপঞ্চ অংশত অথবা সম্পূর্ণত ভ্রান্ত এবং অলীক। শ্রমিকশ্রেণির আইডিওলজি শ্রেণিমুক্ত সমাজে হোক অথবা শ্রেণিবিভাজত সমাজের একাংশ হিসেবেই হোক্ বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, লেনিন যাকে বলেছেন 'সমাজতান্ত্রিক আইডিওলজি'।

> Socialism, in so far as it is the ideology of struggle of the proletarian class, undergoes the general conditions of birth, development and consolidation of any ideology, that is to say it is founded on all the material of human knowledge, it pre-supposes a high level of science, scientific work, etc. ... In the class struggle of the proletariat which develops spontaneously, as an elemental force, on the basis of capitalist relations, socialism is introduced by the ideologists. ('Letter to the Federation of the North', Collected Works, Moscow, 1961: 6, 163) (D×…Z Williams, 69)

(৩)-সংখ্যক ব্যাখ্যাটির নাম দেয়া হয়েছে "ideology as an instrument of social reproduction". এই ধারণা সাধারণভাবে জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব নির্মাণে ব্যবহার করেছেন কার্ল মানহাইম (Karl Mannheim), ড্যানিয়েল বেল (Daniel Bell) এবং য়ুর্গেন হ্যাবারমাস্ (Jürgen Habermas)। মানহাইম, বিশেষত, আইডিওলজির মার্কসবাদী ধারণাকে সংকীর্ণ বা বিশেষ তত্ত্বের স্তর থেকে একটি সাধারণীকৃত ও সামগ্রিক স্তরে উন্নীত করেছেন : তিনি বলেছেন, সকল আইডিওলজি, মার্কসবাদসহ, সামাজিক জীবন থেকে উদ্ভূত। এই ধারণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিক পিয়ের বোর্দো (Pierre Bourdieu)।

ফরাসি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক লুই আলথুসার (Louis Althusser) আইডিওলজিকে চাবি-শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আলথুসার আইডিওলজির যে অর্থ করেছেন তার কেন্দ্রে সাহিত্য তথা সংস্কৃতির মুখ্য ভূমিকা :

> Ideology is a system (possessing its logic and proper rigour) of representations (images, myths, ideas or concepts according to the case) endowed with an existence and an historical role at the heart of a given society. (Goldstein, 23).

আলথুসার রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র দু'ভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেঃ (১) দমনমূলক সংগঠনের (repressive structures) মাধ্যমে এবং (২) রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের হাতিয়ারের (State ideological apparatuses) মাধ্যমে। দমনমূলক সংগঠনসমূহের মধ্যে আছে পুলিশ, কোর্টকাচারি, জেলখানা, সেনাবাহিনী ইত্যাদি; আদর্শগত হাতিয়ার হল রাজনৈতিক দল, বিদ্যালয়,

মিডিয়া, ধর্মীয় উপাসনালয়, পরিবারতন্ত্র এবং শিল্প-সাহিত্য। আলথুসারের মতে সবকিছুই 'material existence of an ideological apparatus'-এর অংশ—

be it only a small part of that apparatus: a small mass in a small church, a funeral, a minor match at a sports club, a school day, a ploitical party meeting, etc. (Althusser, 20)

আইডিওলজিক্যাল এই হাতিয়ারগুলো রাষ্ট্রের স্থিতাবস্থা বজায় রাখে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের শেখায় বিশেষ ধরনের আচরণ ও বিশ্বাস লালনেই তাদের সর্বোত্তম মঙ্গল। নাগরিকরা প্রত্যেকে মনে করে তারা স্বাধীনভাবেই এই আচরণ ও বিশ্বাসগুলো বেছে নিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো আরোপিত হচ্ছে তাদের ওপর। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্র শেখায়, 'আইনের চোখে সবাই সমান'। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আইনের সুরক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা সবার সমান নয় : যার অর্থবিত্ত আছে সে ভালো আইনজ্ঞ নিয়োগ করতে পারে। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকারের নীতি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনী-নির্ধনের আইনি সমতালাভে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু আদর্শবাদ-উদ্ভূত চেতনা সবাইকে বিভ্রান্ত করে : স্বাধীনতার অর্থ 'সবাই সমান' নয় : জর্জ অরওয়েলের ভাষায়—'All men are equal, but some men are more equal than others.' আমরা মনে করি, আমাদের সামনে অনেক অপশন আছে, আমরা স্বাধীনভাবে যেকোনো একটা বেছে নিচ্ছি। কিন্তু আসলে তা নয়। আলথুসারের মতে পুঁজিবাদ এই চতুর কৌশলের দক্ষ ব্যবহারকারী। গণতন্ত্রকে আমরা মনে করি একটি সুষম আইডিওলজি, যেখানে আমার পছন্দের নেতাকে বা সরকারকে বেছে নেয়ার অধিকার আমার আছে, কিন্তু  সব রাজনৈতিক দলই বস্তুত একই চরিত্রেরকিছু বুলি ছাড়া তাদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যই নেই। রাষ্ট্র এ-ক্ষেত্রে নাগরিকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে শক্তি দিয়ে নয় বরং আইডিওলজিক্যাল হাতিয়ার দিয়ে। একটু ভিন্নভাবে একেই আন্তোনিও গ্রামসি (Antonio Gramsci) বলেছেন আধিপত্য বা হেজমোনি (hegemony)।

ইতালীয় মার্কসবাদী আন্তনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) আইডিওলজির যে-সংশোধিত ব্যাখ্যা দেন তা এরকম: রাষ্ট্র সবসময় বলপ্রয়োগে তার আইডিওলজি জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয় না; বরং জনগণের 'সম্মতি'র ভিত্তিতেই তাকে কার্যকর করে। সমাজের প্রবল অংশ ঐতিহাসিকভাবে যে সম্মান ও ক্ষমতা উপভোগ করে সেটিই তার আইডিওলজিকে সমীহযোগ্য ও গ্রহণীয় করে তোলে জনতার কাছে, এবং তারা স্বেচ্ছায় সেটি গ্রহণে সম্মত হয়। এটি স্বতঃস্ফূর্ত : " 'spontaneous' consent given by the great masses of the population to the general; direction imposed on social life by the dominant fundamental group." (Gramsci, 277) গ্রামসির মতে 'শাসন' আর আধিপত্য দুটি ভিন্ন বিষয় : রাষ্ট্র শাসন করে সরাসরি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে (কখনো-কখনো বলপ্রয়োগে), আর হেজিমোনির মাধ্যমে সামাজিক প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্ট আদর্শিক খাতে বইয়ে দিয়ে একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে নিশ্চিতি দান করে। রেমন্ড উইলিয়ামসের কথায়, হেজিমোনি হচ্ছে 'the whole lived

social process as practically organized by specific and dominant meanings, values and beliefs of a kind which can be abstracted as a 'world-view' or 'class outlook." (Williams, 101) আলথুসার মনে করেন, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদান দিয়ে আইডিওলজি নির্মিত হয় না, অর্থাৎ সমাজের ভিত এবং উপরকাঠামোর মধ্যেকার সম্পর্কটি সরাসরি এবং এক-বনাম-এক নয়: বরং অনেকগুলো কারণ একসাথে মিলে আইডিওলজি গড়ে তোলে। এই কারণগুলোর মধ্যে কালচার (সাহিত্যসহ) একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কালচার এবং অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও আর্টের একটু স্বাধীনতা রয়েছে। কেবলমাত্র ভিত্তিই সমাজের উপরকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে না। আলথুসারের মডেল তাই স্থূল ভিত-উপরকাঠামো-কেন্দ্রিক ধারণা থেকে দূরবর্তী। কালচার যে আইডিওলজির শক্তি গড়ে তোলে তা বস্তুগত শক্তি থেকে অনেক ক্ষমতাবান। এজন্য সাহিত্য নিজগুণেই আইডিওলজির একটি প্রধান নিয়ামক সে শুধু সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির নিষ্ক্রিয় প্রতিফলকমাত্র নয়। ক্লাসিকাল মার্কসবাদের বেইস্-সুপারস্ট্রাকচারের অনড় প্রপঞ্চ থেকে নন্দনতত্ত্বকে মুক্তি দিয়েছেন বলে আলথুসার হয়ে ওঠেন সমকালীন নয়া মার্কসবাদীদের গুরু। তাঁর তত্ত্বকে অবশ্য সংশোধনবাদী মার্কসবাদও বলা চলে। আদি মার্কসীয় তত্ত্বের কঠোর নিগড় থেকে মুক্তি দিলেও মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন তিনি; কিন্তু মার্কসীয় মৌলবাদের বাঁধনকে আলগা করে এনেছেন নিশ্বাস নেয়ার পরিসর। পিটার ব্যারির মতে,

> These 'Engelsian' pronouncements do not cancel out the Marxist tendency to imprison art within economics, but they do release literature on bail, so to speak, and allow it a high degree of day-to-day freedom.'' (Barry, 164)

আমরা আগে বলেছি যে, বাস্তব পৃথিবীর ওপর আইডিওলজি একটি কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দেয়। বাস্তবতাকে সে যেভাবে দেখায় আমরা সেভাবে দেখি। তার মানে বিজ্ঞানসম্মত বোধি এবং আইডিওলজির মধ্যে একটু আড় রয়েই যায়। এখানে আর্ট তথা সাহিত্যের স্থান বা ভূমিকা কী? সে কি ঐ কুয়াশাকে গাঢ়তর করতে সাহায্য করে, না তাকে হাল্কা করে দিয়ে বস্তুপৃথিবীর আসল চেহারা ফুটিয়ে তোলে? আলথুসারের মতে, আর্টের অবস্থান আইডিওলজি এবং বিজ্ঞানসম্মত বোধির মাঝামাঝি জায়গায়। আর্ট বা সাহিত্য যে-শ্রেণির আইডিওলজিতে স্নাত হোক-না কেন, শেষপর্যন্ত সে তার মনিবের ভাড়া খাটে না, বরং সেই আইডিওলজির সীমানা অতিক্রম করে বাস্তবতার রূপকে তুলে ধরতে চায়। মহৎ সাহিত্য কোনো বিশেষ শ্রেণির আদর্শপুষ্ট হয়েও শুধুমাত্র সেই শ্রেণির আইডিওলজির প্রকাশমাত্র হয়েই থাকে না, সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। যে-আইডিওলজি থেকে সে উদ্ভূত, তাকে সে ক্রিটিক্-ও করে থাকে। মার্কসের *Das Kapital* পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে-ধরনের বিজ্ঞানসম্মত বোধি দান করে, ডিকেন্সের উপন্যাস *Hard Times* অবশ্যই ততটা পারে না ঠিকই, কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতার

প্রতিফলন ঘটিয়ে সে সংশ্লিষ্ট আইডিওলজির প্রকৃতিটি তুলে ধরে যাতে ঐ আইডিওলজি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বোধি লাভে আমরা অগ্রসর হ'তে পারি। আর্ট তথা সাহিত্য এবং আইডিওলজির সম্পর্ক নিয়ে প্রাঞ্জলতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন পিয়ের ম্যাশেরি (Pierre Macherey)। তিনি বিভ্রম (illusion) এবং কল্পনার (fiction) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বিভ্রম আর আইডিওলজি একই জিনিস। লেখক মানুষের সাধারণ আইডিওলজিগত বিভ্রমগুলোকে উপাত্ত বা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে নতুন কিছু সৃষ্টি করেন; একটি কাঠামো আরোপ করেন আইডিওলজির ওপর যাতে তাকে সুনির্দিষ্ট কল্পনাগত পরিসীমায় বেঁধে নিয়ে দূরস্থিত প্রেক্ষায় অবলোকন করা যায়। ম্যাশেরির মতে, এভাবে আর্ট আমাদেরকে আইডিওলজিগত বিভ্রম থেকে মুক্তি দান করে। টেরি ঈগল্‌টনের মতে, সাহিত্যসমালোচনার দায় হচ্ছে কোনো সাহিত্যকর্মকে তার উৎস আইডিওলজির প্রেক্ষিতে রেখে বিবেচনা করা, এবং বিচার করা সেই উৎস আইডিওলজি থেকে রচনাটি নিজেকে কতটা দূরান্বিত করে তুলতে পেরেছে :

> A scientific criticism would seek to explain the literary work in terms of the ideological structure of which it is part, yet which it transforms in its art: it would search out the principle which both ties the work to ideology and distances it from it. (Eagleton, 18)

## 'নিউ লেফট': উইলিয়ামস, ঈগলটন, জেমসন

১৯৩০-এর দশকের পর বৃটেন ও আমেরিকায় মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বে ভাঁটার টান শুরু হয়। ১৯৭০-এর দশক থেকে আবার নতুনভাবে এই তত্ত্বের আলোচনা বেগ পেতে শুরু করে। ১৯৬৮ সালের ফরাসি ছাত্রবিক্ষোভের পেছনে মার্কসীয় সমাজবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল। দ্য গলের সরকারের হাতে সে-বিপ্লবপ্রচেষ্টা মার খাওয়ার পর এর প্রতিক্রিয়া হল দু'রকম: একদল প্রগতিবাদী তরুণ বিপ্লবের অসম্ভাব্যতাকে শিরোধার্য মনে ক'রে তাঁদের চিন্তা ভিন্নখাতে বইয়ে দিলেন সৃষ্টি হল সমাজবিমুখ, ভাষানির্ভর উত্তরাধুনিক তত্ত্বের; অন্যদিকে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হল মার্কসবাদ নিয়ে। এই নতুন বামপন্থাকে 'নিউ লেফট' নামে অভিহিত করা চলে। *New Left Review* নামের সাময়িকপত্র (১৯৬০ সাল থেকে প্রকাশিত) হয়ে ওঠে নব্য-বামপন্থীদের প্রকাশমাধ্যম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নব্যমার্কসবাদের বাহন হয় *ঞবষড়ং* নামের পত্রিকা। ব্রিটেনে বামপন্থী সাহিত্যতত্ত্বের পটভূমিকা নির্মাণ করছিলেন একজন প্রভাবশালী চিন্ত াবিদ রেমন্ড উইলিয়ামস (Raymond Williams)। উইলিয়ামস শুরু করেন সংস্কৃতি-ব্যাখ্যার ব্রিটিশ তরিকার মূল্যায়নকর্ম দিয়ে : তাঁর *Culture and Society 1780-1950* (1958) একটি প্রভাবশালী গ্রন্থ। এরপর তিনি সংস্কৃতি তথা সামাজিক জীবনের পূর্ণতর ব্যাখ্যা দানের জন্য তাত্ত্বিক পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যাপৃত হন। আর এই ব্যাখ্যাটি তিনি করেন বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের (যেমন জর্জ এলিয়টের *Middlemarch* এবং জয়েসের

*Ulysses*) সমালোচনার মধ্য দিয়ে। উইলিয়ামস তাঁর তত্ত্বের নাম দেন 'সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ' (Cultural Materialism)। তবে রেমন্ড উইলিয়ামস তাঁর কাজকে সরাসরি মার্কসবাদী বলতে দীর্ঘদিন অনীহ থাকলেও ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত *Marxism and Literature* তাঁর তাত্ত্বিক পরিচয়কে স্পষ্ট করে। উইলিয়ামসের এই বই যেমনি দুরূহ তেমনি বিশদ ও বিশ্লেষণগভীর। ঈগল্টন এই বইকে বলেছেন 'truly pathbreaking':

> (*Marxism and Literature*) has survived its historical moment continues to exert a fascinating influence. Typically idiosyncratic in form— a series of brief illuminating vignettes of some vital topics in materialist criticism—it is equally challenging and original in its content. Williams was at once close to Marxism, and a robustly independent critic who made his own unique intellectual voyage. It is this combination of political sympathy with a powerfully distancing perspective which allows this deeply felt study at once to comment on its subject, and effectively to reinvent it. (Quoted on the back cover)

বইয়ের ভূমিকায় উইলিয়ামস বর্ণনা করেছেন কীভাবে পঞ্চাশের দশকের পরে নব-মার্কসবাদের মুখোমুখি হন তিনি এবং একটি স্থির ও অনড় মার্কসীয় তত্ত্বের পরিবর্তে বিবর্তমান বিশ্বে বিপুলভাবে পরিবর্তিত একটি চিন্তনকাঠামোকে বিকশিত হতে দেখেন। অন্য দিকে সাহিত্যও নানাভাবে সমস্যাপরিকীর্ণ ও বিবর্তিত হয়েছে। এই নতুনতর সাহিত্য ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন নমনীয় ও উদার মার্কসভাবনার। তাঁর লেখকজীবনের প্রথমভাগে তিনি মার্কসীয় দর্শনের অনেক উপাদানকে সমালোচনায় ব্যবহার করলেও একটি সচেতন দূরত্ব বজায় রেখেছেন। *Culture and Society* পর্যায় পর্যন্ত উইলিয়ামস এই রকম। কিন্তু মধ্য-পঞ্চাশের দশকের পর তিনি লুকাচ্ কিংবা ব্রেখটের ভাবনা দ্বারা যেমন স্পৃষ্ট হন তেমনি পোল্যান্ড, ফ্রান্স, এমনকি খোদ স্বদেশ ইংল্যান্ডের নবীন মার্কসীয় ভাবনার সাথে পরিচিত হন

এই নবীন ভাবনা অনেকাংশেই ক্লাসিক্যাল মার্কসবাদ থেকে ভিন্ন এবং নানাবিধ বিকল্পের অভিসারী বলে তাঁর মনে হয়েছে। ত্রিশের দশকের মার্কসবাদী ব্রিটিশ সমালোচক ক্রিস্টোফার কডওয়েলের (Christopher Caudwell)-এর লেখা ফিরে পড়তে গিয়ে দেখলেন কীভাবে একসময় কে মার্কসবাদী আর কে নয়, এ নিয়ে তর্ক হত। সেসময় কেউ স্থির-অনড় মার্কসীয় চিন্তা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হলেই তাকে বলা হত, অ-মার্কসবাদী, সংশোধনবাদী, নব্য-হেগেলীয়, অথবা বুর্জোয়া। *Marxism and literature* কালচারাল স্টাডিজের একটি আরম্ভ-বিন্দু; এখানে উইলিয়ামস সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মার্কসীয় তত্ত্বের একটি মেলবন্ধন ঘটান। উইলিয়ামস আন্তনিও গ্রামসির তত্ত্বের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন বইটিতে, তা সত্ত্বেও

এটি নির্ভুলভাবে তাঁর স্বকীয়তাকেও ধারণ করে আছে। *Marxism and Literaure* তিনটি পর্বে বিভক্ত: ১. Basic Concepts (এখানে সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য এবং আইডিওলজি আলোচিত হয়েছে); 2. Cultural Theory (এটি গ্রন্থের মূল অংশ এবং উইলিয়ামসের নিজভাষ্য); ৩.Literary Theory (সাহিত্যকর্ম ব্যাখ্যায় তাঁর কালচারাল মেটিরিয়্যালিজমের প্রয়োগ।

টেরি ঈগলটন তাঁর গুরু রেমন্ড উইলিয়ামসের তত্ত্বপ্রস্থানের বৈপ্লবিক সমালোচনার মাধ্যমে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। সাহিত্যসমালোচনার লিভিসীয় (এফ. আর. লিভিস-চর্চিত টেক্সটের নিবিড়পঠনের ব্রিটিশ-ঐতিহ্যিক) ধারাকে পরিত্যাগ করে তিনি আলথুসারের আইডিওলজির ধারণাকে কাজ লাগান। ঈগলটনের মতে, সাহিত্য-টেক্সট ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না: বরং আইডিওলজির ওপর নিজেকে প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে বাস্তবের একটি প্রতিভাস রচনা করে। টেক্সট স্বাধীনভাবে বাস্তবতাকে দেখাতে পারে বলে আপাতভাবে মনে হয় : যেমন যে-কোনো চরিত্র বা ঘটনা সে তুলে ধরতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিয়ন্ত্রক হচ্ছে আইডিওলজি। আইডিওলজি বলতে শুধু কিছু বিধিবদ্ধ তত্ত্ব বোঝায় না, বরং বোঝায় ব্যক্তির ধর্মীয়, নান্দনিক, নৈতিক সকল অভিব্যক্তির সিস্টেম যা তার যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে গড়ে তোলে। আলথুসার ভেবেছিলেন যে, সাহিত্য ইচ্ছে করলে আইডিওলজি থেকে নিজকে দূরান্বিত করতে পারে। কিন্তু ঈগলটনের মত ভিন্ন: তাঁর মতে টেক্সট হচ্ছে ইতোমধ্যে বর্তমান আইডিওলজিগত ডিসকোর্সের জটিল নেটওয়ার্কের ফসল। তবে সাহিত্য শুধু ইতোমধ্যেবর্তমান আইডিওলজিগত সিস্টেমের নেটওয়ার্ককে প্রতিফলিত করে না, সে নতুন আইডিওলজি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে সাহিত্যসমালোচনা তাই সেইসব বিধি আবিষ্কারের হাতিয়ার যেগুলো আইডিওলজিগত ডিসকোর্সকে সাহিত্যরূপে সৃজন করে। সত্তরের দশকে উত্তর-কাঠামোবাদী তত্ত্বের সমূহ অভিঘাতে ঈগল্‌টনের চিন্তা নাড়া খায়।

জাক্ দেরিদা, পল দ্য মান ও অন্যদের ডিকনস্ট্রাক্‌শন তত্ত্বকে প্রথমত তিনি স্বাগত জানান এ কারণে যে জ্ঞানের অনড় ও অমোঘত্বের আবহমান ধারণাকে এর দ্বারা ফাটিয়ে দেয়া চলে। কিন্তু আবার অন্য দিকে ডিকনস্ট্রাক্‌শন তথা তাবৎ উত্তর-কাঠামোবাদী প্রকল্পকে তিনি সমালোচনার যোগ্য মনে করেন 'গণবিরোধী' ও 'বাস্তববাদবৈরী' পাতিবুর্জোয়া তত্ত্ব বলে। তাঁর মতে ডিকনস্ট্রাক্‌শন ও পোস্টমডার্নিজমের পেছনকার আইডিওলজিটি পুরোপুরি রাজনৈতিক এজেন্ডা: সমালোচকের কাজ হল সেইসব 'rhetorical structures'-এর মুখোশ খুলে দেয়া 'by which non-socialist works produce politically undesirable effects.' ঈগল্‌টনের মতে মার্কসবাদী সমালোচনার কাজ এখন দর্শন দ্বারা নয়, বরং রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঈগল্‌টনকে আদি লেনিনীয় সাহিত্যচিন্তারই বেশি সমধর্মী মনে হয়, আলথুসারের উদারপন্থার তুলনায়। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর বই *Walter Benjamin or Towards a*

*Revolutionary Criticism*-এ তিনি বেন্‌জামিনের 'মরমি বস্তুবাদ'-এর সমালোচনা করে অধিকতর বিপ্লবী একটি নন্দনের প্রস্তাব রাখেন। লেখককে শ্রমিকশ্রেণির সাথে সম্পর্কিত থাকতে হবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকরা মডার্ন কালচারের প্রতি যতটা হতাশা ও বিরূপতা প্রকাশ করেছেন, তার সবটাই ফাসিস্ত্‌ দমননীতি আর মার্কিন পুঁজিবাদের প্রচণ্ড আগ্রাসনের প্রতি ক্ষোভ থেকে জাত। সত্যিকার শ্রমিকশ্রেণির সাথে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। ঈগলটন বরং প্রশংসা করেছেন ব্রেখ্‌টের: ব্রেখ্‌টের নাটকে পুরনো সাহিত্যকর্মকে (যেমন শেকস্‌পিয়ারের *Coriolanus* এবং টমাস গে-র *Beggar's Opera* ) বর্তমান শ্রমজীবী মানুষের বাস্তবতার সাথে সমন্বিত করে যে বিপ্লবাত্মক সমাজপ্রেক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। ঈগল্‌টনের নিজের বিপ্লবাত্মক সমালোচনার নমুনা *The Rape of Clarissa* (1982) : এখানে তিনি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক রিচার্ডসনের উপন্যাসের পুনর্পাঠ করেছেন জাক্‌ লাকাঁর নব-ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব এবং জাক্‌ দেরিদার ডিকনস্টাক্‌শনতত্ত্বকে একসাথে মিশিয়ে। ঈগল্‌টনের বিখ্যাত গ্রন্থ *Literary Theory: an Introduction* তাঁর মার্কসীয় ব্যাখ্যার একটি তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য ও সুপাঠ্য দলিল।

ঈগল্‌টনের অধিকতর সাম্প্রতিক গ্রন্থ *After Theory* (২০০৩) নানা কারণে আকর্ষক। এই গ্রন্থে তাঁর তত্ত্বচিন্তায় পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের নানা শাখা-বিদ্যা সম্পর্কে দ্বিধা ও পরস্পরবিরোধী মনোভাব লক্ষযোগ্য। পোস্টমডার্নিজমের সমালোচনা করছেন, কিন্তু পোস্টমডার্নিস্টদের বিশ্বভাবনার মূল দিকগুলোর সাথে তিনি একমত পোষণ করেন। নারীবাদী তত্ত্বের সাংস্কৃতিক বয়ান নিয়ে তাঁর দ্বিমত আছে, কিন্তু একটি দার্শনিক ও রাজনৈতিক নীতি হিসেবে নারীবাদকে তিনি সমর্থন করেন। উত্তর-উপনিবেশি তত্ত্ব সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব দ্বিভাজিত: একসময় পোস্টকলোনিয়াল তত্ত্ব প্রবলভাবে মার্কসবাদ-অন্বিত ও মারদাঙ্গা ছিল; এখন সেটি Identity poltics-এর ভিন্নতর ভাষ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, যা জাতিগত-পরিচয়-পার্থক্যকে ফেটিশে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে পুঁজিবাদেরই সহযোগী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পোস্টমডার্নিজমের এনলাইটেনমেন্ট-বিরোধিতাকে তিনি সমালোচনা করেছেন মূর্খতা বলে; সামগ্রিকভাবে পোস্টমডার্নিজম কর্পোরেট কালচারের স্বার্থরক্ষাকারী বলে ঈগলটনের অভিমত। *After Theory*-তে চলমান কালচারাল থিয়োরি এবং সাহিত্যতত্ত্ব দুটোরই সমালোচনা করেছেন, বিশেষ করে এ-দুয়ের মিশ্রণে উভয়ই যখন চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। তবে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির আন্তঃডিসিপ্লিন চর্চা বিচিত্র জ্ঞানশাখার জন্ম দিচ্ছে বলে তিনি আবার খুশিও বটে। এই বইয়ে ঈগল্‌টন নৈতিকতা ও 'পরম' (Absolute)-এর ধারণা নিয়ে দার্শনিক আলোচনাও করেছেন। তাঁর ভাষায় সমাজবাদকে নৈতিকতার বিষয়টি ভাবতে হবে। পোস্টমডার্নিজম পরম বা অ্যাবসল্যুট-এর ধারণা বর্জন করেছে। কিন্তু তাঁর মতে পরম অস্তিত্ববান। ঈগল্‌টন অনেকটা সুফিদের মতো কিংবা বাংলার বাউলদের মতো দেহতত্ত্বের যে-বয়ান এখানে উপস্থিত করেন তা বিস্ময়কর। তাঁর

মতে, আমাদের দেহ আমাদের নিজস্ব নয়; এটি আমরা উপার্জন করিনি, এবং একমাত্র আত্মহত্যা ছাড়া দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো পথ আমাদের অধিকারে নেই। এই বস্তুগত দেহই সময় এবং স্পেস-এ বিস্তৃত হয়ে সমগ্র মানবপ্রজাতির সাথে আমাদের যুক্ত করছে। নৈতিকতার প্রসঙ্গটি এখানেই আসছে। আমরা আমাদের প্রজাতির অন্য সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারি এই দেহগত সাযুজ্যের কারণে। এই দেহ এবং তার অবসান (মৃত্যু)-কে অ্যাবসল্যুট হিসেবে নিয়ে আমরা গড়ে তুলতে পারি নৈতিকতা। তার জন্য কোনো জগদীশ্বর, বা দেবতা, ফেরেশতা কিংবা অন্য-কোনো আধিদৈবিক প্রপঞ্চের প্রয়োজন নেই।

ঈগল্টনের পাশাপাশি কিংবা তারও চেয়ে জোরদারভাবে উচ্চারিত নাম ফ্রেডরিক জেমসন। মার্কিনি এই অধ্যাপক ১৯৬৯ সালে সান দিয়েগোর ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় মার্কসিস্ট লিটারারি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। টেরি ঈগল্টনের মতোই তিনিও চলমান দার্শনিক ও সাহিত্যচিন্তা বা থিয়োরির সাথে মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে সংযুক্ত করার প্রয়াস পান। তবে ঈগলটন যেখানে লেনিনীয় ও অ্যান্টি-হেগেলিয়ান, এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের উদারনৈতিকতার সমালোচক, জেমসন সেখানে হেগেলীয় ডায়ালেক্টিক্সকে সভ্যতার তথা কালচারের মূল প্রবর্তনা বলে ভাবেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকবর্গ যথা আডর্নো, ওয়াটার বেন্জামিন, হারবার্ট মারক্যিউস, লুই আলথুসার প্রভৃতির তত্ত্বপ্রস্থানকে (অর্থাৎ কালচারাল ক্রিটিসিজমকে মার্কসবাদী তত্ত্বের কেন্দ্রে স্থাপন করা) সমর্থন করেন। অর্থডক্স মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি সংকীর্ণ ধারণা উপস্থাপন করেঃ আইডিওলজি সেখানে কেবলমাত্র ভিত-উপরিকাঠামোর অর্থনৈতিক সম্পর্ক। ইঙ্গ-মার্কিন নয়া মার্কসবাদীরা সেখানে প্রয়োগ করছেন 'immanent critique'-নামক হেগেলীয় ধারণাকেঃ সাহিত্যটেক্সটের পেছনকার দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের যথার্থ ও পরিপূর্ণ বিবরণ (কেবল আর্থনীতিক শ্রেণিসম্পর্কের বিবরণ নয়) যুক্ত করতে হবে। কার্ল মার্কস স্বয়ং তাঁর প্রথম দিককার রচনায় হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক চিন্তার একটি নতুনতর মডেল 'immanent critique -এর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। জেমসনের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ *Marxism and Form: Twentieth-Century Dialectical Theories of Literature* (1971) এবং *The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism* (1972)

জেমসন যখন মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব গভীরভাবে অধ্যয়ন করছিলেন সেসময়ই তাঁর সামনে ঘটে যাচ্ছিল তাত্ত্বিকজগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন, কাঠামোবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে। বরং বলা যায় ষাটের দশকে পশ্চিমি অ্যাকাডেমিয়াতে কাঠামোবাদেরই ছিল একাধিপত্যমার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব তখন ব্যাকফুটে। জেমসন তাঁর উপরোক্ত দুই গ্রন্থের মাধ্যমে কাঠামোবাদ ও আঙ্গিকবাদ উভয়ের সমালোচনা করলেন, দেখালেন কীভাবে ঐ দুটো তত্ত্বই বাস্তব থেকে দূরবর্তী হয়েছে। শিল্পকর্মকে

তার কনটেক্সট থেকে (সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থেকে) আলাদা করে শিল্পীকে প্রশংসার বেদিতে বসানো একটি 'হিউম্যানিস্ট' ভ্রান্তি। কাঠামোবাদ এই ভ্রান্তির ফসল। অন্যদিকে আঙ্গিকবাদ (Formalism) অ্যান্টি-হিস্টোরিক্যাল এবং প্রতিক্রিয়াশীল। দুটো তত্ত্বই শিল্পকর্মের উৎপাদন (production) ও ভোগ (consumption) সম্পর্কিত মূল বিবেচ্যগুলো সম্পর্কে অন্ধ। শিল্প ও সংস্কৃতির উৎপাদক ও ভোক্তা অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত, সেই সাথে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন তথা ডায়ালেক্টিক দ্বারাও। জেমসনের একটি শ্লোগান হল 'always historicize.'

জেমসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পোসটমডার্নিজমের অসারতা প্রতিপাদনের জন্য লেখা তাঁর গ্রন্থ *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism* (১৯৯১) পোস্টমডার্নিস্টদের দাবি (জাঁ-ফ্রাসেঁয়া লিওতার দ্র.) সমাজ-পরিবর্তন বা আমূল বিপ্লবের মতো পরা-আখ্যান বা 'মেটান্যারেটিভের' দিন শেষ হয়ে গেছে। জেমসন এই অভিমতকে মনে করেন প্রান্তিক পুঁজিবাদের উৎপাদনপ্রক্রিয়া থেকে সৃষ্ট মানসভঙ্গি থেকে জাত একটি সংশয়বাদ, ইতিহাসের ডায়ালেক্টিক যে-হতাশাকে সমর্থন করে না। অন্যদিকে পোস্টমডার্নিস্টরা যে সকল জঁর বা ফর্মকে ভেঙেচুরে, জীবনের সকল ক্ষেত্র যথা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক প্রধাবনাগুলোকে গুলিয়ে ফেলছেন, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেণির ভূমিকার বৈবিধতাকে অস্বীকার করছেন তার সমালোচনা করেছেন জেমসন। পোস্টমডার্নিস্টদের সত্যসম্পর্কিত আপেক্ষিকবাদও একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ভ্রান্তি। জেমসন মনে করেন মডার্নিজমের টুল্‌সগুলো দিয়েই উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক বোধ অর্জন সম্ভব। পোস্টমডার্নিজম তা করতে পারছে না বিধায় চিন্তার দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের ইতিহাসে বিশাল এক তালভঙ্গের নিয়ামক হয়ে উঠেছে এই তত্ত্বটি। পোস্টমডার্নিজমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে জেমসন দুটো তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন : ১. পোস্টমডার্নিজমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্যাশ্‌টিশ (pastiche), মডার্নিজমের ছিল প্যারডি (parody)। প্যারডির পেছনে নৈতিক বিচার এবং সামাজিক মূল্যমানের সাথে তুলনা করার প্রণোদনা থাকে। কিন্তু প্যাশ্‌টিশ কোনো মূল্য বিচারে না-গিয়ে শুধু কোলাজের মতো বিবিধ উপাদানকে একসাথে হাজির করে। ২. পোস্টমডার্নিজমের একটি দুর্বলতা এর ঐতিহাসিকতার সংকট (crisis in historicity)। বর্তমান পোস্টমডার্ন যুগ ইতিহাস-বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে: ''there no longer does seem to be any organic relationship between the American history we learn from schoolbooks and the lived experience of the current, multinational, high-rise, stagflated city of the newspapers and of our everydaylife. (Jameson, ১৯৯১:২২) কিন্তু জেমসন পোস্টমডার্নিজমকে বাতিলও করছেন না। অনেক বামপন্থী তাত্ত্বিক জেমসনের এই দ্বিধাকে অভিযুক্ত করেছেন। জেমসন মনে করেন, একসময় আধুনিকবাদও ভিক্টোরীয় কালচারে

অভ্যস্তদের কাছে প্রতিরোধের ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু কালে সে-প্রতিরোধ ভেসে গেছে; হাই-মডার্নিস্ট
কালচারের ফসল, যেমন পিকাসোর চিত্রকলা, এলিয়টের কবিতা, শুধু গৃহীত হয়েছে তাই নয়, মনে হয়েছে বাস্তবতার এর চেয়ে লাগসই অভিব্যক্তি আর কিছু হয় না। একইভাবে পোস্টমডার্নিজমের ধাক্কাও একসময় সহনীয় হয়ে উঠবে। মাস্ কালচার, জনপ্রিয় সিনেমা, এয়ারপোর্ট পেপারব্যাক, অ্যান্ডি-ওয়ারহল-জাতীয় চিত্রকলা কালচারের স্বীকৃত ভঙ্গি হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

As for the postmodern revolt against all that, however, it must equally be stressed that its own offensive features—from obscurity and sexually explicit material to psychological squalor and overt expressions of social and political defiance, which transcend anything that might have been imagined at the most extreme moments of high modernism—no longer scandalise anyone and are not only received with the greatest complacency but have themselves become institutionalised and are at one with the official or public culture of Western society. (Jameson, 1991)

জেমসনের সাম্প্রতিক দুটি গ্রন্থ *Archeology of the Future* (২০০৫) এবং *Valences of the Dialectic* (২০০৯)। শেষোক্ত গ্রন্থে জেমসন কয়েকজন সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক যেমন গিলজ দেল্যুজ (Gilles Deleuze) এবং স্লাভয় জিজেক্ (Slavoj □i□ek) -এর তত্ত্বভাবনার প্রতি তাঁর নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

## সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি


1. Althusser, Louis. *Lenin and Philosophy and other Essays*, London: New Left Books, 1971
2. Barry, Peter. *Beginning Theory*. Manchester and New York: Manchester University Press, 2007.

3. Bertens, Hans. *Literary Theory: The Basics*. London and New York: Routledge, 2003
4. Eagleton, Terry. *Marxism and Literary Criticism*. London and New York: Routledge, 1976.
5. Goldstein, Philip. *The Politics of Literary Theory: An Introduction to Marxist Criticism*. Florida: Florida State University Press, 1990.
6. Gramsci, Antonio. ‘‘Hegemony’’, in Julie Rivkin and Michael Ryan (eds) *Literary Theory: An Anthology*, Malden, MA and Oxford: Blackwell, 1998
7. Jackson, Leonard. *The Dematerialisation of Karl Marx: Literature and Marxist Theory*. London and New York: Longman, 1994.
   Jameson, Fredric. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*
8. Lodge, David (ed.) *20th Century Criticism*. London and New York: Longman, 1957.
9. Selden, Reman, et al. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. (4th edn.) London: Prentice Hall, 1997.
10. Williams, Raymond. *Marxism and Literature*. London: Oxford University Press, 1990.

# রবীন্দ্রচর্চায় বামবলয়ের ঐতিহাসিক অবদান

আবদুশ শাকুর

[এই লেখাটি আমাদের দিয়ে আবদুশ শাকুর চলে গেলেন! এ-সংখ্যা কবে বের হবে জানতে চেয়ে একাধিকবার ফোনও করেছিলেন। সময়মত প্রকাশ না-হওয়ায় সংখ্যাটি হাতে তুলে দিতে পারলাম না!

বেশ পড়াশুনা করা উঁচু মানের এই সাহিত্য-স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির ষোলকলা বুঝে উঠতে আমাদের পাড়ি দিতে হবে আরও অনেক সময়। ক্ষমতার তীর্থে অবস্থান করেও স্বীকৃতির জন্য সেই ক্ষমতা আরোপ করেননি। স্বীকৃতিদাতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-এর বেঁধে-দেয়া ছক মেনে না-চলা তাঁর কাল হয়নি; বরং ওসবের তোয়াক্কা না-করে ক্রমাগত সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্য জগতকে ঋদ্ধ করে গেছেন। ১৫ জানুয়ারি ২০১৩, বিকেল ৪টা ৪৫ মি.-এ দেশের অন্যতম বহুমাত্রিক এই সাহিত্য-স্রষ্টা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আবদুশ শাকুর-এর জন্ম ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। তাঁর সৃষ্টির মধ্যদিয়ে তিনি বহুজীবী ও দীর্ঘ-দীর্ঘজীবী হবেন, এ-আমাদের আশাবাদ। –সম্পাদকদ্বয়]

পুঁজিবাদের পাহারাদার হিসেবে যারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী পরিচয় প্রকাশ্যে এবং সগর্বে প্রচার করেন সেই সুবৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীটিই আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথম বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে গোষ্ঠী-বিভাজক শব্দ দুটি ‘আমরা’ এবং ‘ওরা’ ব্যবহার করেছিল। ভাবখানা এমন ছিল যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের পবিত্র ধন, তাঁকে অপবিত্র করার মতলবে তোমরা মাথা গলাবার কে হে?

কী ঘটেছিল সেদিন? রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে? একথা ঠিক যে ১৯৬১ সালের জন্মশতবার্ষিকীর বছরে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার প্রথম সরকারিভাবে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই উপলক্ষে সুলভ মূল্যে মাত্র পঁচাত্তর টাকায় সমগ্র *রবীন্দ্র-রচনাবলি* প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলকাতাসহ রাজ্যের সবকটি জেলাসদরে রবীন্দ্রসদন বা রবীন্দ্রভবন তৈরির প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের রাজধানীতেও রবীন্দ্রনামাঙ্কিত অডিটোরিয়াম নির্মাণসহ আরও কিছু কর্মসূচিও নেওয়া হয় সে বছর।

প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য যে কবির মহাপ্রয়াণের সময় যতই আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটে থাকুক-না কেন ১৯৪১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত কালপর্বটিতে বিশেষভাবে রবীন্দ্র-অনুধ্যান তো নয়ই, সাধারণভাবে রবীন্দ্রচর্চাও কিন্তু তেমন একটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। এমনকি রবীন্দ্রসংগীতের চর্চাও সীমাবদ্ধ ছিল চিহ্নিত একটি গণ্ডির মধ্যেই। গ্রামোফোন কোম্পানি বিপণিত ও বিক্রীত রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের সংখ্যা এবং একই সময়পর্বে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশিত ও বিক্রীত পুস্তকের পরিমাণ থেকেও ব্যাপারটির সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। কেউ কেউ হয়তো এজন্য বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত দেশের পরিস্থিতিকেই দায়ী করে যথার্থ কারণ সন্ধানের দায় এড়াতে চাইবেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, এই দুই দশকে স্তিমিত রবীন্দ্রচর্চার আসল কারণ হল তথাকথিত রবীন্দ্রপূজারিদের উন্নাসিকতা এবং বিশ্বের তাবৎ বঙ্গবাসীর আত্মার দোসরকে পণ্ডিতম্মন্যদের উচ্চমার্গে খাঁচাবন্দি করে রাখার অপতৎপরতাই এর জন্যে দায়ী ছিল। রবীন্দ্রনাথ যতই 'ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে' পৌঁছাবার এবং সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে আসার জন্য হাহাকার করে থাকুন-না কেন, রবীন্দ্রজীবীরা ততোই তাদের একচেটিয়া অধিকার হারাবার ভয়ে বিশ্বসভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মহাপুরুষকে ঔপনিষদিক ধোঁয়াশার ধূম্রজালে আবৃত অলৌকিক দেবতার মতো দূরবর্তী করে রাখার সর্বরকম অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন পঁচিশের বদলে পয়লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত কবির শেষ জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'র ১০ নম্বর কবিতাটি, যেটি দুমাস আগে রচিত ও 'প্রবাসী'র ফাগুন সংখ্যায় 'ঐকতান'* নামে মুদ্রিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফুলের মালা, দীপের আলো, ধূপের ধোঁয়ায় ঢেকে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ আসনে উপবিষ্ট পূজ্য মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। পূজার আসনে বসালে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন পড়ে পুরোহিতের। আর এই রবীন্দ্রপূজারি বুদ্ধিজীবীগণ সেই পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এমন মৌরুসি পাট্টা কি সহজে ছাড়া যায়! তাই গরিব-মুখ্যু-চাষা-ভুষো মানুষেরা তফাৎ যাও। কারণ রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের নন, তিনি গজদন্ত মিনারবাসী মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীজনের। এই ভ্রান্তভাবনাপ্রসূত পদক্ষেপ যে কী মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার একটিমাত্র বাস্তবিক দৃষ্টান্ত স্মরণ করাই যথেষ্ট।

সাল ১৯৬১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এবারের ২৫ বৈশাখে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করা হবে সরকারি উদ্যোগে। সেজন্য সরকারি আদেশনামাও জারি হয়েছে। তখন গ্রামাঞ্চলের সর্বেসর্বা ছিলেন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা বি.ডি.ও সাহেবান। সরকারি আদেশনামা পাবার পর অন্যান্য বি.ডি.ও-দের মতোই কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার একটি ব্লকের বি.ডি.ও সাহেবও স্বভাবতই তৎপর হয়ে উঠলেন।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে তিনি তাঁর এলাকাধীন ব্লকের সর্বত্র ঢোল-শোহরত যোগে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন যে এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হবে মহাসমারোহে। অতএব অনুষ্ঠানে সকলেই যেন আসেন।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার দেখেন যে, সেখানে মানুষের যেন ঢল নেমেছে। সমবেত জনতার বিরাট একটা অংশই মহিলা। বিপুল জনসমাবেশ দেখে বি.ডি.ও তাঁর উদ্যোগের সাফল্যের কথা ভেবে মনে মনে আত্মপ্রসাদও অনুভব করে থাকবেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশি দেরি লাগেনি। বি.ডি.ও সাহেবকে দেখেই মহিলারা তাঁর কাছে এসে অনুযোগের সুরে প্রশ্ন করতে লাগলেন :

'কোথায় তোমার ঠাকুর? কোথায় হবে পূজা? আমরা সেই কখন থেকে দুধভর্তি ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এসব ঢালব কোথায়?'

সুশিক্ষিত বি.ডি.ও. ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা বিহ্বল হলেও পরে ধৈর্য ধরে বোঝাতে লাগলেন যে, এ 'ঠাকুর' সে 'ঠাকুর' নন। এই ঠাকুর-পূজার প্রক্রিয়া-প্রকরণ আলাদা। মহিলারাসহ জনতার বড়ো একটা অংশই তখন নিরাশ হয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। কারণ এমন 'ঠাকুর-পূজা'য় তাঁদের কোনো কাজ নেই।

দু'দিন পর সর্বাধিক প্রচারিত *আনন্দবাজার* পত্রিকায় ছবিসহ খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরটি পড়ে সরকারি মহলে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানা যায়নি, তবে বামমহলের সকলেই লজ্জা পেয়েছিলেন। অতঃপর পার্টির নেতৃত্ব চঞ্চল হয়ে ওঠে একটা কিছু করতেই হবে, এই ভাবনায়। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বড় আকারে এবং ভিন্ন ধরনের কিছু করা যায় কি না তা নিয়ে পার্টিতে আগে থেকেই ভাবনাচিন্তা চলছিল। কোচবিহারের ঘটনা প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিয়ে সবাইকে তৎপর করে তুলল তাৎক্ষণিকভাবেই।

পার্টির সঙ্গে যুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মী ও নেতা, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শান্তি আন্দোলনের নেতারা অনতিবিলম্বে একটা সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আর দেরি নয়। রবীন্দ্রনাথকে অভিজাত সরণি থেকে জনতার রাস্তায় নিয়ে আসতে হবে এবং সকলের বোধগম্য করে তুলতে হবে। অন্যকথায়, মানুষের মনে এবং প্রাণে তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সেদিনের সেই প্রতিজ্ঞা থেকেই জন্ম নেয় 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী' উপলক্ষে আয়োজিত 'রবীন্দ্র শান্তিমেলা'। মেলার স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানকে। ১৯৬১ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত দশদিন ধরে সেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে মেলার আয়োজন কেন?

কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে মেলার কথাটিও বলতেন। শৈশব-কৈশোরের হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রজীবনের নানাপর্বে মেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মেলা মানে নিছক হইচই নয়, তাঁর দৃষ্টিতে মেলা

মানেই মিলনমেলা যা মানুষে মানুষে মিলনের একটা বিশেষ স্থান। এজন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহু মেলার সংগঠক বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এদিক থেকে দেখলে তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনও একুনে অনেকগুলো মেলার মালা দিয়েই গাঁথা।

শতবর্ষে এই বিশ্বপথিককে স্মরণ করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা তাই অনেক চিন্তাভাবনার পর একটা আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-শান্তিমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এটা নিছক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব ছিল না। শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ঘটানো হয়েছিল ব্যাপকভিত্তিক এক সাংস্কৃতিক মহাসমাবেশ। প্রথমত, এই সমাবেশ শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় ছিল না। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকে জ্ঞানী-গুণীজনেরা এসেছিলেন। এসেছিলেন শিল্পের নানা শাখার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও। দ্বিতীয়ত, শান্তি মেলাটিতে অংশগ্রহণ করেছিল বহির্বিশ্বের বহু বন্ধুপ্রতিম দেশ যেমন– সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, কিউবা ইত্যাদি। বিশ্বের বহুদেশের লেখক-শিল্পীরাও পণ্ডিত নেহরুর ভারতে এসে এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন সানন্দে। বস্তুত **১৯৬১** সালের শান্তিমেলাই ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আয়োজিত প্রথম গণতান্ত্রিক, সর্বভারতীয় এবং ভূমণ্ডলীয় সমাবেশ।

মেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং আলোচনায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জে.বি.এস হলডেনের মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সংগীতের জীবন্ত কিংবদন্তি, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো মনীষী, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত সুরকার বালাশান্তনয়ান এবং কিউবার বিশ্ববিখ্যাত ব্যালে-নর্তকী এ. এলিসিয়া এলোঞ্চোর মতো শিল্পী, বাংলাভাষা ও সাহিত্যগবেষক ভেরা নোভিকোভা ও দুশান জাবোভিতেল সহ দেশ-বিদেশের আরও বহু স্বনামখ্যাত বিদ্বজ্জন।

সেই রবীন্দ্রশান্তিমেলার উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবী। রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে স্মরণ করার আন্তরিক প্রয়াসকে তিনি অন্তরের অন্তস্তল থেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে বাবার মনের মতো কাজ করছেন উদ্যোক্তারা, তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে এই মেলার।

মনে রাখতে হবে যে, কমিউনিস্টদের যাঁরা সর্বদাই 'রবীন্দ্রবিরোধী' আখ্যা দিয়ে কুৎসা রটাতে বেজায় ভালোবাসেন তাঁরা নন, বহুনিন্দিত বামগোষ্ঠীগুলোই ছিল এই রবীন্দ্রমহোৎসবের মূলশক্তি। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদল সিপিএম-এর অনেক প্রবীণ নেতাই সেদিন ছাত্রনেতা হিসেবে সেই আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-শান্তিমেলার সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাই তাঁরা কথায় এবং লেখায় এখনো বলে থাকেন রবীন্দ্রনাথকে 'ওরা' কেবল যক্ষপুরীতে বন্দি করে রাখতে ভালোবাসে। 'আমরা'ই সেদিন ওদের কুক্ষিগত রবীন্দ্রনাথকে মুক্ত করে মহামিলনমেলাতে মানুষের মাঝে নিয়ে এসেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যদি শতায়ু হতেন তবে তিনি বোধহয় সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন তাঁর জন্মশতবর্ষের

সেই শান্তিমেলাটি দেখেই। এবং কন্যা মীরার মতো আয়োজকদের আশীর্বাদ করতেন তিনিও।

যদিও *আনন্দবাজার* পত্রিকা সেদিন এই অনুষ্ঠান বর্জন করেছিল (যেমন পরবর্তীকালে বর্জন করেছিল উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটক) তবুও কমিউনিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানটি ছিল সর্বাংশে সার্থক। প্রতিদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার মানুষ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকতেন। মেলার শেষদিনে এসেছিলেন লক্ষাধিক মানুষ। তখন অনুষ্ঠান শেষে বিশেষ বাসের কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তবু দূরদূরান্ত থেকে, এমনকি মফস্বলের জেলাগুলি থেকেও, প্রতিদিন বহু মানুষ আসতেন রবীন্দ্রনাথের টানে এবং তাঁকে নিয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানটির আকর্ষণে। সে ছিল এক বিরাট উদ্দীপক ঘটনা, বিশাল এক রবীন্দ্রমহোৎসব।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত ব্যাপক এবং বহুমুখি আয়োজন এর আগে আর কখনও হয়নি। পরেও হয়েছে কী? প্রবীণ মানুষজনের স্মৃতি থেকে এই বিশাল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারটি এখনো সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়নি। তার কারণ, পড়ে-জানা ছাড়াও শুনে-জানার মতো সেই মেলার কর্মীদের মধ্যে অনেকেই বেঁচে আছেন এখনো। মূলমঞ্চ ছাড়াও চারটি পৃথক মঞ্চে দশদিন ধরে মনোজ্ঞ আলোচনা, নাটক, সংগীত, নৃত্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে সারা বাংলার হৃদয়তন্ত্রীতে যেন কবি রচিত গানের ভাষায় 'নবীন মেঘের সুর' লাগিয়ে দিয়েছিল। এ ছিল যেন তিরিশ বছর আগের সে-যাবৎকালের বিশালতম রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মবার্ষিকীর বিপুলভাবে পরিবর্ধিত ও বিশ্বায়িত রূপ।

রবীন্দ্রপূজা বা রবীন্দ্রব্যবসা নয়, সে ছিল বাঙালির প্রাণের মেলা, চেতনার আয়ুধ। বাঙালির আঁধার রাতের ধ্রুবতারা রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বিশ্বসংস্কৃতির সেই মিলন-উৎসবে সামিল হয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, কলিম শরাফী, শম্ভু মিত্র, সুচিত্রা মিত্র, উৎপল দত্ত, নির্মলেন্দু চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলাসহ সমগ্র উপমহাদেশ এবং বিশ্বের বহুদেশের সেরা শিল্পীরা।

তদানীন্তন চেকোস্লোভাকিয়ার বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীরা রাত এগারোটায় দমদম বিমানবন্দর থেকে সোজা পার্কসার্কাস ময়দানে উপস্থিত হয়ে একমুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে উঠে পড়েন অনুষ্ঠান-মঞ্চে। তারপর দু'ঘণ্টা ধরে তাঁদের অনুপম সুরের মায়াজালে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখেন। অত রাতেও মাইকে একবারও ঘোষণা করতে হয়নি যে আপনারা কেউ চলে যাবেন না। মানুষ সাগ্রহে শুনেছেন সেই অপরূপ সুরসৃষ্টি।

কিউবার বিশ্ববিখ্যাত ব্যালে নর্তকী যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মঞ্চসমূহে নাচতে অভ্যস্ত, তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এই ময়দানের অতিসাধারণ মঞ্চে বিপুল শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেও তাঁর অনুপম নৃত্যকৌশল দেখালেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় বাংলার ও বাঙালির গৌরব অতিশয় বৃদ্ধ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ অনেক কষ্টে মঞ্চে উঠে

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত রাগসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্বকবির প্রতি তাঁর অন্তরনিঃসৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আরেক দিকপাল ধ্রুপদীয়া বিষ্ণুপুর ঘরানার গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ইনভ্যালিড চেয়ারে মঞ্চে ওঠেন এবং সেই চেয়ারে বসে এমন গান শোনান– প্রত্যক্ষ শ্রোতাদের বলতে শোনা যায়– যা পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানেও তাঁদের মনের মণিকোঠায় আজ অবধি অক্ষুণ্ন আছে।

দেশবিদেশের এইসব খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের পাশে বাংলার আদিবাসী ও লোকশিল্পীদল এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের মজুর শিল্পীরাও সমান মর্যাদায় তাঁদের সাংস্কৃতিক নৈপুণ্যের পসরা তুলে ধরেছেন। এমন সার্বজনীন রবীন্দ্রসম্মিলন ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথও সারাজীবন ধরে এমনটাই চাইতেন এমন বিশ্বমানবতার মহামিলনই ছিল তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত। এসব শুনে আমার মন বলে আহা বিশ্বকবি যদি নিজে দেখতেন এই বৈশ্বিক রবীন্দ্র-মেলাটা! শতবর্ষী তো তখনো অনেক বাঙালিই হতেন।

তিনদিনব্যাপী কবিসম্মেলন ছিল রবীন্দ্রশান্তিমেলার অন্যতম আকর্ষণ। কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক থেকে শুরু করে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ এবং নবীন শতাধিক কবি মেলায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। উত্তরপ্রদেশের সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোককবি রামখেরের কবিতা, ভারতের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং বিদেশিদের কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি এই কবি সম্মেলনটির সত্যকার এক ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল চরিত্র সৃষ্টি করেছিল। উর্দু কবিরা সারারাত্রি ব্যাপী মুশায়েরার আয়োজন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সাহির লুধিয়ানভি, কাইফি আজমি, ফিরাখ গোরখপুরী প্রমুখ উপমহাদেশখ্যাত প্রগতিবাদী বলয়ের কবিগণও ছিলেন। দর্শকদের চমকে দিয়েছিল তরুণ কবিদের কবিতা গ্রন্থের এক প্রদর্শনীও। গণনাট্য আন্দোলন এবং তৎপরবর্তী নাট্য আন্দোলন নিয়েও এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সেই শান্তিমেলায়।

এছাড়া সেই মেলার সঙ্গে আয়োজিত হয়েছিল এক চমৎকার প্রদর্শনী-অঙ্গন। এই এগজিবিশন-প্যান্ডেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, উত্তর ভিয়েতনাম, পূর্বজার্মানি ও চেকোস্লোভাকিয়া সরকার, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীসংঘ এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তথ্যবহুল এবং শিল্পসৌন্দর্যে অনুপম এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। সংগীতপ্রতীক মিয়া তানসেনের নিজের ব্যবহার করা তানপুরাটি সহ উচ্চাঙ্গসংগীত বিষয়ক প্রদর্শনীটিও ছিল মেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ। এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিত্রকরদের বিশিষ্ট চিত্রাবলির মূল কপিসমূহ।

রবীন্দ্রনাথের জার্মানি ভ্রমণের সময়ে সেখানে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ক্যাথে কোলভিৎজ। শতবার্ষিকী মেলাতে সেই ক্যাথে কোলভিৎজের গ্রাফিক আর্টসের প্রদর্শনীও বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এছাড়া চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিল। *ক্যানাল, বাইসিকেল থিফ, ব্যাটেলশিপ*

*পটেমকিন*, চ্যাপলিনের কালজয়ী ছবি, রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এবং তলস্তয়ের জীবনচিত্রসহ বিভিন্ন দেশের দুর্লভ চলচ্চিত্র দেখার ব্যবস্থা ছিল প্রদর্শনীতে।

সেই দশদিনের রবীন্দ্রমেলাতে পল রোবসন আসার অনুমতি পাননি। তবু বিশেষভাবে প্রেরিত তাঁর গান এবং থর্নডাইকের আবৃত্তি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছিল। রুশ অনুবাদে এবং রুশদেরই কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত, ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাটক ও সংগীত, নানা প্রাদেশিক অনুষ্ঠান, ছায়ানাট্য, নাটক, যাত্রা, বিবিধ অনুষ্ঠান কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবেন তা ঠিক করতে দর্শক-শ্রোতাদের হিমসিম খেতে হয়েছে। কেউই সবক'টা অনুষ্ঠান দেখতে পারেননি। কারণ দেখা সম্ভবই ছিল না। শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, সেই সময়কার সচেতন মানুষজন কী গভীর গুরুত্ব দিয়ে এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না প্রতিদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় জনগণের বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতি দেখে।

শেষদিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় 'জনশিক্ষা সম্মেলন'। রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এইসব সভায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত চিন্তানায়কগণ। শ্রোতাদের বসার জায়গা দেওয়া যায়নি। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁরা এইসব গুণীজনের বক্তব্য শুনেছিলেন। মেলা-কমিটির পক্ষ থেকে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল– In Homage to Tagore এবং Tagore and Man।

প্রথম সংকলনটিতে বিশ্বকবি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নাল, নোবেলজয়ী আইসল্যান্ডের লেখক হ্যালডর ল্যাক্সনেস, জার্মানির ভারততত্ত্ববিদ ওয়াল্টার রুবেন্স, চেকোস্লোভাকিয়ার বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ভারতপ্রেমী দুশান জাবোভিতেল, আমেরিকার প্রবীণ নিগ্রো-ইতিহাসবিদ, ড. দুব্যোয়া, চিনের বিখ্যাত নট এবং অপেরা-পরিচালক মেই লান ফেঙ, বিশ্বনারী সম্মেলনের সভানেত্রী মাদাম কোঁত, ক্যান্টারবেরির ডিন হিউলেট জনসন প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীগণ।

দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছিল মানুষ এবং মানবপ্রেম তথা মানবহিতৈষণা সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ের নানা বক্তব্য। কবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা সংস্থা 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী' বরণীয় সাহিত্যিক গোপাল হালদারের সম্পাদনায় একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছিল। এতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, চিত্রকল্প ও প্রতীক, ছোটগল্প, ছবি ও নাটক সম্পর্কে লিখেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, হিরণকুমার সান্যাল।

'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ', 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা', 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' এবং 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' বিষয়ে লিখেছিলেন সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ। এটা সুবিদিত যে এইসব বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীগণ সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে

গভীরভাবে যুক্ত। এই সংকলনটির জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি বিশেষভাবে এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পাচার্য যামিনী রায়। সুখের কথা, এই মূল্যবান সংকলনটির পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সময় অনন্যসাধারণ বক্তা এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন একটি অসামান্য গ্রন্থ– 'Himself a true poem'। বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। অথচ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞগণের মতে সব রবীন্দ্রপ্রেমীরই এই বইটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। কোনো মননশীল প্রকাশক বইটি পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারে এগিয়ে এলে একটি অপরিহার্য কর্তব্য পালন করা হবে। চলতি সার্ধশতবার্ষিকীর মধ্যেই কার্যটি সম্পন্ন করা গেলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে যথাসময়ে একটা অমূল্য সম্পদ যোগ হত।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে আয়োজিত রবীন্দ্র-শান্তিমেলা এখনো পর্যন্ত আয়োজিত সর্ববৃহৎ রবীন্দ্র স্মরণোৎসব। মূলত বামপন্থীদের দ্বারা আয়োজিত হলেও সব রকমের সংকীর্ণতা পরিহার করে এই মেলা হয়ে উঠেছিল সকল দলের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক সমাবেশ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে বামবলয়ই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে পূজার বেদির বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে 'মুখরিত জনতার সখ্যে' নিয়ে এসে যথা পরিচয়ে এবং যথা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে সর্বশ্রেণীর দেশবাসী এবং বিশেষ শ্রেণির বিশ্ববাসীদের দেখায়।

সমাজের উচ্চ আসনে আবদ্ধ এবং 'সম্মানের চির নির্বাসনে' দণ্ডিত নিষ্প্রাণ রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম পেলেন ব্রাত্য আর অন্ত্যজের প্রাণস্পর্শ– যা ছিল তাঁর কাম্য। জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সর্বত্রগামী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে প্রগতিবাদীদের বিরুদ্ধে বহুকাল ধরে যে বিদ্বেষাভিযান চলেছিল, এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য তাকে শুধু রুখেই দিল না রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মূল্যায়নের উৎসমুখও খুলে দিল। বাংলার সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক জীবনচর্যায় রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের সেই শান্তিমেলার এ এক অনন্য সাফল্য।

মূলত বামপন্থীদের উদ্যোগে প্রকৃত রবীন্দ্রচর্চার এই যে উৎস-মুখটি খুলে গেল, তার ফসল তুলতে কিন্তু বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে বঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্ব-নিযুক্ত অভিভাবক *আনন্দবাজার-দেশ* গোষ্ঠী পর্যন্ত কেউই বাদ গেল না। পার্কসার্কাস রবীন্দ্রমেলা বঙ্গীয় জীবনে যে তুমুল তোলপাড় তুলেছিল তা ছড়িয়ে গেল সবখানে। রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে জানার আগ্রহ এবং সত্যকার রবীন্দ্রচর্চা এতটাই প্রসারিত হল যে ১৯৪১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত কুড়িটি বছর যাঁরা একরকম চুপচাপই ছিলেন সেইসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশকও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

১৯৬১-পরবর্তী গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক বিপণিত রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড সংখ্যা এবং বিভিন্ন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি ও নানাবিধ রচনার সুবিশাল তালিকা দেখলেই এটা প্রমাণিত হবে। রবির কিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন অনেক লেখক এবং সাহিত্যিক। কিছু সুযোগসন্ধানী সাংবাদিকও এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সাহিত্যিক তকমাধারী হয়ে বাংলার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শাসনদণ্ডটি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। প্রগতিবাদীদের তৈরি করা ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে এঁরাই হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রসংস্কৃতির নব্য-সামন্ত।

*আনন্দবাজার* গোষ্ঠী পোষিত এই নব্য-জমিদারেরাই রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকারের আঙিনায় আবদ্ধ রাখার হারানো ভূমিকাটি পুনরুদ্ধার করার নতুন কৌশল খুঁজতে খুঁজতে 'আমরা'-'ওরা'র বিভাজন সৃষ্টি করলেন। নতুন যুগে কালের যাত্রার রথের রশিটা যে তথাকথিত অন্ত্যজদের হাতেই থাকে সেই সহজ সত্যটিকে ভুলিয়ে দেবার জন্য এঁরা শুরু করলেন নতুন কুৎসা প্রচার।

কী? কমিউনিস্টরা তো রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া কবি' বলেছিল, ওদের বিদ্যে তো 'রাশিয়ার চিঠি' এবং 'ওরা কাজ করে'-র মতো কয়েকটি কবিতাতেই সীমাবদ্ধ। ছোটলোক-খেপানো কমিউনিস্টদের কী অধিকার আছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মাতামাতি করার? আমরা যতদূর জানি, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কোনো দলিল-দস্তাবেজে বা মূল্যায়নধর্মী কোনো পার্টি-ডকুমেন্টে রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি আখ্যায়িত করা হয়নি। কারণ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এদেশের কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কই ছিল। আর, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও তিনি উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করেছিলেন মানবসভ্যতার শত্রু হিটলারের ফ্যাসিস্টবাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের সংবাদ শোনার জন্য। এসব কথা সবারই জানা।

প্রকৃত তথ্য হল বিশ শতকের চল্লিশের দশকের একেবারে শেষদিকে কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন 'রবীন্দ্রগুপ্ত' ছদ্মনামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রান্ত মূল্যায়ন করে একটি লেখা লিখেছিলেন। এটি একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। পার্টি তাঁর ওই মূল্যায়নের সঙ্গে কোনোসময়েই একমত ছিল না। বরং এই মূল্যায়নের প্রবল প্রতিবাদ প্রথম ওঠে পার্টির ভিতর থেকেই। অচিরেই ভবানীবাবু তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং তা সংশোধন করে লেখেন চারটি সারবান প্রবন্ধ। তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এই মূল্যবান প্রবন্ধগুলোই তার সাক্ষ্য দেবে। তবু মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজে এই মহামিথ্যাটিকে গরজের ফকিরগণ আজও ব্যবহার করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মূল্যায়নের উৎসমুখ উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করার মতো ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে তাঁকে সর্বত্রগামী করে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার থেকেই জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রমেলার আয়োজন করেছিল বামদলসমূহ। আর এটাই ছিল *আনন্দবাজার* পত্রিকার আপত্তির সবচেয়ে বড়ো কারণ।

সাধারণ মানুষের ছোঁয়ায় রবীন্দ্রনাথ 'অপবিত্র' হয়ে যাবেন, রবীন্দ্রনাথের ওপর শেষকথা বলার একমাত্র অধিকারী *আনন্দবাজার*গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্যে 'ওরা' ওই ছোটলোকের দোসররা নাক গলাবে এটা 'আমরা' বড়লোকের দল মেনে নিই কী করে?

অতএব বিরোধিতা শুধু নয়, করতে হবে সার্বিক বিরোধিতাই। তাই তারা সম্পূর্ণভাবে বয়কট করল– সারাদেশের মধ্যে সর্বকালের সর্ববৃহৎ এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী-কেন্দ্রিক মহোৎসবটিকে। নীচতা এবং সংকীর্ণতা এতদূর প্রসারিত হয়েছিল যে, এই মহতী রবীন্দ্রমেলা বর্জন করার জন্য কলকাতার ব্যস্ত মোড়গুলোতে কে বা কারা অতিশয় ব্যয়বহুল বিরাট বিরাট পোস্টার লাগিয়েছিল। এখনকার 'পরিবর্তন চাই' ব্যানারের পেছনের লোকজনের মুখ দেখে তবু পরিবর্তনপন্থীদের পরিষ্কার শনাক্ত করা যায়। সেদিনকার পোস্টারে কিন্তু কাউকে চেনার কোনো উপায়ই ছিল না, ছিল শুধু বেনামে যত কুৎসিত আক্রমণ।

কারা সেদিন এর জন্য অর্থ এবং সামর্থ্য জুগিয়েছিলেন সে-ধাঁধাটির উত্তর আজ অবধি জানা যায়নি। তবে ওয়াকিফহাল মহলের মতে উত্তরটি একমাত্র *আনন্দবাজার*গোষ্ঠীই জানে। মেলাটিকে বানচাল করার জন্য বৃহৎ পুঁজিপোষিত একদঙ্গল লেখককেও বাজারে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাঁরা অনৃতভাষণ ও বিবৃতিবাজির মাধ্যমে রবীন্দ্র-অনুরাগী মানুষজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। নেপথ্যকর্তাদের চটাবার মতো মেরুদণ্ড সেদিন অনেকেরই ছিল না।

এঁরাই চক্রান্ত করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে নয়, বাংলার বদনাম রটানোর উদ্দেশ্যেই কমিউনিস্টরা বিদেশ থেকে অতিথিদের ডেকে আনছে। এদের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করা উচিত হবে না। প্রথমে ডা. রায় এদের কথায় প্রভাবিত হলেও পরে তিনি খানিকটা উদার অবস্থান নিয়েছিলেন এবং বিচক্ষণ প্রশাসকের মতোই সহযোগিতা করেছিলেন। এত হীন চেষ্টা সত্ত্বেও পার্কসার্কাস ময়দানে আয়োজিত রবীন্দ্র-শান্তিমেলা ভণ্ডুল করা যায়নি। বরং সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণস্পর্শে সেই মেলা আগাগোড়াই সর্বাংশে সার্থক হতে পেরেছিল।

রবীন্দ্র-শান্তিমেলার সমাপ্তি অধিবেশন থেকে সারা বিশ্বের লেখক, শিল্পী ও জনগণের প্রতি সহজ সরল ভাষায় যে-আবেদন জানানো হয়েছিল তা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানে নিম্নে উদ্ধৃত হল :'যিনি সর্বদেশের মানুষের মহান বন্ধু, স্বাধীনতা ও বিশ্বমৈত্রীর অগ্রপথিক– সেই মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের স্বদেশবাসী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্য আমরা, ভারতবর্ষের লেখক শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা, আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর শান্তি-উৎসব রবীন্দ্রমেলায় সমবেত হয়েছি। যে মানুষ নিজের জোরে ও বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করেছেন, হৃদয় দিয়ে সৃষ্টির মাধ্যমে যে মানুষ মর্মজগৎ-কে মুগ্ধ করেছেন, সকল মহাদেশপরিব্যাপ্ত সেই মানুষের কণ্ঠস্বর তাঁর রচনায়

প্রতিধ্বনিত। মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারাননি কোনোদিন। তাঁর সেই বিশ্বাসে উদ্দীপিত আমরা এখানে সমবেত হয়ে সমস্ত মানুষের উদ্দেশেই জানাই আমাদের অভিনন্দন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত দেশের জনগণ, আমরা আপনাদেরই অংশ, আপনারা আমাদের। আপনারাই আমাদের প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনার মহান উৎস।

আজ থেকে একশো বছর পূর্বে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই শহরে সমবেত হয়ে আমরা আপনাদের– সকল দেশের লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণকে অভিবাদন করি! সৃষ্টি ও মানবপ্রকৃতির পথে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসেবে আপনাদের জানাই অভিনন্দন। শিল্প ও বিজ্ঞানের সহকর্মীগণ, আসুন আমরা শান্তি ও স্বাধীনতার ব্রতে নতুন করে আমাদের নিয়োজিত করি! কবির কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি– শান্তি এবং স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই শিল্প পায় কৈবল্য আর মানুষের ঐতিহ্য হয় নিরাপদ। আমরা ঘোষণা করি মানব উত্তরাধিকারের এই সংগ্রাম, মানবিক আদর্শপূর্তির এই যুদ্ধ– এই যুদ্ধই আমাদের যুদ্ধ, আমাদের একমাত্র যুদ্ধ, এই যুদ্ধই বরণীয় যুদ্ধ।

আফ্রিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং জনগণের উদ্দেশ্যে– 'ছায়াবৃতা' মহাদেশের বন্ধু, আপনাদের আমরা এই নগরী থেকে আমাদের মৈত্রীপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আফ্রিকার বন্ধুগণ, আধুনিক যুগের আলোর পথযাত্রী আপনাদের অভ্যুত্থানে আমরা উল্লসিত। ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে মুক্তিসংগ্রামে আপনারা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি নতুন পৃথিবী রচনায় আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব, অপেক্ষা করে আছি আপনাদের জন্যে, সভ্যজগতে যে আনন্দ উন্মাদনা এবং যৌবনোচ্ছল সজীবতা আপনারা এনে দেবেন, তার জন্যে। আপনাদের স্বচ্ছন্দ মহৎ অবদান ছাড়া এই সভ্যতা খণ্ডিত।

এশিয়ার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আপনাদের অভিনন্দিত করি এশিয়ার মহান দূত রবীন্দ্রনাথের নামে। আপনাদের শিল্পের ঐতিহ্য সভ্যতার বিকাশকে পরিপুষ্ট করেছে। আপনাদের রয়েছে মর্মলোকবিজয়ী ইতিহাস। আসুন, মানুষ এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে আমরা আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনি, মানুষ এবং তার ভবিষ্যতে রাখি আনত আস্থা। আসুন, সেই ভবিষ্যৎ আমরা নির্মাণ করি যা অতীতের এশিয়ার মতো মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর।

লাতিন আমেরিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আপনাদের ভাগ্য নতুন করে রচনা করার লগ্ন সমাসন্ন। আপনাদের স্বাধীনতা ও জাগতিক নতুন পৃথিবী নতুন নিয়তির জন্মদান করবে, নতুনতর মানবেতিহাসের সম্ভাবনাকে করবে সুনিশ্চিত। সেই সঙ্গে আপনাদের এই ইতিহাস রচনার আনন্দ, গৌরব ও মহান দায়িত্বভার আমরাও গ্রহণ করছি।

ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ– আধুনিক ইতিহাস এবং মুক্তি ও সাম্য, মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার বার্তাবহ আধুনিক মানবতাবাদের জয়পতাকা উত্তোলনের গৌরব আপনাদের রয়েছে। এই শক্তি নিয়ে আপনারা পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলির সঙ্গে আরও এগিয়ে চলুন, এই আবেদন করি। আমাদের মহান রবীন্দ্রনাথের প্রিয় স্বপ্ন তাহলেই সার্থক হবে।

সর্বোপরি পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবী, কর্মী এবং জনগণ, আপনাদের প্রতি আবার আমাদের আবেদন এই, যে-ধ্রুবমন্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু শরণ্য, সেই মন্ত্রই হোক আমাদের পথের দিশারী। আসুন, মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের গুরুদেবের এই মানসিকতায় প্রণোদিত হয়ে আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিবাহী বর্তমানের জন্য, শিল্পীর ব্রত পালনের জন্য এবং যুদ্ধহীন মুক্ত শান্তির পৃথিবীর জন্য আত্মনিয়োগ করি।' (অনির্বাণ সেনগুপ্ত, সৃষ্টির একুশ শতক, উৎসব সংখ্যা ১৪১৭, পৃ. ৪-৮)।

বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবার্ষিকী বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সমারোহে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। শুধু উপমহাদেশে নয়, বহির্বিশ্বেও নানাস্থানে এই উপলক্ষে নানামুখি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই মহামনীষীর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানাতে Unesco থেকেও বর্ষব্যাপী বহুবিধ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। গতানুগতিকতার স্রোতে ভেসে না-গিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার মানুষজন এবারেও একটু স্বতন্ত্রভাবে ভিন্নধারার কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রচর্চার সহস্রাধারায় জনমানসকে উজ্জীবিত এবং উদ্দীপিত করে তুলতে পারেন।

কবির দেড়শততম জন্মবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে ব্যাপকতম সাংস্কৃতিক সমাবেশের মাধ্যমে বর্তমানের নানাবিধ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বামবলয়ের সকলে মিলে আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন। সব রকমের কোন্দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে এই ধরনের সাংস্কৃতিক সমাবেশ সুষ্ঠুভাবে করা গেলে সেটাই হবে আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। অন্যকথায়, রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত পার্কসার্কাসের সেই রবীন্দ্রমেলার ভেলাটিকে এনে রবীন্দ্র-জন্মসার্ধশতবার্ষিকীর এই অঙ্গনে ভেড়ানো গেলে রচিত হবে এক তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ-সেতু এবং সৃষ্টি হবে এক অমূল্য পরম্পরা।

প্রসঙ্গক্রমে পঁচিশ বছর আগের, ১৯৮৬ সালের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। সেবার রবীন্দ্রজন্মের ১২৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন যথাযোগ্য মর্যাদায় কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে কলকাতা মহানগরের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর এক সমাবেশ ডাকা হয় নন্দন অডিটোরিয়ামে। উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সভাপতি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। বিদগ্ধজনেরা

একের পর এক নানা পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। সভাটিতে উপস্থিত ছিলেন মনীষী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এক পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বললেন :

'আচ্ছা, নাচ, গান, নাটকের বাইরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা কি অন্য কিছুই ভাবতে পারি না? পদ্মাবক্ষে দীর্ঘকাল বোটে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন বঙ্গনারীদের কলসী কাঁখে তৃষ্ণার জল আনার জন্য অনেক কষ্ট করে দূরবর্তী স্থানে যেতে। তাঁদের ব্যথা ও কষ্ট কবির হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে, গল্পে, কবিতায় বার বার এই তৃষ্ণার জল প্রসঙ্গটি ফিরে এসেছে। আচ্ছা এঁদের জন্য কিছু করা যায় না?'

একথা বলার পর হীরেন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের আকারে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক যে, বাংলার সকল গ্রামে পরিশ্রুত পানীয় জলের অন্তত একটি উৎস থাকবে যাতে করে গ্রামের মা-বোনেদের শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা মাথায় করে দূরবর্তী স্থানে 'তৃষ্ণার জল' আনতে যেতে না-হয়। সেদিন সকলেই তাঁকে সাধুবাদ জানালেও আজও তাঁর সে প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়নি। তাই আমাদের মনে হয়, এই সার্ধশতজন্মবর্ষে সেই মহতী প্রস্তাব সর্বান্তকরণে রূপায়ণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা গেলে কবির প্রতি যথা অর্থে সারবান শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করা হবে। তাঁর আজীবন অন্তরলগ্ন একটা ইচ্ছাও পূরণ করা হবে।

আমরা জানি যে অ্যাপোলোর নবমিউজের অন্যতম, ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্লিও– হাঁকডাক, জাঁকজমক, আড়ম্বর, সমারোহ, ঘটনার ঘনঘটা বড় বেশিই ভালোবাসেন। তবু রবীন্দ্রনাথ থেকেই ধার করে বলি যে, জগতের সুন্দর সৃষ্টিগুলো কিন্তু নিঃশব্দেই ঘটে থাকে। পটকা সশব্দে ফাটে, ফুল ফোটে বিনা আওয়াজে। অমন যে চন্দ্র-সূর্য তা-ও কিন্তু কোনোরকম শব্দ না-করেই তাদের রশ্মিতে দিকদিগন্ত প্লাবিত করে। তাই চলমান এই সার্ধশতবার্ষিকীতে অনেক কোলাহল, অনেক আড়ম্বরের বাইরে নিভৃতে নীরবে এমন কিছু প্রকৃত কল্যাণকর কাজ হোক যা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হতে সাহায্য করবে। কেননা আমাদের জীবনে এবং ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ তো একজনই।

* 'ঐকতান'-নামক কবিতাটি থেকে আংশিক উদ্ধৃতি :

'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক–
রয়ে গেছে ফাঁক।...
সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়

অন্তর মেশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল–
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি ’পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।...

সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়–
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি–
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

# মেঘের আগুন

নু রু ন  না হা র  খা ন

মাঝে মাঝে নীলাকাশে বিজলি চমকায়। মেঘের সাথে মেঘের ঘর্ষণে সোনালি লেজের মতো লম্বাটে এক একটি দ্যুতি চমকে উঠে ঘুটঘুটে আঁধারের প্রান্ত চিরে জ্বলজ্বল দাঁত বের করে হেসে দড়াম করে ছলকে পড়ে কোথাও। তারপর আবারো ঘন অন্ধকারে ঢেকে যায় প্রান্ত। গড়গড় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে হামাগুড়ি পায়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে সামনে-পিছনে পথ খোঁজে। খানিকটা এগিয়ে আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। ঝরঝর করে জল ঝরিয়ে চলে একটানা। কিছু পাতা শাঁ-শাঁ করে উড়ে যায় দ্রুতবেগে। মড় মড় শব্দ করে ভেঙে পড়ে ডাল-পালা। কিছু অস্থায়ী আবাস থেকে দু'এক খানা টিন-খুঁটি দুমড়ে মুচড়ে উড়ে গিয়ে এপাশে-ওপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কলেমা ও দোয়া ইউনুসের শব্দ মাঝে মাঝে কর্ণকুহরে ভেসে আসছে, ভেসে আসছে সূরা ইয়াসীনের আয়াত, উদ্বিগ্ন সবাই। বুকের মধ্যে ত্রাসের ধুকপুকানি। গামছা ও দড়ি দিয়ে আটনরুয়া কষে বাঁধতে ব্যতিব্যস্ত বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা। এই মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থেকে আশ্রয়টুকু রক্ষা করাই তাদের একমাত্র কাজ। এ কাজে বাড়ির স্ত্রী-ছেলেরাও তাদের সাহায্য করছে।

ঘরের কোণের কলার ঝাড়ে ফলাসন্ন হরিণফালী আনাজি কলার গাছটিতে বাঁশের পেলা দিতে উঠানে নেমে যায় জমির। জমিরের বৌ বর্ষা তাকে মানা করলেও শোনে না জমির। লাঙ্গলের ফলার মতো একখানা বস্তর বৈদ্যুতিক 'শক্' লাগে জমিরের শরীরে। আকাশ ভেদ করে পাতাল ফাটিয়ে বিকট শব্দে বর্ষার দুটো কান তখন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। আলারে আলা! বলতে বলতে ফর্সা হাতে চুড়ির শব্দ তুলে দুই কান চেপে ধরে বর্ষা। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে চুড়ির টুনটান মিষ্টি শব্দটা মিলিয়ে যায়। পৃথিবীর সামান্য কিছু জায়গা বর্ষাদের উঠানসহ আলোকিত হয়ে ওঠে। ঘোর লাগে বর্ষার চোখে। চোখ খুলতেই বর্ষার চোখের সে আলো ধাঁ ধাঁ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। আবার অন্ধকারে ভরে যায় পৃথিবী। এ অন্ধকার আর কাটে না বর্ষার পৃথিবী থেকেও ...।

জমিরের দেহখানা একেবারে ঝোপের পাশেই পড়ে আছে। বর্ষা কি তার কোনো আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল? মনে আছে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে উঠানে গিয়ে অনেকবার ডেকেছিল বর্ষা, এই যে! আপনে কোহানে গ্যালেন? ঘরে আসেন না ক্যান? কী হল আপনার? কতা কন-না ক্যান?

কোনো সাড়াশব্দ না-পেয়ে আঁধার ঠেলে যখন উঠানের কোণে এসে কলার ঝোপের পাশেই জমিরের সন্ধান মিলল, আকাশের জলধারা তখন কিছুটা কমে এসেছে। বাতাস ধরে এসেছে। গুড়ুম গুড়ুম শব্দের প্রচণ্ডতাও নেই। কেবল মেঘের কোল ঘেঁষে সাপের মতো লম্বা লেজবিশিষ্ট বিজলি চমকিত হয়ে আকাশে দ্যুতি ছড়িয়ে নিমিষেই মিলিয়ে যাচ্ছে লুকোচুরি খেলার মতো। সেই আলোতেই ভাঙা ডাল-পালার মধ্যে জমিরুদ্দিনের ওপর বর্ষার দৃষ্টি পড়ে। দানবীয় বিকট শব্দটি আরো একবার প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় বর্ষার বুকে। আলারে..... গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে নিস্তেজ হয়ে যায় বর্ষা। প্রলয়তাণ্ডবে ক্লান্ত বর্ষণমুখর নীলাকাশটি তখন উদারভাবে বর্ষার শরীরটাকে ভিজিয়ে দিতে কার্পণ্য করে না। প্রকৃতির সব নাটকীয়তা থেমে গেলে পাশের ঘর থেকে চাচাশ্বশুর নাজেম ও তার স্ত্রী এসে বর্ষা ও জমিরকে আবিষ্কার করে। নিস্তব্ধ জমির ও অচেতন বর্ষাকে পাঁজাকোলা করে ঘরে তুলে আনে নাজেম। দাঁত লেগেছিল বর্ষার। মুখের মধ্যে চামচের ডাঁট ঢুকিয়ে দাঁত খুলে কাপড় বদলে দেয় বর্ষার চাচিশাশুড়ি। বয়সের সামান্য ছাপ পড়েছে নাজেমের চোখে-মুখে তবুও অসাধারণ পৌরুষদীপ্ত নাজেম। বর্ষার জন্য ডাক্তার ডাকতে যায় সে। তার স্ত্রীর বিলাপ আর চিৎকার-চেঁচামেচিতে আরো দু'একজন ছুটে আসে। অন্য সবাই তখন বিধ্বস্ত সবকিছু ঠিক-ঠাকে ও খোঁজ-খবরে ব্যস্ত। চেতনা ফিরে এলে ভীষণ ক্লান্ত লাগে বর্ষার। শরীরে তখন শীত শীত কাঁপুনি। বরফঠাণ্ডা শরীরে আগুনের উত্তাপ আর প্রলাপ বেড়েই চলল বর্ষার। সবাই তখন জমিরের লাশ নিয়ে ব্যস্ত।

বর্ষাকে নিয়ে যমে-মানুষের টানাটানি চলল কয়েকদিন। একজন গ্রাম্যডাক্তার, নাজেম চাচা ও চাচির অক্লান্ত সেবায় সেবার টাইফয়েডের বিভীষিকা থেকে রক্ষা পেল বর্ষা। জমিরের দেহটার উপর তখন মাটির ঢিবি। সিথানের কাছে পাতাবাহার গাছে নতুন ডাল-পালা বেরোচ্ছে।

একদিন অভিমান করে চাচি বলল : অভাগী! জমিররেতো খাইছিস, প্যাটেতো ছাও-পোনারও আলামত নাই। কী নিয়া থাকপি এই ভিটায়? সময় থাকতি বাপের বাড়ি চইলা যা। তারা যেডা ভালো বোঝে কইরবেনে। বুড়ো বাপটা চিন্তার মধ্যি আছে। কয়বার তোরে নিতি আসলো; গেলি না। এবার আসলি আর ফিরাইস না। জলন্ত আগুন কি বাইন্ধা রাহা যায়? এই ইঙ্গিত বোঝে বর্ষা। কিন্তু কী করবে সে? জমির জীবিত নেই এটা এখনো সে মানতে পারছে না। কী সিদ্ধান্ত নেবে বর্ষা? জোয়ান মর্দ মানুষটা হাতে একটা বাঁশ আর দড়ি নিয়ে কলাগাছটা পেলা দিতে গেল ... আর মনে

করতে চায় না বর্ষা! তারপর থেকেই এই ঘরে বর্ষা একা। সারাটা দিন একাই দাওয়ায় বসে থাকে বর্ষা। ঘর-উঠান ঝাড়ে না, পুকুর থেকে পানি আনে না, উনুনে রান্না করে না। চাচি তাকে হাতে করে একপ্লেট ভাত এনে জোর করে মুখে পুরে দেয়। দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল। উঠানের কলাগাছটায় থোড় ফুঁড়ে কলার মোচা বেরিয়েছে। বেশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে মোচাটি। কয়েকদিনের মধ্যেই দু'একটি খোল মেলে কলার ছোট ছোট কুঁড়ি বের হল। চাচিকে এত কষ্ট দিতে খারাপ লাগে বর্ষার। মনকে শক্ত করে সে। চাচিকে বলে : তুমি আমার জন্যি আর কষ্ট কইরো না চাচি, আমার ঘরে সেদ্ধ ধান আছে মোড়ায়। কাইল রোদি দেবানি, ঐ ধান ভাইন্যা ছটাক দুই চালির ভর্তা-ভাত আমি রাইন্ধা খাবার পারবানি। আমার জন্যি আর কত করবা তুমি। চাচি বলে, মা, তাই কর। কাজ কাম করলি মনটাও ভালো থাকপেনে। শরীরডাও ভালো থাকপেনে। গাদলার দিন যহন-তহন ডগ (বৃষ্টি) নামতিছে খাওইয়া। আইজ খরা রোদ আছে ধান কয়ডা বাইর হর। আইজই রোদি দিয়া দেই। কাইল আমি খল্টে (ঘরে) থাকপোনানে। অগত্যা বিনা বাক্যব্যায়ে ধামা হাতে নিয়ে মাচায় ওঠে বর্ষা। শরীরটা তার ছিড়ে পড়ছে কার্পাস তুলার মতো। চাচি বুঝতে পেরে মাচায় উঠে বর্ষার হাত থেকে ধামা টেনে নিয়ে মোড়া থেকে ধান তোলে। জিজ্ঞেস করে কয় 'পইহা' দেবো আমারে ক'দেহি। কোনো সাড়া দেয় না বর্ষা, কেবল উদাস দৃষ্টিতে চোখ মেলে দেয় প্রশস্ত উঠানে। তারপর চাচির সাথে এগিয়ে যায় উঠানে মেলে দেয়া ধানের মধ্যে হেঁকে হেঁকে পা দিয়ে উল্টে-পাল্টে মেলে দেয় ধান। কাজ করতে মন চায় না, শরীরও টানে না, কিন্তু করতেই হবে। আর কষ্ট দেবে না চাচিকে। জমিরের অনেক ক্ষেতিজমি আছে। জমির নিজেই চাষাবাদ করত সেসব জমি। বাড়ির খোলায় আর হালটে সবজি চাষ করত। চাষের মৌসুম এসে গেছে। জমিগুলো সব বর্গা দিতে হবে। এসব কখনোই বর্ষাকে ভাবতে হবে না– যতদিন চাচা বেঁচে আছে।

বর্ষার বিয়ের সময় কর্মঠ জমিরকে দেখে বর্ষার বাপ খুশি হয়ে বলেছিল, 'মা! কাম পারিলি ভাতের অভাব হয় না। জমিরের ভাতের অভাব হবে না। তুই সুখী হবি মা। সুখী হয়েছিল বর্ষা, কিন্তু সইল না তার কপালে! সেই বাজানই এখন বলে– মারে! এলা এলা এই ভিটায় ক্যাম্বায় থাকপি? আমার সাথে বাড়ি চল মা। এই কথা শুনে কোনো কথা বলে না বর্ষা। বাজান চলে যায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে। বলে যায়, তোর মনটা ঠিক কর মা, কয়দিন পরে আবার আসবো তখন কিন্তু আমি তোরে থুইয়া যাবো না। আমার কথা না ভাইবা নিজের নিজের দিক খেয়াল কইর। বলে পিতাকে বিদায় দেয় বর্ষা। বর্ষা ভাবে কিছুই কি ভাবার নেই?

জমিরের চিন্তা সারাক্ষণই আচ্ছন্ন করে রাখে বর্ষাকে। দেখতে দেখতে কলার কাঁদিটা বাতি হয়ে এল। গ্রামে কাইজা-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। জমির থাকতে বর্ষা ঘরে বসে

ব্যবসা করত, চা, চিনি, বিস্কুট, বিড়ি ও মুরগির ডিম কিনে দিত জমির। পাড়াপ্রতিবেশিরা জরুরি প্রয়োজনে সেটা কিছুটা লাভ দিয়ে বর্ষার কাছ থেকে কিনে নিত। বর্ষা আবার সেই ব্যবসা শুরু করল। জমি-জিরাত নাজেম চাচা বর্গা দিয়ে দিয়েছে–বাড়ির সামনের খোলা ও হালটের জমিতের সবজির চাষ করেছে। আবার সবকিছু ঠিকঠাক হতে চলেছে কিন্তু এসব কিছু বর্ষাকে আরো জমিরের স্মৃতি আর অতীতকে মনে করিয়ে দেয়। বর্ষার লম্বা চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে জমির বলত– বৌ হলো ঘরের লক্ষ্মী! তোমার আর ব্যবসা করার দরকার নাই। আমরা মোটে দুইজন মানুষ। ভালোভাবেই তো চলিতেছে। অভিমানের সুরে বলত বর্ষা : ঘরে নতুন মেহমান আসলি তহন লাগবেনে। জমির আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলত– সেডাতো বুঝি কিন্তু বিড়ি কিনতি গেদু-কুটুরা আসে, ওরা তোমার দিক আড় চোহে চায়। আমার বুকের মধ্যি কেমন করে। তখনতো হেসেই কুটিকুটি হত বর্ষা। বিড়ি কিনতি এখনও এসব গেদু-কুটুরাই আসছে। তার সৌন্দর্যের দিকে সেভাবেই আড়চোখে তাকাচ্ছে। এটা বর্ষারও ভালো লাগে না। মুখে কোনো কথা বলে না বর্ষা কিন্তু এসব যে সে পছন্দ করে না তা সে তার ব্যবহারে বুঝিয়ে দেয়। একহাতে বিড়ি দিয়ে অন্য হাতে টাকাটা, নিয়েই মুখটা ঘুরিয়ে ফেলে। যেন কাজ শেষ, চলে যাও, আমি কাজে ব্যস্ত। মুহূর্তকাল ক্ষেপণ না-করে ওরাও চলে যায়। কিন্তু বর্ষা ভাবে, কী করবে সে? জমিরের কথা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হতে থাকবে? ছেড়ে দেবে এসব, নাকি ব্যস্ততার মাঝে ভুলে থাকবে জমিরকে?

কলার কাঁদিটা আজই কাটতে হবে, তা না-হলে বেশি বাত্তি হয়ে গেলে আর খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না। তাই রাশা বিস্কুট আর ডিম কিনতে আসলে তাকে বলল– ভাইজান তুমি আমার খালাতো ভাই, আমার সোয়ামির দোস্ত, দেইহা-শুইনা রাখফা কইয়া ঘটকালি কইরা আমারে এই বাড়ি বিয়া দেছ। কোনোদিন তো কোনো কামে কই নাই, আইজ এট্টা কাম কইরা দাও।

: কী কাম কও দেহি।

: আমার এই আনাজি কলার কাইনডা বেইচা দাও। বারো ফানা আছে। গণ্ডা পাঁচ টাকা হালি বেচপো।

: আচ্ছা নগদ দামে আমিই কিইন্যা নেলাম, হরিণফালি কলা, আরো দোস্তের হাতের! এই নাও টাহা, বিয়ালে আইসা কাইট্যা নেবানি। বেশি দামে কলা কিনেও বেশ খুশিমনে চলে গেল রাশা। কিসের এক সম্মোহনী শক্তিতে রাশা কোনো দামাদামি করল না। একবার চুরি করে ধরা পড়েছিল রাশা তাই আড়ালে লোকে তাকে রাশা চোরা বলে। টাকাগুলো গুনে বাঁশের খুঁটিতে আড়াআড়ি চেপ্টা ফুটো করা ব্যাঙ্কে রেখে দিল বর্ষা। তারপর লম্বা বাঁশের মাথায় দড়ি দিয়ে শক্ত করে কাঁচি বেঁধে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে হাতে কলার কাঁদি নিচে ধরে রেখে ডান হাতে কাঁদির উপরের দিকে চার পাশ দিয়ে পেঁচিয়ে দিয়ে ডাবিয়ে দিল কাঁচিটা; চার দিক দিয়ে কাটা দাগ বসে গেলে কাঁচি

ফেলে কাঁদিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোচড়াতে থাকে বর্ষা। চাচি এসে বলে– আলো অভাগী! আমারেতো ডাকতি পারতি। আর একখান চেয়ার আন তুই কলা ধইরা রাখ আমি কাটি। কলার কাঁদিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কলাগাছ ফেড়ে থোড় বের করল বর্ষা। চাচিকে অর্ধেক দিল, বাকিটা নিজের ঘরে রেখে গাছটা শুকাতে দিল লাকড়ির জন্য। চাচি তাকে কিছু কুচো চিংড়ি মাছ দিয়ে গেল। থোড় দিয়ে কুচো চিংড়ি জমিরের খুব প্রিয় ছিল। বর্ষার হাতের এই চচ্চড়ি খেয়ে জমির খুবই প্রশংসা করত। চোখে পানি আসে বর্ষার। ভাত খেতে গিয়ে বারবার বিষম যায় বর্ষা। কী জানি হয়তো আসমান থেকে জমির মনে করছে বর্ষাকে।

সন্ধ্যা থেকেই বর্ষার শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে আজ। কিছুতেই ভালো লাগে না। খেজুরপাতা চিরে চেলার পাটি বুনে অর্ধেক শেষ করে ফেলেছে বর্ষা। বিছানা ছেড়ে উঠে পাটিটা বিছিয়ে বুনাতে বসল সে। কুপিটা নিভু নিভু করছিল, উঠে গিয়ে কেরোসিনের বোতল থেকে কেরোসিন ঢেলে নিতে গিয়ে দেখল কুপির সলতে নেই। চিকন করে কাপড় ছিঁড়ে দর্জির মতো পাকিয়ে কুপিতে লাগিয়ে কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে দিতেই প্রথমে মিটমিট করে। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অনেকক্ষণ পাটি বুনে কুপি নিভিয়ে পাটির উপর ঘুমিয়ে রইল বর্ষা। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে সে ভালো করে ঘরের দরজা বন্ধ করে। দরজায় চেয়ার ঠেসে দিয়ে রাখে সে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। আলসিতে আজ আর ভাত খেল না বর্ষা। মশারিও টানাল না। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল।

এই বৃষ্টি তাকে জমিরের অনুভূতি মনে করিয়ে দেয়, বৃষ্টির হিমেল ঠাণ্ডায় সে জমিরের ছোঁয়া পায়। জমিরের ঘ্রাণ পায় সে। জমির তার চুলে বিলি কেটে দেয়, আদর করে দেয়, সম্মোহিতের মতো আবিষ্ট হয় বর্ষা। আজও বিকেলের দিকে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। বর্ষাকাল বিদায় নেবার পূর্বে তার সঞ্চিত জলরাশি ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে। সেই রাতে বৃষ্টির ঝুপঝুপ বেড়ে গেল। সাথে হালকা বাতাসও আছে। আজও পাটি বুনল বর্ষা। বাতাসে কুপি নিভে যাবার উপক্রম হতেই মাচানে বিছানা পেতে দুয়ার বন্ধ করে কুপি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সে। আজ আর কিছুতেই ঘুম আসল না বর্ষার। কিসের ঘোরে বিমোহিত হয়ে পড়ে থাকে বর্ষা। প্রতিদিনের মতো আজও জমিরের অনুভূতি টের পায় বর্ষা। কিন্তু এ অনুভূতি প্রতিদিনের চেয়ে অন্য রকম। বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছে আজ জমির। ঘোরের মধ্যেই জড়পদার্থের মতো পড়ে থাকে বর্ষা। কল্পনায় শিহরিত হতে হতে অবশ হয়ে আসে তার শরীর। কিন্তু একি কল্পনা না বাস্তব? এটা কী করে সম্ভব। ঘোর কাটে বর্ষার। বিস্ময় আতঙ্কে রূপ নেয়। এক ঝটকায় মাচানের একপাশে সরে আসে সে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে দুলে ওঠে মাচান, বুঝি এখনি ভেঙে পড়বে। মাচান থেকে মাটিতে নেমে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা দেশলাই দিয়ে

কুপি ধরায় বর্ষা। কুপির আলোয় অস্পষ্ট একটি মানবমুখ দেখে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রাণপণে উচ্চঃস্বরে চিৎকার দিতে চেষ্টা করে বর্ষা। কিন্তু গলার স্বর বেরোতেই চায় না। তবুও জোর চেষ্টায় চাচিকে ডাকে বর্ষা– ও চাচি দেহে যাও। আমার ঘরে চোর আইছে। তাড়াতাড়ি আসো চাচি, দরজা খুলে ঘরের বাইরে যেতে চেষ্টা করে বর্ষা। কিন্তু একটি বলিষ্ঠ হাত বর্ষার মুখ চেপে ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় মেঝেতে। তারপর দ্রুত পিছনের বারান্দার দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাগানের পথে আঁধারে মিলিয়ে যায় লোকটি। নাজেম চাচা আর চাচি দৌড়ে আসে;
কী হয়েছে মা? চাচিকে ধরে কেঁদে ফেলে বর্ষা।
: তোরে না কলাম বাপের বাড়ি চইল্যা যা! তুইতো আমার কথা শুনলি না। তোরে নিয়া যে এহন কী করি? এ কথা কাউরে কবি না মা। তুই আমার জমিরের ইজ্জত। ভয় পাইস না। এরপর আর চোর আসফিনানে। তুই কারুরে সন্দেহ করিস নাহি? আমারে ক'। কোনো কথা বলে না বর্ষা। লজ্জায় কেবল মাথা নিচু করে থাকে। নাজেম চাচা বর্ষাকে বলে– আগামী কাইল রাত্তিরে যত অসুবিধাই হউক এই কোঠার বাইরে যাবি না। দরকার লাগে মাচানের নিচে লুকাইয়া থাকবি। খবরদার কোঠার বাইরে যাবি না। চাচার মুখের দিকে তাকায় বর্ষা।
: ভয় নাই মা, আলাহ সহায় আছে। তাইতো আমার কানে আগেই দিছিস।

সারাদিন ঝিরঝির বৃষ্টি, ঝরছে তো ঝরছেই। বর্ষার বুকটা দমকা বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে হু-হু করে। বাতাসের সঙ্গে পালা দিয়ে কাঁদছে বর্ষা। বাতাসের বেগে কুপিটা বার বার জ্বালালেও সেটা নিভে যাচ্ছে। বর্ষা মনে করে জমিরের আত্মা এই ঘরেই বসবাস করে। সুখে-দুঃখে সেই আত্মাই বর্ষাকে পাহারা দেয়। চাচি বর্ষাকে তাদের ঘরে গিয়ে ঘুমাতে বললেও সে জন্যেই বর্ষা যায় না। যায় না বাপের বাড়িও। জমিরের আত্মাকে এই ঘরে একলা রেখে বর্ষা অন্য কোথাও যাবে কী করে? তাই আলাহ-রসুলের নাম নিয়ে চুপচাপ এখানেই চোখ বুজে পড়ে থাকে। কখনো নির্বিষ্ট মনে জমিরকে গভীরভাবে কল্পনা করে। জমির আসে। জমিরের ঘ্রাণে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় বর্ষা। বর্ষার মনে হয় জমিরই তাকে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আজ আর গভীর ঘুম হয় না বর্ষার। উড়ন্ত বাদুরের ডানা ঝাপটানোর পত্পত্ শব্দ শোনা যায়। বাতাসের বেগ কমে গেছে।

বৃষ্টিটাও থেমে গেছে। তাই শেষরাতের আকাশটা ফর্সা মনে হচ্ছে। আকাশে দু'একটি তারাও উঠেছে। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছে তবে ঘুটঘুটে আঁধার নেই। পিছন বারান্দার খিড়কিদুয়ারটা খটমটিয়ে শব্দ হচ্ছে। চিৎকার দিয়ে উঠে পালাতে ইচ্ছে করছে বর্ষার কিন্তু চাচাজান মানা করেছে তাই সে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে নামতে চেষ্টা করে। কিন্তু ততোক্ষণে তার শরীরের উপর জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে। ঘন ঘন

নিঃশ্বাসের ওঠা-নামা শুনতে পাচ্ছে বর্ষা। অত্যন্ত কৌশলে নিজেকে ভারমুক্ত করার চেষ্টা করে। চিৎকার করতে যেয়ে অস্পষ্ট শব্দ হতেই বর্ষার কণ্ঠ চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে– এই ছেমড়ি চ্যালাবি না, তাতে আমার কিছু হবেনানে; তোর ইজ্জত যাবেনে। দম্ বন্ধ হয়ে আসে বর্ষার।
সে মাথা ঝাঁকিয়ে মুক্ত হয়ে ছিটকে পড়ে দৌড়ে ঘর থেকে বের হতে যেয়ে মনে পড়ে সেই কথা; অতঃপর মাচার নিচে ঢুকে পড়ে সে।

লোকটি এবার বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে সারা ঘর খুঁজে বর্ষাকে না-পেয়ে মাচার বিছানা টেনে মাটিতে ফেলে দেয়। দড়িতে ঝুলানো কাপড়-চোপড় টেনে দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে আর গজগজ করে– ছেমড়ি আইজও তুই আমারে ... এরপর যাবি কোহানে? অনেক ধৈর্য ধরছি ... বলতে বলতে পেছনের বারান্দা দিয়ে বের হতে উদ্যত হয়। বর্ষা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে, কী দুঃসাহস কী দুর্ধর্ষ, কিসের অধিকারে অভ্যস্তের মতো মাচানে উঠে আসে। এ অধিকার শুধু জমিরেরই ছিল। একথা বর্ষা কাকে বলবে, কেমন করে বলবে?

হঠাৎ বিকট শব্দে চিৎকার করে ওঠে পলায়নরত লোকটি। তাড়াতাড়ি মাচানের নিচ থেকে বের হয়ে কুপি জ্বালায় বর্ষা। লোকটির ডান-পা শূন্যে লাফাচ্ছে; আর দাপাচ্ছে লোকটি। রক্তের ঝরনা ছিটকে বেরোচ্ছে কাটাস্থান থেকে। আর্তনাদ করতে করতে গোঙ্গানির শব্দ বের হচ্ছে। এগিয়ে কাছে এসে মুখের উপর থু থু ফেলে বর্ষা– ছি! ছি! তুমি একটা হারামজাদা, উচিত বিচার হইছে তোমার, আমারে বিধবা বইলা অসহায় পাইছিলা না? এবার ধীরেসুস্থে ঘরের আড়ার উপর থেকে নেমে আসে ঋজু দেহের নাজেম। ক্লান্তিতে অবসন্ন সে।
: এক গ্লাস পানি দে মা।
: চাচা!–বর্ষার মাথায় হাত রেখে নাজেম চাচা বলে–
: হ! আমিই মা, আমার মা যদি আমার ভিটায় থাকতি চায় তাহলি জঙ্গল সাফ করার দায়িত্ব তো আমারই, মা! তুই এহন থিকা নির্ভয়ে থাকপি। চাচাজানের মুখের দিকে মমতার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বর্ষা। চাচি তার পিছনে এসে হতবিহবলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। রাজা চোরার গোঙ্গানির শব্দ ততক্ষণে থেমে গেছে। থামেনি রক্তের স্রোত।
তারপর থেকে মেঘ হলেই বর্ষা ভাবে ... এই মেঘের আগুন বর্ষার সংসারটাকে তছনছ করে দিয়েছে। তার শরীরটাকেও তছনছ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি!

## আঞ্চলিক সংলাপ ও গৃহস্থালির বর্ণনায় মুন্সিয়ানা

.............................................................................

**প্র শা ন্ত মৃ ধা**

শুরুতেই কবুল করে নেওয়া দরকার, রচয়িতার নামহীন কোনও রচনা পড়া খুব দুঃসাধ্য। আমাদের চোখ তো বহুদিনের অভ্যাসে অভ্যস্ত, কোনও লেখা পড়ার আগেই তার রচয়িতার নাম পড়ে নেয়। তাতে, ওই লেখক পরিচিত হলে, শুরুতে নিজের ভেতরে প্রত্যাশার এক গড়ন তৈরি হয়। সেই প্রত্যাশা কখনও মেটে, কখনও মেটে না। কিন্তু রচয়িতার নামহীন লেখা পড়া, আর সেই লেখা নিয়ে দুটো ছত্র লেখা সত্যি কঠিন বটে।

যে-কোনও লেখাই পাঠক হিসেবে পড়ার যে অভিজ্ঞতা, সেই লেখা নিয়ে যে কোনও প্রকার দুই কথা বলতে গেলে পাঠকের অভিজ্ঞতার সবটুকু থাকে না। আর, আলোচনা বা সমালোচনা– ও বাব্বা, সে আরও কঠিন কাজ। তখন এমন অবস্থা হয়, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। কে যে কারে দেখে? কার যে কী দেখা হয়! অন্ধের হস্তিদর্শন এর চেয়ে ভালো।

'মেঘের আগুন' শিরোনাম হিসেবে ভালো। কাব্যিক দ্যোতনা আছে। কাব্যগ্রন্থ কি কবিতার এমন নাম হয়, গল্পেরও এমন নাম হতে বাধা নেই। কিন্তু যে--কোনও নামই শেষ
পর্যন্ত যাকে বলে 'নামকরণের সার্থকতা' সেই দিক দিয়ে কতটুকু সার্থক, তা ওই লেখার বিষয়ে নির্ধারিত হয়ে যায়। হয়তো লেখাটা কিছুদূর পড়ার পরে বা একদম শেষে গিয়ে তা বুঝেও নেয়া যায়। এ লেখার ক্ষেত্রে শিরোনামটা পুরোপুরি এঁটে ওঠেনি।

আর, গোটা গল্পেই যে-জিনিসটির খুব অভাব, তা হল, শুশ্রূষা আর পরিমার্জনের। একটি লেখা একবারে একটানে লেখা হতে পারে, আবার বারবার সুস্থির পরিমার্জনেও দাঁড়াতে পারে। এর কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। কিন্তু এই লেখাটা পড়তে গিয়ে যেন মনে হয়,
বেশখানিকটা তাড়াহুড়ো বা মনোযোগের অভাব ছিল, আরও একবার রচয়িতা আদ্যোপান্তে চোখ বুলাতে পারতেন।

'মেঘের আগুন' বর্ষা নামের সদ্যবিধবা এক তরুণীকে নিয়ে লেখা গল্প। স্বামী জমির হরিণফালী আনাজি কলাগাছে বাঁশের ঠেকা দিয়ে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যায়। তারপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে বাপের বাড়ি চলে যেতে বলে। বাপের বাড়ির থেকে নিতেও এসেছে। সে যায়নি। স্বামীর ভিটাতেই থাকে। চাচাশ্বশুর নাজেম ও চাচিশাশুড়িই তার অভিভাবক। বাড়িতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ছোট দোকানও চালায়। দোকানে বর্ষার খালাতো ভাই ও জমিরের বন্ধু রাশা তার দোকানে ডিম ও বিস্কুট কিনতে আসলে, বর্ষা তাকে কলার কাঁদিটা বিক্রি করে দিতে বলে। কিন্তু, রাশা নিজেই কলার কাঁদিটা কিনে নেয়। পরে এসে নিয়ে যাবে জানায়। পরে, এই রাশাই কলার কাঁদি নেয়ার বদলে রাতে বর্ষার ঘরে আসে। বর্ষা অন্ধকারে তাকে চিনতে পারে না। বর্ষাকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করে। আর এসময় নাজেম চাচার দায়ের কোপে রাশা আহত হয়। বর্ষা লম্ফ ধরালে দেখে, রাশা গোঙাচ্ছে। তখন বর্ষা ভাবে, 'এই মেঘের আগুন বর্ষার সংসারটাকে তছনছ করে দিয়েছে, তার শরীরকেও তছনছ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি!' গল্প শেষ।

শেষ বাক্যের শেষ অংশটুকুর সঙ্গে মেঘের কোনও সম্পর্ক নেই। বজ্রপাতে তার স্বামী মারা গেছে, সংসার তছনছ হয়েছে, কিন্তু মেঘের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক এখানে যথাযথ প্রযুক্ত হয়নি। যে কোনও লেখায় পড়ার শুরুতে লেখকের প্রবণতা, কাহিনীর উদ্দেশ্য ও গন্তব্য যদি বোঝা যায়, সেটা লেখার বড় দুর্বলতা। এ গল্পে সেটা ঘটেছে। রাশা বর্ষার সামনে আসার পরেই সেটা বোঝা গেছে। আর, প্রকৃতি ও আবহাওয়ার বর্ণনা আর একটু বিস্তারিত হতে পারত। তবে, আঞ্চলিক সংলাপ ও গৃহস্থালির বর্ণনায় লেখকের মুন্সিয়ানা আছে।

রচয়িতার বিবেচনার জন্যে একটি কথা : তিনি গল্পটা আবার পরিমার্জনের কথা ভেবে দেখতে পারেন।

**০৩ ডিসেম্বর ২০১২, সিলেট**

# উঠি জেগে আজও

.......................................................

## মা য়া এ ঞ্জে লো / দে ব যা নী ক চ্

[মায়া এঞ্জেলো (১৯২৮-) যুক্তরাষ্ট্রের লেখক, কবি এবং Wake Forest University-এর আমেরিকান স্টাডিজের অধ্যাপক। তিনি আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের একনিষ্ঠ ধারক। তিনি একাধারে একজন প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, অভিনেত্রী, চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, নাট্যকার, ইতিহাসবিদ, জীবনীকার এবং মানবাধিকারকর্মী। 'আজও জেগে উঠি' তাঁর 'Still I Rise' কবিতার অনুবাদ যেখানে মূলত একজন কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে জাতিগত বৈষম্যের চরম হিংস্রতার প্রতি তাঁর জীবনের গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি : I Know Why the Caged Bird Sings, Gather Together in My Name, The Heart of a Women, Letter to My Daughter, I Shall Not be Moved এবং বিখ্যাত কিছু কবিতা : Still I Rise, Phenomenal Woman, Poetry for Young People. তিনি ত্রিশটিরও বেশি সম্মানসূচক ডিগ্রি এবং তিনটি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।]

ইতিহাসে তোমরা আমায় লিখতে পারো
কিছু তিক্ততা, দ্ব্যর্থক মিথ্যে দিয়ে,
কাদা-মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারো আমায়
তবু আজও, জেগে উঠি, ধুলোর মতো।

আমার প্রাণ চঞ্চলতায় কি বিদ্ধ হও?
বেদনায় আবিষ্ট কেন তুমি?
কারণ আমি হেঁটে চলি যেন তৈলকূপের সন্ধান পেয়েছি
বৈঠকি ঘরে তা সজোরে আছড়ে পড়ছে।

চন্দ্র সূর্য যেমন,
ঢেউয়ের সংকল্পতায়
আকাঙ্ক্ষা যেমনি চূড়া ছুঁতে চায়,

তেমনি আজও জেগে উঠি ।

তুমি কি বিধ্বস্ত রূপে চেয়েছিলে আমায়?
নতশির আর নীচ নয়নে?
অশ্রুবিন্দুর মতো খণ্ডিত যেন কাঁধদুটো ।
স্থবির আমার অনুভবের আর্তনাদে ।

এ ঔদ্ধত্য কি পীড়া দেয় তোমায়?
ভয়ানক কঠিন নয় কি তা মেনে নেয়া
কারণ আমি হসে উঠি যেন স্বর্ণখনি পেয়েছি
নিজের বাগান খুঁড়ে ।

কটুবাক্যে আমায় তীরবিদ্ধ করতে পারো,
বিদীর্ণ করে দিতে পারো তোমার শীর্ণদৃষ্টিতে,
ঘৃণায় বিনাশ করতে পারো,
কিন্তু আজও, জেগে উঠি, বাতাসের মতো ।

আমার যৌবনানুন্মুখতা কি তোমায় দুঃখ দেয়?
জাগিয়ে তোলে বিহ্বলতা
আমার নিবিড় সন্ধিক্ষণের পরমকালে
হীরকখণ্ড খুঁজে পাওয়ার মতো নেচে উঠি ।

লজ্জান্বিত ইতিহাসের কুটিরের বাহিরে
জেগে উঠি
কষ্টে বোনা অতীত পেছনে ফেলে
জেগে উঠি
কৃষ্ণ সাগর আমি, আকস্মিক এবং আস্তীর্ণ,
উথাল উৎসারিত তরঙ্গ আমার ।
ভীতি আর শঙ্কার রাত পেছনে ফেলে
জেগে উঠি

আশ্চর্য নিরভ্র এক ভোরে
জেগে উঠি
কৌলিক বর এনেছি আমি,
দাসদের স্বপ্ন আর আশা যে আমি ।
জেগে উঠি
জেগে উঠি
জেগে উঠি ।
(অনুবাদ : দেবযানী কচ্)

প্র ব ন্ধ / চ ল চ্চি ত্র

## রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্ররূপ: সত্যজিৎ রায় এবং নারী প্রসঙ্গ

..............................................................................................

তা রে ক মা সু দ

[তারেক মাসুদ তাঁর এই রচনাটি আমাকে দিয়েছিলেন ত্রৈমাসিক ‘আবহমান’-এ ছাপার জন্য । ঘন-ঘন ফোন আর দেখা হলেই রিমাইন্ডার; আমার এ-সব তাড়া লেখাটি তৈরির পেছনে কাজ দিয়েছিল বলে, পরে জানিয়েছিলেন তিনি । **–শওকত হোসেন** ]

এই লেখাটিকে একটি সাক্ষাৎকারের ‘বাই প্রোডাক্ট’ বলা যেতে পারে । বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকায় একটি নতুন প্রকাশিত নারীবাদী পত্রিকার পক্ষ থেকে কথা বলেছিলাম উপমহাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও বিদগ্ধ সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্ত’র সাথে । প্রশ্নগুলো ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে সত্যজিৎ রায়-বিষয়ক । আবু সয়ীদ আইয়ুব যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যের আধুনিকতম ব্যাখ্যাকার হিসেবে স্বীকৃত তেমনি চিদানন্দ দাশগুপ্ত সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রকর্মের আধুনিকতম বিশ্লেষক হিসেবেই বিবেচিত । সুতরাং অনুযোগের সুরে তোলা প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দেওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি যে তিনিই একথা বলার প্রয়োজন নেই । কিন্তু,

সাক্ষাৎকার শেষে অনুলিখন পড়ে ঠাহর হল জবাবগুলো তিনি এড়িয়ে গেছেন। তাই এই লেখার মাধ্যমে আমার পুরনো অনুযোগ নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার নিচের আলোচনাটি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনা নয়। আমি যা দেখবার চেষ্টা করেছি তা হল রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্র উপস্থাপনে সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিকোণগত ভিন্নতা। চলচ্চিত্র-ভাষার ভিন্নতার কারণে মূল সাহিত্য থেকে তার চলচ্চিত্ররূপটি কিছুটা পৃথক হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্ররূপায়ণে সেটিই ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রশ্ন হল, ব্যাপারটা কি আসলেই ভাষান্তরের, নাকি মতান্তরের? আমার বক্তব্য মূলত রবীন্দ্রনাথের দুটো ছোটগল্প 'সমাপ্তি' ও 'নষ্টনীড়' এবং উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'র রায়কৃত চিত্রায়ণকে কেন্দ্র করে। দুই কালজয়ী শিল্পীর সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের তুলনামূলক টেক্সচুয়াল রি-রিডিং-এর মধ্যে সীমিত আমার এই লেখাটি।

প্রথমে তাকানো যাক রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'বাসী চারুলতার দিকে। ভূপতির পতিশূন্য ঘরে একাকী চারু প্রাণ খুঁজে পায় অমলের আবির্ভাবে। অমলের সংস্পর্শসূত্রেই চারু আবিষ্কার করে তার নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সৃজনশীলতাকে। ওদের দুজনের সম্পর্কটি ঠুনকো হতে পারে, কিন্তু এটাও ঠিক, এই সম্পর্কের অনুষঙ্গেই চারুর মধ্যে বিকশিত হতে দেখি তার নিজস্ব সত্তাকে। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এ ভূপতি এবং অমল দুজনকেই আমরা পাই দুই আদর্শিক স্বপ্নের ঘোরে আবদ্ধ দুটি প্রাণী হিসেবে। দুজনেরই বর্তমান বন্ধক পড়ে আছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-প্রতিষ্ঠার কাছে। চারুই কেবল রক্তমাংসের মানুষ যার মানসিক বয়স বেড়ে উঠেছে অমল এবং ভূপতির সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। চারু 'স্ত্রীর পত্র'র প্রতিবাদী মৃণালের মতো যদিও 'ঘর' ছেড়ে 'বাইরে' বেরিয়ে পড়ে না তবু গল্পের শেষে সে যেন ভিন্ন চারু। ভূপতি যখন চারুর অপরাধের শাস্তি হিসেবে চারুকে রেখে কিছুদিনের জন্য দূরে চলে যাওয়ার কথা বলল তখন চারু পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ে প্রথমে আত্মসমর্পণ করলেও পরক্ষণেই ভূপতি যখন অনুকম্পার সুরে বলল–'চলো, চারু, আমার সঙ্গেই চলো।' চারু বলিল, 'না, থাক্।'–এই 'না, থাক্'-এর চপেটাঘাতের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ গল্পটি শেষ করেন এবং চারুর নিঃশব্দ রূপান্তরকে স্বাগত জানান। এই রূপান্তরিত নারীসত্তার পরিচয় আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই, এমনকি পোস্ট্মাস্টার গল্পের ছোট্ট রতনের মধ্যেও। নতুন আর পুরনো দুই পোস্ট্মাস্টারের আগমন ও নির্গমনের মাঝখানে ভালোবাসা-বঞ্চিত রতন পুরনো পোস্টমাস্টারের কেবল করুণাই প্রত্যাখ্যান করে তা-ই নয়, সে যে এই চাকুরিতে থাকতে চায় না তা জানিয়ে দেয়। সত্যজিতের 'পোস্ট্মাস্টার' ছবিতে অভিমানী রতনকে পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথের গল্পের শেষের বিবর্তিত রতনকে পাওয়া যায় না। "প্রভু কহিলেন, 'রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।' এই কথাগুলি যে অত্যন্ত

স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।'" রতনের এই 'আমি থাকতে চাই নে'র সাথে চারুর 'না, থাক্'-এর সম্পর্ক কাকতালীয় নয়।

এবার আমরা চোখ ফেরাই সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'র দিকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পটি 'নষ্টনীড়'-এর শিরোনাম দিয়ে শুরু করেন, কিন্তু গল্পের শেষে শিরোনামের মরালিস্ট মিথকে ভেঙে এটিকে 'চারুলতা'র–অর্থাৎ চারুর গল্পে শেষ করেন। অন্যদিকে রায় তাঁর চলচ্চিত্রটি শুরু করেন 'চারুলতা'কে নিয়ে কিন্তু ছবির শেষে এটিকে পর্যবসিত করেন 'নষ্টনীড়'-এ। রবীন্দ্রনাথের গল্পের শেষে চারুর যে-উত্তরণ তা সত্যজিৎকে আকৃষ্ট করে না, বরং তিনি আক্রান্ত বোধ করেন অনেকটা এইরকম কিছু ভেবে, 'আহা, চারু-ভূপতির সম্পর্কটি অবশেষে জোড়া লাগিল বটে, তথাপি সেই পূর্বের ন্যায় নিষ্কণ্টক রহিল না আর'। সত্যজিৎ রায় কার্যত উপরের বাক্যটিকে চলচ্চিত্রের আক্ষরিক ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন চারুলতার শেষ ফ্রিজ শটে। ভূপতি এবং চারুর দ্বিধান্বিত হাত পরস্পরকে স্পর্শ করতে গিয়েও যেন থমকে যায়। সত্যজিৎ এতটুকু ইঙ্গিতেও সন্তুষ্ট বোধ করেন না; সেই মিলনপূর্ব মুহূর্ত থেমে-যাওয়া দুজনের হাতের ফ্রিজ ফ্রেমের উপর তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সেই প্রিয় নীতিবার্তা– 'নষ্টনীড়'। ভাবতে অবাক লাগে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি নিয়ে সত্যজিৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা নেন 'পথের পাঁচালীর'ও আগে। সম্ভবত এটিই তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য প্রচেষ্টা। আরো অবাক হতে হয়, সেই ছবি তিনি অবশেষে তৈরি করেন জীবনের শেষদিকে এসে। অন্যকথায়, এটি খুবই স্পষ্ট, উপন্যাসটি যেমন তাঁকে ভাবিয়েছে তেমনি এর চিত্রনাট্য নিয়েও তিনি ভেবেছেন প্রচুর। সুতরাং রবীন্দ্রমানসকে সত্যজিৎ কীভাবে ব্যাখ্যা করেন তার নজির হিসেবে 'ঘরে বাইরে' ছবিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটিতে নিখিলেশের চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে হয়তো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ভাবনাও অমূলক হবে না যে এই পক্ষপাতের দায় এড়ানোর জন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসটির জন্য এমন একটি কাঠামো-ভঙ্গি বেছে নিয়েছেন যেখানে নিখিলেশ, বিমলা এবং সন্দীপ–এই তিনটি চরিত্রের পরস্পর ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের নিজস্ব ভাষ্য পৃথকভাবে আমরা পেতে পারি। সত্যজিৎ রায় আধুনিকতম সময়ের আধুনিকতম শিল্পের শিল্পী হিসেবে উপন্যাসের এই প্রাগ্রসর গঠনশৈলীকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন এবং 'রশোমনো'র সমতুল্য একটি নতুন ভাষাভঙ্গি উপহার দিতে পারতেন। কিন্তু সত্যজিৎ সেই রবিকরোজ্জ্বল পথে যাননি, কারণ হয়তো তা হলে তাঁর জন্য নিখিলেশকে দেবতা এবং সন্দীপকে দানব বানানো ততটা সহজ হত না। রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ যে রায়ের

দেবতুল্য নিখিলেশ নয়, বরং একধরনের অ্যান্টিহিরো, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথার নিচের উদ্ধৃতি তার প্রমাণ :

আজ সন্দেহ হচ্ছে, আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব, আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়াবহ শোধ নেয়।...

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হয়ে গেছি, তা জানতেই পারি নি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে সকল শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এই ছহাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে। আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা, ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলভাবে পৃথক। আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নিখিলেশ বা সন্দীপ কেউই নায়ক নয়, অথবা প্রতিনায়ক হিসেবে চিহ্নিত নয়। বস্তুত দুটি চরিত্রই দুটি পরস্পরবিরোধী আইডিয়া বা আদর্শের মডেল মাত্র। উপন্যাসটিতে রক্তমাংসের মনুষ্যচরিত্র একটিই—সেটি বিমলা, যে প্রতিমুহূর্তে অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে নিয়ত বিকাশমান। বিমলা জীবনের ভুল-ত্রুটি, ন্যায়-অন্যায়, সকল টানাপড়েনে মন্থিত হয়ে উপলব্ধির নতুন স্তরে উন্নীত অবস্থায় দেখতে পায় নিজেকে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে দুটি পরস্পরবিরোধী আদর্শের সহ-অবস্থান এবং সংঘাতই একমাত্র উল্লেখযোগ্য দিক নয়—ঐ মধ্যবিত্ত সংঘাতের মধ্যস্থলে আটকে পড়া অসহায় কৃষকসমাজ ও বিহ্বল বিমলার চেতনাগত বিকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এখন কথা হল, সত্যজিৎ রায়ের ছবিটি 'ঘরে বাইরে'র এই গভীর বার্তাকে আদৌ স্পর্শ করে কি? আমরা উপন্যাসের গোড়ার দিকেই লক্ষ করি, সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই বিমলা বাইরের জগৎ সম্পর্কে উৎসুক ছিল। এমনকি নিখিলেশ নিজেই একদিন অবাক হয় জেনে যে বিমলা স্বদেশী আন্দোলনের খোঁজখবর রাখে। সন্দীপের আগমনে পরবর্তীকালে তার এই সুপ্ত ইচ্ছা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু, সত্যজিৎ রায়ের বিমলাকে দেখি, একদিকে সন্দীপের প্রতি আকর্ষণই যেন তাকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্যদিকে সন্দীপের ব্যক্তিগত অসততাই যেন পুরো আন্দোলন সম্পর্কে বিমলার মোহভঙ্গ ঘটায়। শুধু মোহভঙ্গ ঘটায় বললে কম বলা হবে, বরং যে-বিমলা গোড়া থেকেই নিখিলেশের 'ঠাণ্ডা' রক্ষণশীলতাকে প্রায়ই বিদ্রূপ করত সেই বিমলাই এতটাই পিছনে ফিরে যেতে চায় যে সে তার স্বামী নিখিলেশকে বলছে

'তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝতে চাই না, কিছুই জানতে চাই না'। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মোহমুক্ত বিমলার পরিণতি কি এতটা নেতিবাচক? উপন্যাসের বিমলা কি স্বামীর মৃত্যু এবং নিজের বৈধব্যকে তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে গণ্য করে? বোধ হয় না। উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় বিমলা'র আত্মকথা : "আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই।" আসলে এই অপরাধবোধ বিমলার নয়। এই পাপচেতনা রবীন্দ্রনাথেরও নয়। এটা সত্যজিৎ রায়ের অতিনৈতিক মানসগঠনের। এই মরালিজমের সম্ভাব্য উৎস সত্যজিৎ রায়ের ব্রাহ্ম-উত্তরাধিকার। ব্রাহ্মসমাজ যেমন বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রগতির হাওয়া নিয়ে এসেছিল অন্যদিকে ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতারও প্রচলন ঘটিয়েছিল। বাঙালি হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ফুলহাতা ব্লাউজ ও মোজা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দুসমাজে পরদাপ্রথার প্রচলন ঘটায় ব্রাহ্মসমাজই। মজার ব্যাপার হল, পারিবারিকভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-পরিবেশেই বড় হয়েছেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে তিনি ভিক্টোরিয়ান মরালিজম থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিলেন। বিশ বছর আগে সত্যজিৎ রায় চারুলতার উপসংহার টানেন নৈতিকতাবোধে তাড়িত হয়ে। বিশ বছর পর '৮৪ সালে পৃথিবী আরো খানিকটা অগ্রসর হলেও সত্যজিৎ রায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকভাবেও আরো বুড়িয়ে এসেছেন, তাই প্রায়শ্চিত্ত দিয়েই কেবল 'ঘরে বাইরে' শেষ নয়, শুরুও করেন তা-ই দিয়ে।

এবার আসা যাক 'সমাপ্তি' গল্পের চলচ্চিত্রায়ণ প্রসঙ্গে। প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৮৯৩ সালে। তখন প্রেম, যৌনতা ইত্যাকার বিষয়ে নারীচরিত্রকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখানোই ছিল তখনকার রেওয়াজ। অথচ রবীন্দ্রনাথ অবলীলায় বিপ্লবটি ঘটিয়ে ফেললেন এই গল্পটিতে। শহুরে শিক্ষিত অপূর্ববাবু গ্রামে ফিরে তার বিবাহের পাত্রী হিসেবে বেছে নেন অপ্রাপ্তবয়স্কা মৃন্ময়ীকে। বিএ পাশ-করা বাবুটি বিয়ের ব্যাপারে কনের সম্মতি নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেন না। উপরন্তু বাসররাতে প্রত্যাশা করেন মৃন্ময়ীর দেহ-মন তার প্রেমে সাড়া দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। কিন্তু অপরিণত বয়সের মৃন্ময়ীর যথারীতি সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। তার মন পড়ে আছে কী করে সে জানালা টপকে গাছ বেয়ে দোলনা চড়তে যাবে। গল্পের শেষে মৃন্ময়ী যখন বয়সে এবং প্রেমে পরিণত হল তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে দিয়ে এক কাণ্ড ঘটিয়ে দিলেন। যে-অপূর্ববাবু মৃন্ময়ীর মধ্যে প্রেমসঞ্চারে ব্যর্থতা মেনে নিয়ে কলকাতায় পড়ে থাকলেন, সেই কলকাতায় নিজ উদ্যোগে এসে হাজির হল মৃন্ময়ী। শুধু তা-ই নয়, অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আঁধার ঘরে অপূর্বকে জাপটে ধরে চুমু খেল সে। 'সমাপ্তি' গল্পের শেষ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্বণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য

ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না।

রবীন্দ্রনাথের গল্প এখানেই শেষ। মৃন্ময়ীর এই সক্রিয়তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন সত্যজিৎ রায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পের এই শেষটি আমূল বদলে ফেলে উদ্ভাবন করলেন এক প্রভিনশিয়াল পরিণতির। রবীন্দ্রনাথের গল্পশেষের ঠিক বিপরীতমুখী ঘটনাস্রোত সৃষ্টি করে বাবুটিকে বরং গ্রামে ফিরিয়ে আনলেন আবার। ঝড়-বৃষ্টি পেরিয়ে অপূর্ব যখন মৃন্ময়ীকে নিজের বাড়িতেই খুঁজে পেল তখন সে প্রেমের পরশের আকাঙ্ক্ষায় লজ্জাবনত। 'সমাপ্তি'র সমাপ্তিদৃশ্যে অপূর্ব যখন মৃন্ময়ীর চিবুক স্পর্শ করতে উদ্যত তখন সত্যজিৎ রায়ের সম্ভ্রমে বাধল। পুত্র এবং বধূর প্রেমদৃশ্যে বিব্রত দরজার বাইরে দাঁড়ানো মা এবং চলচ্চিত্র-দর্শকদের মুখের উপর পরিচালক দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। লক্ষ করার মতো ব্যাপার, কেবল 'সমাপ্তি'র সমাপ্তি নয়–উপরে আলোচিত অন্য দুটো গল্পেরও শেষ নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সাথে সত্যজিৎ রায়ের যত সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরিণতি নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের এই সংকট যে কতটা ক্রনিক তার আরো একটি পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। 'দেবী' গল্পটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হলেও আমরা জানি মূল ধারণাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। ('দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন–এ কথাটি প্রথম সংস্করণে ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই। এখন করিলাম। –প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। নব কথা, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা) রবীন্দ্রনাথের সেই ত্রিকৌণিক সম্পর্ক এবং দুই পুরুষের মধ্যবর্তী নারীচরিত্রের অসহায়ত্ব এ-গল্পেরও বিষয়। সত্যজিৎ রায় যখন এই গল্পটি নিয়ে ছবি বানালেন তখন এর শেষ নিয়েও সংশয়ে পড়লেন। সত্যজিৎ রায়ের জীবনীকার মারি সিটনের সূত্রে আমরা জানি রায় যেভাবে ছবিটি শেষ করেছিলেন তাতে দয়াময়ী নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করে। আমাদের ভাগ্য ভালো বলতে হয় দৃশ্যগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ছবিটি শেষ করেছিলেন দ্বিতীয়বার নদীর পাড়ে দয়ামযীকে মৃত অবস্থায় দেখিয়ে। পরবর্তীকালে কান-উৎসবের কল্যাণেই বলা যায় অত্যন্ত সৃজনশীল এবং ইতিবাচক একটি দৃশ্য জুড়ে রায় ছবিটির ইতি টানেন। কান-উৎসবে পাঠানোর প্রাকমুহূর্তে তিনি মৃত দৃশ্যের বদলে দয়াময়ীকে দেখান সে বাড়ি ছেড়ে, সাদা ফুলের প্রান্তর ছাড়িয়ে কুয়াশায় হারিয়ে যাচ্ছে। দুর্গার মতো নদীর জলে বিসর্জন না দিয়ে বরং 'স্ত্রীর পত্র'র গৃহত্যাগী মৃণালের মতো দয়াময়ীর জন্য সমস্ত পৃথিবীর দরজাটা যেন খুলে দিলেন সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের নারীপ্রধান গল্পগুলোর প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী মনে হয়। আগ্রহটা যথার্থই। কারণ রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মাত্রাযুক্ত এবং জটিল। চরিত্রগুলো একদিকে যেমনই নিতান্ত সরলা অবলা নয়, অন্যদিকে তেমনই শরৎচন্দ্রের আদর্শায়িত দৃঢ় শক্তিময়ী

'মাতৃপ্রতিমা'ও নয়। সত্যজিৎ 'ঘরে বাইরে' 'সমাপ্তি' এবং 'নষ্টনীড়' ছাড়া আরো যে-দুটি রবীন্দ্রগল্প চলচ্চিত্রের জন্য বেছে নেন তাতেও নারীচরিত্রের ভূমিকা মুখ্য।

তবে এটাও কম লক্ষণীয় নয় যে, 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণালের মতো প্রতিবাদী চরিত্রের থেকে 'মণিহারা'র মণিমালিকার মতো লোভী চরিত্র সত্যজিৎকে বেশি আকর্ষণ করল। প্রশ্ন জাগে 'স্ত্রীর পত্র'-র মতো গল্প কেন তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। গল্পটিতে যথেষ্ট চলচ্চিত্রীয় সম্ভাবনা নেই বলে কি? নাকি স্বামীগৃহত্যাগী মৃণালের গতিরোধ করা ততটা সহজ কাজ নয় বলে? রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই আমরা এই অপরাজিত নারীর দেখা পাই। প্রসঙ্গত 'স্ত্রীর পত্র'র শেষ কয়েকটি লাইন : "আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি। ... তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি–ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সাথে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল–তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। ... আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।" মৃণালের এই 'আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।' আর বিমলার 'যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই' আসলে রবীন্দ্র নারী-চিন্তার অভিন্ন উৎসারণ।

চলচ্চিত্রনির্মাতা এবং আঁকিয়ে ছাড়াও লেখক হিসেবেও সত্যজিৎ রায়ের খ্যাতি রয়েছে। কিন্তু লেখার হাতটি ব্যবহার করেছেন কেবল শিশু-কিশোরদের জন্য। শিশু-কিশোরদের জন্য তৈরি ছবিগুলো বাদ দিলে নিজের লেখার ওপর ভিত্তি করে তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রের সংখ্যা মাত্র চারটি : কাঞ্চনজঙ্ঘা, নায়ক, আগন্তুক ও শাখা-প্রশাখা। অথচ তাঁর সমসাময়িক বিশ্বচলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সাহিত্যনির্ভরতা কমানো। একদিকে 'পারসোনাল সিনেমা' যা চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং প্রত্যক্ষ ও আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা প্রকাশের দিকে গুরুত্বারোপ করছে, অন্যদিকে 'অতোর সিনেমা' চলচ্চিত্রকারকে তাঁর চলচ্চিত্রের সার্বভৌম স্রষ্টার ভূমিকায় দেখতে চাইছে। অন্য কোনো লেখকের ধারণাকে বাস্তবায়নের পরিবর্তে নিজস্ব ধারণা বা কাহিনী এবং সংগীত, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার ওপর নির্মাতার সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি জোর দিচ্ছে 'অতোর সিনেমা'। মজার ব্যাপার, সত্যজিৎ সংগীত, চিত্রগ্রহণসহ ছবিনির্মাণের অনেক কৃতকৌশলই নিজে পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু, কাহিনী এবং ধারণার ক্ষেত্রে দ্বারস্থ হন অন্যের কাছে। এবং সেটা বিভূতিভূষণ থেকে সুনীল পর্যন্ত। আর ঘুরেফিরে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু কেন? নেহাত কাহিনী বা প্লটের জন্যে নিশ্চয়ই নয়। তা হলে? রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন? এখানেই মূল প্রশ্ন। রবীন্দ্রদর্শনে যদি তাঁর আস্থা এতই প্রবল তা হলে তার চিত্ররূপে এত ভিন্ন সুর যোগ করছেন কেন? চলচ্চিত্র সাহিত্যের 'চাটুবৃত্তি' করবে এটা ঠিক নয়। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাবধান করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু একই সাথে এটাও সত্য, সাহিত্যকে চলচ্চিত্রের ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে এর মূল সুরটি বদলে ফেলতে হবে সেটাও বোধহয় ঠিক নয়। চিদানন্দ দাশগুপ্তের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল : সত্যজিৎ রায় কি তা হলে রবীন্দ্রসাহিত্য বা

দর্শনের নিছক ব্যাখ্যাকারের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন—এটাই ধরে নিতে পারি? আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না-দিয়ে তিনি বললেন, ‘সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কোনো জীবনদর্শন ছিল বলে আমি মনে করি না।
অর্থাৎ সোশাল থিংকার হিসেবে তাঁকে তেমন মূল্য দেব না, যেটা রবীন্দ্রনাথকে দেব। আমার কাছে সত্যজিৎ রায়ের গুরুত্ব চলচ্চিত্রের একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে, বক্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা মূলত ব্যাখ্যাকারের।’ আমি জানি না সত্যজিৎ রায় চিদানন্দ দাশগুপ্তের এই ‘ব্যাখ্যাকার’-এর ব্যাখ্যা মেনে নিতেন কি না।

প্র ব ন্ধ / না ট ক

## বাংলাদেশের বর্তমান নাট্য আন্দোলন: কিছু জিজ্ঞাসা

..........................................................................................

গ জ ন্ ফ র  ক বী র

পূর্বকথা : পদার্থবিদ্যায় ‘স্টেট অব রেস্ট’ (State of rest) ও ‘ইউনিফর্ম মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন’ (Uniform motion in a straight line) বলে দুটি কথা আছে ‘স্ট্রেট অব রেস্ট’ বা স্থিতিবস্থা হল সমাজমনের সেই নিষ্ক্রিয় অবস্থাটা, যার মধ্যে নতুন কিছু করার উদ্দীপনা বা সংকল্প মরে গেছে। মরে গেছে কথাটি হয়তো সঠিক নয় আধমরা হয়ে মানুষটি বেঁচে আছে সে নতুন কিছু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে আর রাজি নয়। সমাজ- জীবনে এই স্থবিরতা বা অন্যকথায় যাকে বলে ইনারসিয়া, তা আমাদের বর্তমান নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে সৃজনের যে ব্যাপক আয়োজন দেখা গিয়েছিল সেটা যেন এর কুড়ি বছর পার হতে না -হতেই সহসা চরে আটকে গেছে। লক্ষ্যহীন নতুন পথে চলতে চলতে আজকে এর অবস্থাটা অনেকটাই যেন ইউনিফর্ম মোশান ইন এ স্ট্রেট লাইন-এ চলার মতো অবস্থা। মঞ্চে নতুন নাটক আসছে বটে কিন্তু বিষয়বস্তুতে কোনো অভিনবত্ব নেই। কেউ কেউ কাহিনী বা আখ্যানের সন্ধানে কারবালা পর্যন্ত গেছেন,

কেউ শেক্সপিয়রের কাছে ধরনা দিয়েছেন, কেউ গিরিশ কার্নাড, আর ব্রেখট মহাশয় তো কারণে-অকারণে প্রায় সব নাটকেই অল্পবিস্তর আছেন। মৌলিক নাটকের হঠাৎ করে যেন মঞ্চে আকাল পড়েছে। তাই মলিয়রের ধ্রুপদী কমিডিগুলো হালকাভাবে রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হচ্ছে। নামকরা নাট্যদলগুলো গিমিক আর স্ট্যান্টবাজির কাছে হার মেনে অবশেষে তাদের নাটকে অদ্ভুত সব আঙ্গিকের ব্যবহার করছেন যা ইতঃপূর্বে অকল্পনীয় ছিল। নাচ-গানের এমনকি সার্কাসও নাটক দেখতে গিয়ে দেখতে হয় আজকাল।

অবশ্য স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দশ-বারো বছরের নাট্যচর্চায় এইসব ভঙ্গিসর্বস্ব নাটকের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। কিন্তু যখন আমাদের নাটক নিয়ে বেশ কিছু প্রশংসা-ট্রশংসা হল, কোলকাতার নাট্যদলগুলো এখানে, আমাদের নাট্যদলগুলো ওখানে গিয়ে নাটক করার সুযোগ লাভ করল তখন দেখি আমাদের দেশের নাটকগুলোতে কিছু কিছু ভেলকিবাজি শুরু হয়েছে। নাটকের মধ্যে অহেতুক নাচ-গান, পাশ্চাত্য ব্যালের ব্যার্থ অনুকরণে কিছু কিছু ইউটোপীয় কম্পোজিশন এমনকি সার্কাসের ডিগবাজিও আমদানি হতে দেখা যাচ্ছে।

বিষয়টা আমাদের মহিলা সমিতির মঞ্চে, এর আগে দেখিয়ে গেলেন কলকাতার 'অন্য থিয়েটার'-এর বিভাস চক্রবর্তী। আমাদের আরণ্যক নাট্যদলের আমন্ত্রণক্রমে তারা এখানে 'মাধবমালঞ্চী কইন্যা' নামে এক লোককাহিনীভিত্তিক প্রযোজনা নিয়ে এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। আমাদের মঞ্চে এটা অভিনব হলেও নাট্যক্রিয়ার সাথে এইসব অ্যাক্রোবাটস-এর সংযোজন বিভাস বাবুর মস্তিষ্কেই প্রথমে আসেনি। ১৯০৫ সালে আরও বিশেষ করে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পরপরই নাট্যশিল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে এইসব অভিনব জিনিস আমদানির এমন ইতিহাস আছে। এমনকি চলচ্চিত্র শিল্পের প্রবাদপুরুষ ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রতত্ত্ববিদ আইজেনস্টাইন, চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করার আগে প্রলেটকাল্ট থিয়েটারে উনিশ শতকে খেলা অস্ত্রোভস্কির বিখ্যাত নাটক 'দি ওয়াইজ ম্যান'-এর ব্যঙ্গ-রসাত্মক রূপায়ণ করেছিলেন 'দেয়ার ইজ মাচ সিম্পলিসিটি ইন এভরি ওয়াইজম্যান' নামে। এখানে আইনজেনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত মনতাজ তত্ত্বের প্রথমদিকের ধারণাসমূহ 'অ্যাক্রোব্যাটিক থিয়েটার'-এ রূপ দিয়েছিলেন। নাটক জমেছিল ভালোই কিন্তু পরে তিনি নিজেই নাটকে এই রীতির প্রয়োগ বাদ দেন এবং এর পরপরই তিনি চলচ্চিত্র জগতের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন।

যে কথা বলছিলাম, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে ইউনিফর্মিটির বদলে একটু ভিন্নস্বাদ আনা যায় কিন্তু বিষয়বস্তুতে যদি পরিবর্তন বা নতুনত্ব না-আসে তবে পুরনো বিষয় অবলম্বন করে নাট্যশিল্পে শুধু ভঙ্গি বা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কিছুকাল মোহবিস্তার করা যাবে হয়তোকিন্তু কিছুদিন যেতে না-যেতেই দর্শককুল বিরক্ত হয়ে উঠবেন।

**বাস্তবতা :** তাহলে বাস্তবতা এই যে, আমাদের মঞ্চের নাট্যকাররা নতুন নতুন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এখন আর নাটক লিখতে পারছেন না। তাই অনুবাদ, অনুসরণ ও অবলম্বন নিয়েই থাকবেন আরও কিছুকাল। সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যদলগুলোর দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? থিয়েটার প্রায় দু'বছর মঞ্চে কোনো নতুন নাটক আনেনি। থিয়েটার (আরামবাগ) তাদের লোকপ্রিয় প্রযোজনা 'সাত ঘাটের কানাকড়ি'র নাকাড়া আজও বাজিয়ে চলেছে। ইতঃমধ্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতন হয়েছে এবং তিনি প্রায় দুই বছর নয় মাস কারারুদ্ধ। আরণ্যক নাট্যদলেরও সেই একই অবস্থা। 'মানুষ' এবং 'পাথর' প্রায় দেড় বছরের অধিক প্রযোজনা। নাগরিক সৈয়দ শামসুল হকের 'ঈর্ষা' মঞ্চায়ন শুরু করলেও 'দর্পণ' প্রযোজনা অব্যাহত রেখেছে, পদাতিক এখন জামিল আহমেদের রূপান্তরিত মীর মশাররফ হোসেনের কারবালা কাহিনী অবলম্বনে 'বিষাদ সিন্ধু' প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত। নাট্যকেন্দ্র মলিয়র ছেড়ে এবার গিরিশ কার্নাড-এর ওপর ভর করেছে, ঢাকা থিয়েটার অবশ্য নতুন নাটকের প্রযোজনা করেছে, তবে মাঝে-মধ্যে পুরনো নাটকের প্রযোজনা অব্যাহত রেখেছে। অন্যান্য দলগুলোও কেউ বিদেশি নাটকের অনুবাদ, কেউ-বা সরাসরি কলকাতার নাট্যকারদের নাটকের অভিনয় করছে। তাহলে আমাদের মঞ্চের নাট্যকাররা নতুন নাটক লিখছেন না কেন? তাদের মধ্যে কি ইনার্‌সিয়া এসে গেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান আজ আমাদের করতে হবে। কেননা, কোনো রকম সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের নাট্যদলগুলো গত বিশ বছরে এ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে, আজ সহসা যদি তাদের সৃজনক্রিয়া একই বৃত্তে ঘুরতে থাকে, তবে এই বৃত্তের বাইরে আসার দায়িত্বটাও তাদেরই নিতে হবে। তারা যেমন কেবল মনোবল সম্বল করে আমাদের মঞ্চে আধুনিক নাট্যকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ইতিহাসের গতি যদি সহসা কোনো কারণে রুদ্ধ হয়ে আসে, তবে পথ তাদেরকেই বের করতে হবে।

## মীমাংসা

কথায় বলে সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সমাধানের অর্ধেক পথ তৈরি করে দেয়। যদি নাট্যকর্মীরা উপর্যুক্ত প্রতিপাদ্যের সাথে একমত হন তবে সমস্যা সমাধানের জন্য কতিপয় প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। আর যদি তারা মনে করেন যে, তারা যা করছেন, এর চেয়ে ভালো কিছু করার নেই বর্তমান মুহূর্তে, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

প্রথমত, নাটক মঞ্চায়নের স্থান আরও বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, আরও অধিকসংখ্যক দর্শককে নাটক দেখার ব্যবস্থা করতে হবে, নাট্যক্ষেত্রে তারা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তার সাথে ব্যাপক জনগণের না-হোক অন্তত শিক্ষিত সুধীজনের আরও উল্লেখযোগ্য অংশের পরিচয় ঘটাতে হবে।

প্রথম কাজটা এইভাবে শুরু করা যেতে পারে। যেমন আগে কেবল মহিলা সমিতিতে নাটক মঞ্চস্থ হত। এখন গাইড হাউসেও নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু এই দুটি স্থান একই জায়গায়। ঢাকার এখন নাট্যদলের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের অধিক। প্রতি সংস্থাকে প্রতি সপ্তাহে নাটক করতে গেলে আরও বেশি মঞ্চ বা মিলনায়তনের দরকার। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির মিলনায়তন প্রায়শই খালি থাকে, এ ছাড়া নীলক্ষেত আইসিএমএ মিলনায়তন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তন, কচিকাঁচার মেলা মিলনায়তন, ওয়াপদা মিলনায়তন ইত্যাদি মঞ্চে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কোনো দলের নাট্যকাররা অন্যদলের জন্য অবশ্যই নাটক লিখবেন। এ ছাড়া কোনো দলে জড়িত নন এমন সব নাট্যকার, তাদের নাটকেরও মঞ্চায়ন করতে হবে। নতুনদের নাটককে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করি। বিশেষত বড় বড় দলগুলোর উচিত নতুন নাট্যকার সৃষ্টিতে অবদান রাখা। তারা শুধু দলীয় নাট্যকারের নাটকই অভিনয় করেন দেখতে পাই। এ ক্ষেত্রে কথা হল্ তারা যদি নবীন নাট্যকারদের নাটক প্রযোজনায় হাত দেন, তবে একদিকে তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় নতুন নাটককে তারা ঘষেমেজে তৈরি করে নিতে পারবেন; অন্যদিকে নবীন নাট্যকার তার নাটকের সফল প্রযোজনা দেখে আরও নাটক লিখতে উৎসাহ বোধ করবেন। এতে নতুন নাট্যকারই শুধু সৃষ্টি হবে না, মৌলিক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে আজ যে বন্ধ্যাত্ব তা-ও কিছুটা ঘুচবে বলে আশা করা যায়।

এ ছাড়া নাট্যবিষয়ক সেমিনার, আলোচনাসভা ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। এখানে নাট্য প্রযোজনার বর্তমান সমস্যাসমূহকে আলোচনার পর আলোচনা করলে একটা সমাধান বেরিয়ে পড়তে পারে।

### পরিশিষ্ট

সাফল্য আকাশ থেকে পড়ে না। মানুষের প্রচেষ্টা দিয়ে সবকিছু অর্জন করতে হয়। সবার আগে চাই আলোচিত নাট্যদলগুলো যদি এ-ব্যাপারে আন্তরিক হন, সত্যনিষ্ঠ হন, তবে একটা সমাধান তারা খুঁজে পাবেন এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

# এস. এম. সুলতান : বলশালী গণশক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা

শ ও ক ত হো সে ন

শেষ পর্যন্ত শক্তিমানের বিজয় ঘটে এবং জনমত বিজয়ীর পক্ষে এসে একাত্ম হয়; ইতিহাস ধাবিত হয় শক্তিমানের দিকেই। বাঙালির অনন্য শক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এদের ভাষা-শক্তির স্বরূপ অন্যতম; এ-ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানা মত রয়েছে, তবে যতদূর প্রমাণ মেলে তাতে মীননাথই বাংলা ভাষার আদিম লেখক। মীননাথ-এর কারণে সহজেই বোঝা যায়, বাংলাভাষা কতটা পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী। এ-ছাড়া হাজার বছরেরও অধিক কাল আগে লেখা *চর্যাগীতি* কিংবা *ময়মনসিংহ গীতিকা* এ-ভাষাকে করেছে আরও শক্তিশালী। ঐতিহ্যিক এই শক্তিকেই এস.এম. সুলতান নিজের মননে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবয়বিক আধার হিসেবে পুষ্ট করে তুলেছিলেন আরেকটি ভিন্ন মাধ্যমের মধ্যদিয়ে।

এস. এম. সুলতান বাঙালিকে বলশালী বা শক্তিমান রূপে দেখার মধ্যদিয়ে মূলত বিশ্ববাসীকেই শক্তির পয়গাম হিসেবে দেখতে চেয়েছেন তাঁর চিত্রশিল্পে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি; আদিম বাঙালি মীননাথ কি রুগ্‌ণ ছিলেন? নাকি সুলতানের কল্পনার মানসজাত স্বাস্থ্যশালী বলিষ্ঠ কোনো মানুষ ছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায় খানিকটা নৃতাত্ত্বিক পথে খোঁজখবর করবার চেষ্টা করে দেখা যাক–

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষাতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে হিন্দ-ইউরোপিয়ান (Indo-European), শামী (Semitic), হামী (Hamitic), দ্রাবিড় (Dravidian) প্রভৃতি নানাজাতীয় গোষ্ঠীতে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের কথা’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘পৃথিবীর প্রায় সকল শব্দ একই মূল হিন্দ-ইউরোপিয়ান শব্দ হতে উৎপন্ন’। পশ্চিম বাংলার প্রথাবিরোধী ভাষা-গবেষক কলিম খান তো বলেছেনই, পৃথিবীর সকল শব্দের মূল উৎস ভারতবর্ষ এবং সেটা সংস্কৃত (তথা পরবর্তীকালের বাংলা ইত্যাদি) থেকে। আর মীননাথ তো বাঙালি ছিলেন; দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন এবং যোগী সম্প্রদায় নাথ পন্থী ছিলেন; উল্লেখ্য আদিনাথ শিব, তার পরপরই কিন্তু মীননাথ-এর আবির্ভাব। নৃতাত্ত্বিক খোঁজ-খবর করে

জানা যায় এরা বলশালী-সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত ছিলেন তিন দিক থেকে; শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং ভাষাগত দিক থেকে। শারীরিকভাবে শক্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন সেটা আদিকালীন পটচিত্র কিংবা গাজীর পটের মধ্যে বাঘের পিঠে মানুষ চড়ার দৃশ্য দেখে বোঝা যায়; তাছাড়া মাটিতে ফসল ফলানো, নদী বা সাগরে মাছশিকার ইত্যাদি কাজ তো রুগ্ণ মানুষ দিয়ে সম্ভব নয়; অন্যদিকে যোগীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক উপায়ে সম্পূর্ণভাবে নিজের মনের ওপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা; সে-কারণে প্রাচীন-বাঙালি প্রকৃতির সাথে লড়াই করে এবং প্রকৃতির সাহচর্যে যেমন বেঁচে ছিল একইভাবে নিজের মনস্তত্ত্বকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখত; এমনকি ছোট-খাট অসুখ-বিসুখ তো বটেই বড় বড় অসুখ-বিসুখও সারিয়ে ফেলত তারা নিজের মনের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে এবং এ্যাকুয়া প্রেসার-পদ্ধতির মাধ্যমে তারা এমন সব অসুখের চিকিৎসা প্রাচীনকালে অনায়াসে করত যা করার জন্য এখন বড় বড় হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারগুলোকে কাঁটাছেড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এতসব কথা বলার অর্থ হল, শিল্পী এস. এম সুলতানের চিত্রের সঙ্গে আদি বাঙালির ঘনিষ্ঠতম মিল খুঁজে পাওয়া যায়; সুলতান তাঁর চিত্রে পেশির ভেতর দিয়ে, গোটা গোটা মাংসপিণ্ডের ভেতর দিয়ে, প্রশস্ত কপোল, বাহু, সুঠাম গ্রীবা, পীনস্তনী আদল, হাঁটু, তীক্ষ্ণ কনুই টানটান ঘাড়ের ভেতর দিয়ে প্রাচীন বাঙালির শারীরিক ও মানসিক সেই শক্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বদরবারের সামনে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা শুরু করে থাকেন গৌতম বুদ্ধের সমকাল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে। এর কারণ সম্ভবত এই, তার আগের সময়ের মধ্যে আলোর তুলনায় অন্ধকারের পরিমাণটাই বেশি থাকায় সচরাচর আলোচনার মধ্যে সেই সময়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অন্যদিকে বাঙালির কেবল হাজার বছরের ইতিহাসের কথাই বলা হয়ে থাকে; ইতিহাসবিদগণ হাজার বছর আগের বাঙালি কী ছিল, তার রাজনীতি কী ছিল সেটা আলোচনায় উৎসাহী হয় না। সে-কারণে শিল্প-সাহিত্যেও সেই সময় নিয়ে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উহ্য থেকে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল হাজার বছর পূর্বে কি বাঙালির রাজনীতি, সমাজনীতি ছিল না? অবশ্যই ছিল। এস. এম. সুলতান তারও একটি সমাধানের পথ টানতে চেয়েছেন বলিষ্ঠ বাঙালির স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে; তাঁরই প্রচ্ছন্ন প্রতিকৃতিরা অপেক্ষমাণ আবার ক্ষমতায়নের ব্যাগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে!

## দুই.

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্টের ১০ তারিখ নড়াইলের মাছিমদিয়ায় এস. এম. (শেখ মুহম্মদ) সুলতানের জন্ম। দরিদ্র রাজমিস্ত্রী বাবার একমাত্র পুত্র সুলতানের ডাক নাম ছিল লাল মিয়া। বাবাকে রাজমিস্ত্রির কাজে সহযোগিতা করার ফাঁকে খেলার ছলে ছবি আঁকতে শুরু করেন তিন।

১৯৩৮ সালে নড়াইল থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে একাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন।

১৯৪১-সালেএকাডেমিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও আর্ট কলেজে সুলতানের ভর্তির ব্যবস্থা হল;

১৯৪৪ সাল পর্যন্ত, তিন বছর কলকাতা আর্ট কলেজে সুলতান পড়াশুনা করলেন; প্রথম বছরে দ্বিতীয় ও পরবর্তী দু'বছর ক্লাসে প্রথম হলেন।

১৯৪৪ সালে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা আর্ট কলেজ ত্যাগ করেন। কিছু কাল যত্রতত্র ভ্রমণের পর তিনি কাশ্মীরের পাহাড়ে একদল আদিবাসীর মাঝে বসবাস শুরু করলেন এবং চারপাশের মানুষ ও তাদের জীবন নিয়ে অনেকগুলো ছবি আঁকলেন।

১৯৪৬-তে কাশ্মীর থেকে সিম্‌লা গেলেন; সেখানে সুলতানের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের লাহোরে যান এবং পরে করাচিতে অবস্থান করেন। এ-সময় নাগী, চুগ্‌তাই, শাকের আলি, শেখ আহমদ প্রভৃতি শিল্পী ও পণ্ডিত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। একজন শিল্পী হিসেবে করাচিতেই প্রথম খ্যাতি লাভ করেন সুলতান।

১৯৪৮-এ লাহোরে প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়;

১৯৫০ : চিত্রশিল্পীদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের জন্য তিনি আমেরিকা গমন করেন। তখন নিউইয়র্ক, বোস্টন, ওয়াশিংটন, শিকাগো প্রভৃতি জায়গা ঘুরে বেড়ান এবং চিত্রপ্রদর্শনী করেন। এরপর ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। লন্ডনে বেশ কয়েকটি একক প্রদর্শনী করেন এবং কয়েকটি যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। সে সময় তিনি ভিক্টোরিয়া এমব্যাকমেন্ট-এ অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট সমকালীন শিল্পীদের যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। উল্লেখ্য, পাবলো পিকাসো, সালভেদর দালি, পল ক্লি, ব্রাক প্রমুখের মতো খ্যাতিমান শিল্পীদের পেইন্টিং-এর পাশে এশিয়ান শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র সুলতান-এর ছবিই উক্ত প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের গৌরবের অধিকারী।"

১৯৫৩ সালে জন্মভূমি তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের নড়াইলে ফিরে এলেন। গ্রামের শিশু-কিশোরদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চারুকলার শিক্ষা প্রদানের জন্য

তিনটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন– নন্দনকানন প্রাইমারি স্কুল, নন্দনকানন হাই স্কুল ও নন্দনকানন ফাইন আর্ট স্কুল।

এরপর ১৯৬৭ সালে নড়াইল সদরে স্থাপন করলেন কুড়িগ্রাম ফাইন আর্ট স্কুল।

১৯৭৩ সালে যশোর শহরে গড়ে তুলেন 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে যার নাম 'চারুপীঠ'।'

১৯৭৬ সালে ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সুদীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর পর সুলতানের এক চিত্রপ্রদর্শনী হয়।

১৯৮২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সুলতানকে 'ম্যান অব এশিয়া' ঘোষণা করে। ১৯৮৭ সালে সুলতানকে বাংলাদেশ সরকার 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স'-এর সম্মানে ভূষিত করে। ওই বছর ঢাকাস্থ জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজন করে সুলতানের একক চিত্রপ্রদর্শনী।

## তিন.

আহমদ ছফা তাঁর 'বাংলার চিত্র ঐতিহ্য: সুলতানের সাধনা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "শেখ মুহম্মদ (এস. এম.) সুলতানের আঁকা গুরুভার নিতম্ববিশিষ্টা পীনস্তনী এ-সকল চমৎকার স্বাস্থ্যবতী কর্মিষ্ঠা লীলাচঞ্চলা নারী, স্পর্ধিত অথচ নমনীয় সর্বক্ষণ সৃজনলীলায় মত্ত, অহল্যা পৃথিবীর প্রাণ-জাগানিয়া এ-সকল সুঠামকান্তি কিষাণ, এ-সকল সুন্দর সূর্যাস্ত, রাজহাঁসের পাখনার মতো নরোম তুলতুলে এ-সকল শুভ্র শান্ত ভোর, হিঙুল বরণ মেঘ-মেঘালীর অজস্র সম্ভার, প্রসারিত উদার আকাশ, অবারিত মাঠ গগন ললাট, তালতমাল বৃক্ষরাজির সারি, দীঘল বাঁকের নদীতীরের এ-সকল দৃষ্টি-শোভন চর, মাঠের পর মাঠে থরে থরে ঢেউ খেলানো সোনার ধান, কলাপাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকজ্বলা এমন মোহিনী অন্ধকার, আঁকাবাকা মেঠো পথের বাঁকে বাঁশ-কাঠে গড়া কিষাণের এ-সকল সরল আটচালা, এ-সকল আহ্লাদী বাছুর এবং পরিণতবয়স্ক গবাদিপশু, সর্বোপরি গোটা জনপদের জনজীবনে প্রসারিত উৎপাদন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ সভ্যতার অভিযাত্রী অজেয় মানুষ; তারা যেন দৈনন্দিন জীবনধারণের স্রোতে কেলিকলারসে যুগ থেকে যুগান্তর পেরিয়ে অনন্তের পথে ভেসে যাচ্ছে, ক্যানভাসে তাদের প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ উপস্থিতি, স্বচ্ছন্দ ঋজু গতিভঙ্গিমা এমনভাবে বাঁধা পড়েছে, মনে হবে সমস্ত নিসর্গ দৃশ্য ছাপিয়ে মেঘেতে ঠেকেছে তাদের মস্তক এবং পাতালে প্রবিষ্ট হয়েছে মূল, তাদের শ্রম-ঘামের ঝঙ্কার, চেষ্টার সঙ্গীত সমস্ত প্রাকৃতিক কোলাহল ভেদ করে আকাশগঙ্গার কিনারে ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনিতে একসঙ্গে ফেটে পড়ছে।" ছফা উপরিউক্ত কথাগুলো সুলতানের ছবি সম্পর্কে এমনিতে বলেননি, ছফাও একজন সিরিয়াস জীবনদর্শী মানুষ হিসেবে আরেকজন বহুসিঁড়ি-ভাঙা সুলতানকে দেখেছেন এভাবে, "সুলতানকে বাঙলার প্রকৃতিতে, বাঙলার ইতিহাসে এবং বাঙলার মানুষের

শ্রম, ঘাম, সংঘাতের ভেতরে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে দুস্তর পথ, পেরিয়ে আসতে হয়েছে সাধনা এবং নিরীক্ষার অনেকগুলো পর্যায়। তাঁর ব্যক্তি-জীবন এবং শিল্পী জীবনের সমান্তরাল যে অগ্রগতি তা-ও কম বিস্ময়কর নয়।" শিল্পবোদ্ধা, পণ্ডিত ও সমাজতাত্ত্বিক আহমদ ছফার মতে, 'গোটা ভারত উপমহাদেশ জুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে লেগেছে। সর্বক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারার একটা দুর্বার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ চাহিদা : জাতীয় সাহিত্য চাই, জাতীয় বিজ্ঞান চাই, জাতীয় শিল্প, জাতীয় বাণিজ্য চাই।'

ছফার এই উক্তির দাবি অনুসারে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে জাতীয় শিল্পের প্রয়োজন অনেকটাই পূরণ করেছিলেন দু'জন বাঙালি মুসলিম শিল্পী; এদের একজন হলেন জয়নুল আবেদীন আর দ্বিতীয় জন এস.এম. সুলতান। এখানে 'মুসলিম' শব্দটি উল্লেখ করা হল এই কারণে যে, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি না-শেখা, পশ্চাৎপদ, ধর্মান্ধ একটি জাতি হিসেবে মুসলমানের পক্ষে অন্যান্য শিল্পের মতো চিত্রশিল্পেও মানুষের অস্তিত্বের জানানকে স্বার্থক করে ফুটিয়ে তোলা– সেই সময়ের জন্য নিঃসন্দেহে ছিল বিস্ময়কর; যা অভাবনীয় সফলতার সঙ্গে করে দেখিয়েছেন জয়নুল ও সুলতান। তবে সার্বিক বিচারে উল্লেখ্য যে, 'নন্দলাল বসুই প্রথম ব্যক্তি যাকে প্রকৃত অর্থে সার্থক বাঙালি চিত্র-শিল্পীর শিরোপা দেয়া যেতে পারে।' 'যামিনী রায় দেশীয় রীতিতে ঐতিহ্যনির্ভর মনোমুগ্ধকর অঙ্কনশৈলীর উদ্ভাবক এবং বাঙলার একান্ত ঘরোয়া চিত্রশিল্পী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' "শেখ সুলতানের মধ্যে দ্য ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল, প্রমুখ শিল্পীর প্রকাশ কল্পনা এবং কল্পনার বলিষ্ঠতার ছাপ এত গভীর এবং অনপনেয় যে মনে হবে এ চিত্রসমূহ, কোনো রকমের মধ্যবর্তিতার বালাই ছাড়া সরাসরি রেনেসাঁস যুগের চেতনার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে উনিশশো ছিয়াত্তুর সালে বাংলাদেশের কৃষকসমাজে এসে নতুনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছে। এই ছবিগুলো আঁকার মতো মানসিক স্থিতাবস্থা অর্জন করার জন্য শেখ সুলতানকে সব দিতে হয়েছে।" 'অন্যূন চল্লিশ বছরের জীবনের একটানা ছুটে চলা ঘরবিরাগী জীবনের সম্পর্কে কোনো গহন কথা আমরা যেমন উচ্চারণ করতে পারব না, তেমনি তাঁর এ সুদীর্ঘ কালের আঁকা ছবির ওপর কোনো বক্তব্য রাখতেও পারব না।' 'সুলতানের ছবির মানব-শরীরগুলোকে বাস্তবতার নিরিখে মনে হতে পারে অসংগত, অনানুপাতিক; "সুলতান তাঁর ছবির প্রতিটি দেহকেই সেই মহামানবের মতোই এঁকেছেন, যে মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়েছিল ৫২'র একুশ তারিখে কিংবা ২৬ মার্চ গভীর রাতে, কারণ এ দেশের অসহায় জনতার কাছে প্রতিটি দিনই তো বস্তুত এক-একটি ব্যথাকাতর শুক্রবার। তাদের অস্তিত্ব অনিঃশেষ এক যন্ত্রণার রূপকথা, তবে তারা অকুতোভয়, টিকে থাকার জন্য প্রতিমুহূর্তে তারা অদম্য সংগ্রামে লিপ্ত।"

কবি আল মাহমুদ-এর ভাষায়, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের প্রায় সমসাময়িক এই মৌলিক চারুশিল্পী বহুকাল যাবৎ উপমহাদেশের উত্থান-পতন, দেশ বিভাগ ও অন্যান্য

মানবিক আলোড়নের মধ্যেও তাঁর নিজস্ব এক ধরনের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছেন।' আল মাহমুদ আরও লিখেছেন, 'তাঁর সাথে তুলনা হতে পারে এমন শিল্পীরাও পৃথিবীতে আর বেঁচে নেই। তাঁর চেয়ে বড় শিল্পী নিশ্চয়ই আছেন তবে তাঁর শিল্পকর্মের মতো মৌলিকধর্মী নিরপেক্ষতা প্রায় অনুপস্থিতই বলা চলে।' কবি শামসুর রাহমানের জবানী থেকে জানা যায়; তিনি নিজেই স্বীকার করছেন, 'সত্যিকথা বলতে কি প্রথমদিকে আমি এস, এম, সুলতানের চিত্রকর্মের অনুরাগী ছিলাম না। . . . . .

'আমি ক্রমশ স্বতশ্চল এই চিত্রশিল্পী ও তাঁর চিত্রকর্মে অনুরক্ত হই। ক্লান্তিহীন পরিভ্রমণকারী সুলতান বর্তমানে . . . . .

'সকল শিল্পীর ওপর প্রভাব যার অপ্রতিরোধ্য। সুলতান কখনো এই প্রভাবে সংকুচিত হননি; লজ্জিত নন, বরং এটি তাঁকে অমর চিত্রকর হিসেবে বেড়ে উঠতে পুষ্টি যুগিয়েছে।'

সুলতান প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান ইয়ুং-এর উদ্ধৃতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, 'any genuine artist transmuters our personal destiny into the destiny of mankind, and evokes in us all those beneficent forces that even have enabled humanity to find a refuge from every peril and to outlive to the longer night '.

শিল্পী এস. এম. সুলতানের জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ নির্মাণ করেছিলেন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'আদম সুরত'। ১৬ মি. মি. (রঙিন) ফর্মেটে নির্মিত এ চলচ্চিত্রের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৮২ সালে। অর্থাভাবসহ নানা রকম সংকট কাটিয়ে তারেক মাসুদ একসময় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। তারেক মাসুদ 'ইউনিট' নিয়ে চলে গেছেন সুলতানের আবাস নড়াইলে; ছুটে গেছেন ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে– যেখানে তিনি ফেলে এসেছেন রঙে রঞ্জিত বর্ণিল অনুভূতিমালাকে; সেইসব জায়গা সুলতানের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছিল একদিন। ৬০ মিনিট সময়-দৈর্ঘ্যের এ প্রামাণ্যচিত্রে ফ্রেমবন্দী হয়েছে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতানের জীবনের নানা দিক।

## চার.

সুলতানের নারীদের প্রতিও মাহমুদের পর্যবেক্ষণ বেশ প্রাঞ্জল ও তাৎপর্যপূর্ণ, 'তাঁর আঁকা সব নরনারীই বাস্তবের নরনারীর চেয়ে একটু সুন্দর, পেশীবহুল, নিখুঁত এবং কর্মপরায়ণ। ফিগারগুলো বাস্তবের চেয়ে একটু বিস্তৃততর। এই বাহুল্যই সুলতানের প্রতিটি রচনাকে মহিমা দিয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

কিন্তু শিল্পীর আঁকা মহিলাদের দেহগুলো পুরুষদেহগুলোর একদম বিপরীত। তারা একান্তই রমণীয় যা মাইকেলএঞ্জেলোর ছবিতে একেবারেই দেখা যায় না। সুলতানের নারীগণ একেকটি মূর্তিমান শক্তিমান কিন্তু লাবণ্য। প্রাচ্য ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের দেহ আবৃত, শিল্পী কাজ করেছেন কেবল তাদের উন্মুক্ত হাত, পা আর মুখের ওপর। তাদের সোনালি গায়ের রং আর মাতৃময়ী মুখাবয়ব।

শিল্পীর আঁকা জীবজন্তুও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিকৃতি; বিশেষ করে ষাঁড়গুলো অসাধারণ সুন্দর, যে কারণে সুলতানের ষাঁড়ের পাশাপাশি উল্লেখ করা চলে ভিঞ্চির আঁকা সেইসব ঘোড়ার অনুশীলনগুলো।

সুলতান যে-ধারায় ছবি আঁকেন; তাঁর ব্রাশ ব্যবহারে কখনো প্রকাশ্য কখনো গোপন একটি ক্যারিশম্যাটিক ব্যাপার লক্ষ করা যায়। টুকরো টুকরো রঙ ব্যবহারে সূক্ষ্ম বৃত্তের ছোট ছোট তরঙ্গের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ছবিতে টেক্সচারের আমেজ তৈরি করেন। তাঁর ছবিতে রূপক ব্যবহারের সাথে ঐতিহ্যিক, ধ্রুপদী ব্যাকরণগত তেমন কোনো ধারার সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁর বিষয় যতই সাদা-মাটাই হোক-না কেন, তাঁর পর্যবেক্ষণ গভীর মননশীলতায় ভাস্বর।

সুলতান কে? তিনি একজন অনন্য পিকাসো? ভিনসেন্ট ভ্যান গগ? হয়তো দুই-ই সুলতান, হয়তো তার চেয়েও বেশি বলা হলে মোটেও ভুল বলা হবে না। নাটকীয় দেহভঙ্গিমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি পিকাসোর সদৃশ, আর ব্রাশের ঋজু-দৃঢ় আঁচড়ে তিনি ভ্যান গগের কাছাকাছি। বিষয়বস্তুর প্রগাঢ় ভাবগাম্ভীর্যতায় তিনি আরো বেশি কিছু। ফলে তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে– যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পৌরাণিক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামের কৃষকদের আকাঙ্ক্ষার এক জীবন চিত্রিত করেছেন। এটা তাঁকে অনলংকৃত পল্লীগাঁথা কিংবা ভাবাবেগাক্রান্ত গ্রাম্যদৃশ্যাবলি রচনা থেকে বিরত রেখেছে। এভাবে তাঁর কৃষকেরা পৌরাণিক বাস্তবতায় আদিম শক্তি ও শক্তির প্রত্যয় লাভ করেছে; সেই সব কৃষক, সম্ভাব্য সমাজের কাছ থেকে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে নিতে অপেক্ষমাণ; সুলতান এই আদিম প্রত্যয়, এই শ্রেণিচেতনার উত্তেজনাকেই গ্রহণ করেছেন ।

ধ্রুপদী বা চিরায়ত শিল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শত শত বছর মানুষের মনে যে বিশ্বাস দানা বেঁধে থাকে, সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা; *মেঘনাদবধ কাব্যে* মধুসূদন মেঘনাদ ও রামের চরিত্র উল্টো করে চিত্রণের মধ্য দিয়ে সেই রকম একটি বিশ্বাসের মূল্যে কুঠারাঘাত করতে পেরেছেন বলেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের সকল সীমানা পেরিয়ে চির চিরায়ত'র আসনে আসীন হয়েছে।

একইভাবে এস. এম সুলতান নির্বীর্য, রুগ্‌ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য বাঙালিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই হল তোর অতীত, ঐতিহ্য, ইতিহাস; এই হল তোর বলিষ্ঠ মা যার বাহু সংসার আগলে রাখত, শত্রুর মোকাবেলা করতে কিংবা সন্তানকে পুষ্ট রাখতে সুঠাম গড়নের সুস্থ শরীরবতী তিনি। এই তোর বাবা– যিনি জমি, জলায় কাজ করার জন্য সদাসুস্থ ও প্রস্তুত। এই তোর উঠোন– যেখানে সূর্যের বলিষ্ঠ রোদ এসে পড়ে আর তোর খোলা মাঠ যেখানে খেলা করত তোর অতীত আর এই তোর গরু, গাছ, মুরগি, ছাগল– যা-যা আছে সবই তোর, তুইও এদের আর তোরা সবাই ভুলে যা যে তোর স্বপ্ন রুগ্‌ণ, অপারগ!

ইংরেজ, ওলন্দাজ, পাকিস্তানি তোদের হাতেই বিতাড়িত হয়েছে; তোরা বাঘা যতীনের সন্তান, তোরা এম. এন. রায়ের সন্তান, তোরা সূর্যসেনের সন্তান! কাজেই এস. এম. সুলতানের এই স্বপ্ন, শুধু নিছক স্বপ্ন নয়; এটা দ্রোহের পুনর্জন্ম , এটা ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি, এটা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কাছে আমাদেরি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি।

## সহযোগী গ্রন্থ ও পত্রিকা


১. বাংলা সাহিত্যের কথা/ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২. পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং/ কলিম খান

৩. নূরুল আলম আতিক সম্পাদিত, সাহিত্য ও শিল্প সংকলন/ বিষয়ঃ এস.এম.সুলতান

৪. বাংলা পিডিয়া

৫. বাঙালি মুসলমানের মন/ আহমদ ছফা

৬. শওকত হোসেন সম্পাদিত ‘বাংলাভাষার বানান সংস্কার’ (কলিম খান-মঈন চৌধুরী বিতর্ক)

৭. অন্যান্য

প্র তি ক্রি য়া

.......................................................................................

## রামুর বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ বসতি আক্রমণ: বর্বরোচিত!

ঘটে গেল গত ২৯ সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারের রামুর বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ বসতিসমূহ আক্রমণের মতো বর্বরোচিত ঘটনা। সারা দেশ যখন এই ঘটনার জন্য তোলপাড় তখন আওয়ামী লীগ-বিএনপি একদল অন্য দলের ঘাড়ে নিন্দা আর দোষ চাপানোর তর্কযুদ্ধে লিপ্ত। দেশব্যাপী যে অচলাবস্থা বিরাজ করছে, এই বাংলাদেশী বাঙালি জাতির কর্ণধাররা কি তার কিছুই বুঝতে পারেনি?

কক্সবাজার, রামু, উখিয়া ও পটিয়াতে মানবতাবোধ বিবর্জিত লোমহর্ষক যে ঘটনা ঘটে গেল, হয়তো বিষয়টি রাষ্ট্রশাসকদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কারণ যে দেশে খুন, গুম, গণহত্যা (বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ) একটা মামুলি ব্যাপার, সে দেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ এ আর এমন কী! কিন্তু রাষ্ট্রের ভিতরে কি এমন বড় শক্তি আছে যাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোন সামর্থ্য বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেই? দুই দিনব্যাপী এতবড় ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে অথচ কিছুই বুঝতে পারেননি আমাদের রাষ্ট্র শাসকরা! সেদিন অবোধ শিশুর মতো তারা কেবল তামাশা দেখছিলেন। হুট করে ঘটার মতো এটা এমন কোনো তুচ্ছ ঘটনা নয়। বরং এর আড়ালে লুকিয়ে আছে সুদূরপ্রসারী কোনো পরিকল্পনার রহস্যজাল। আমাদেরকে অবশ্যই তা ভেদ করতে হবে। কিন্তু কেন এ রহস্যজাল বিস্তার করা হল? জনমনে এর কুয়াশা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হলেও এর ঘানি সহজে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

আমরা ১৯৮৮, ১৯৯২ এবং ২০০১ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর দিকে তাকালে রামু হামলার তণ্ডব-লীলার রহস্যজাল সহজে ভেদ করতে পারি। ইতোপূর্বে আমরা যতগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখেছি সবগুলো ঘটনার পিছনে রাষ্ট্রীয় মদদের ব্যাপারটি ছিল। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যথেষ্ট শিক্ষা আমাদের হয়েছে। কাজেই, এ কথা অস্বীকার করার আর কোনো অবকাশ নেই। এই ঘটনার দায় যদি কেউ স্বীকার না-করে থাকে তাহলে এত বড় ষড়যন্ত্র কীভাবে হল? তাহলে এর জন্য কি জনগণ দায়ী? নাকি বাইরের কোনো শক্তি এর ইন্ধনদাতা, যার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এদেশের রাষ্ট্রশাসকদেরই একটি বড় অংশ? কিন্তু বাংলাদেশে কেন এ-জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে? আর এত জায়গা থাকতে কক্সবাজারের রামুতে বা ঐ অঞ্চলে কেন? কেন অন্য

কোথায়ও ঘটনাটি ঘটল না? কারা এর ইন্ধনদাতা যে ট্রাকভর্তি মানুষ এসে রামু, পটিয়া, উখিয়াতে এমন ঘটনা ঘটালো? নাকি বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে এটা কোনো রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার বহিঃপ্রকাশ? বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের ভিতরে আর কোনো ২৯ সেপ্টেম্বরের পুরাবৃত্তি যেন না ঘটে। তার জন্য সজাগ হতে হবে এদেশের জনগণকে।

একটি আদর্শনিষ্ঠ জাতি গঠনের প্রয়াসে এগিয়ে আসা উচিত ছিল এদেশের কর্ণধারদের। কিন্তু তারা উদর ভর্তি করে খেয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই তারা রামুর ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেও প্রায় দুই দিন শুয়েবসে কাটিয়েছিলেন। আর আমরা নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় আত্মানির অনলে পুড়ে বলতে চাইছি, এসব নাটক বন্ধ করুন। নইলে যে ছাত্রসমাজকে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার দ্বারা আত্মসর্বস্ববাদী করে আদর্শনিষ্ঠ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধ রাজনীতিবিমুখ করে রাখা হয়েছে, তারা সহসাই জেগে উঠবে। নবজাগরণের জোয়ারে তরুণরা নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে জেগে উঠলে এদেশের আত্মবাদী ও উদরসর্বস্ব কর্ণধারেরা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে।

তাহিয়া পাপড়ি
**রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী ঢাকা।**

প্র ব ন্ধ / দ র্শ ন

## লালনের ‘অচিন পাখি’ দর্শন

সি দ্ধা র্থ শ ং ক র জো য়া র্দ্দা র

লালনের তত্ত্বদর্শন ও মরমী চিন্তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। বলতে গেলে বিগত কয়েক দশকে লালন গবেষকরা তাঁর অধ্যাত্মদর্শন ও সমাজভাবনা নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকাজ চালিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে নতুন ভাবে মূল্যায়ন করতে পারা যাবে এমন ভরসা কম। তবে কোনো দর্শন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হওয়াটা দূষণীয় নয়। বরং বারংবার কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ তাকে আরো অর্থবহ করে তোলে। লালনের মিস্টিক দর্শন তথা ইনট্রসপেক্টিভ ভাবনা প্রাচ্যের চিরায়ত আধ্যাত্মবাদেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উপনিষদিক ভাবনার সাথে আমাদের পরিচয় থাকার ফলে লালনকে চিনতে কোনো বেগ পেতে হয় না। লালন ছিলেন অতি অসাধারণ এক জিজ্ঞাসু। জগৎ ও জীবনকে ঘিরে যত রকম মৌলিক প্রশ্ন হতে পারে তার সমস্তটাই তিনি ভেবেছেন অত্যন্ত গভীরভাবে তথা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বলতে দ্বিধা নেই তাঁর জীবন ও জগদ্বিষয়ক ভাবনা এতটাই মৌলিক ছিল যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতীচ্যের নামকরা ভাববাদী দার্শনিকদের ছাপিয়ে গেছে। মানুষের জীবন, বিশ্বজগতের সাথে তার সম্পর্ক, অবস্থান, বেড়ে ওঠা, গন্তব্য তথা পরিণতি ও পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে তিনি যে গভীর দার্শনিক আলোচনা করেছেন তা এককথায় অভাবনীয়। ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত (Rene Descartes) দেহ ও মন সংক্রান্ত যে দ্বৈতবাদী ভাবনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছিলেন, লালন সে ভাবনারই কাব্যিক রূপ দিয়েছেন তাঁর অজস্র কবিতা ও গানে। বিশেষ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না-করলেও তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে (অনুমানিক ১১৬ বছরের জীবন) যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করেছেন তা গ্রিসের অনবদ্য মানুষ সক্রেটিসের সাথে তুলনীয়। সক্রেটিস যেমন তাঁর সমস্ত ভাবনা ডেলফি বা ঐশীবাণী কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার কথা ভাবতেন, লালনও তেমনি জগতের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আদি ও অকৃত্রিম পরমেশ্বরের কল্পনা করেছেন। দেশ-কালের সীমানা টপকিয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছেন একই ভাবনার সারথী। লালন সক্রেটিসকে জানতেন না। তবে তাঁদের চিন্তার সাজুয্যতায় মনে করিয়ে দেয় তাঁরা যেন ছিলেন দুটি ভিন্ন বৃত্তের একই কেন্দ্র!

সঙ্গত কারণেই তাঁকে প্রাচ্যের অনবদ্য কবি ও মরমী দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কারো আপত্তি নেই। তিনি তাঁর রচনার গূঢ়ার্থ তথা মর্মবাণী অত্যন্ত সরলভাবে অলংকার দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে একদিকে যেমন ছিল গভীর কাব্যরস, অন্য দিকে ছিল তত্ত্বসমৃদ্ধ দার্শনিক ভাবনায় পরিপূর্ণ। আবহমান কাল ধরে বাংলায় যে আধাত্মদর্শনের ঐতিহ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিদ্যমান ছিল লালন সেই ভাবনারই সাংগঠনিক ভিত্তি দিয়েছিলেন চমৎকার রূপে। তাঁর প্রকাশভঙ্গিমা এমন উচ্চমার্গে পৌঁছেছে যা তাঁকে পরিচয় করিয়েছে অনবদ্য এক মিস্টিক কবি হিসেবে। ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসঁ-র তত্ত্বচিন্তার সাথে প্রতীচ্যের মানুষ বিংশ শতকে পরিচিত হয়েছেন কিন্তু প্রাচ্যে তার অনেক আগে লালন সে ভাবনার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন অজস্র গান ও কবিতার মাঝ দিয়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লালনকে বাংলার অতি উচ্চমার্গিক কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হয়েছেন। মনে করা হয় কবিগুরুর জীবনদেবতা ও লালনের অচিন পাখি একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন প্রকাশ। এ প্রবন্ধে লালনের অচিন পাখি নিয়ে কথা বলব।

## দুই.

এটা নিঃসংকোচে বলা যায় লালন যে অচিন পাখির সন্ধানে ফিরেছেন তা এমন কোনো দেহাতিরিক্ত সত্তা যার আবাস মানবদেহে। দেহের বাইরেও এর অবস্থান অনিবার্য। দেহ ও দেহের বাইরে এর নিরন্তর যাওয়া-আসা খুবই রহস্যময়। মানবদেহের ছোট্ট কুঠুরি যদিও তাকে আশ্রিত করে তবু এর সাথে সম্পর্কটা বেশ ছলচাতুরির। লালন সেজন্য সেই 'পাখি'-কে 'অচিন' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এর ফলে বোঝা যায় পাখির সাথে দেহের সম্পর্কটা অনেকটাই লুকোচুরির। এজন্যই তিনি বলেছেন, 'চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি'। পাখির সাথে আমাদের সম্পর্কটা যেহেতু লুকোচুরির তাই কোনোভাবেই সে বশ্য নয়। সাময়িক তার অবস্থান যদিও আমার কাছে নিশ্চিত হয় তবুও সেই অচেনাকে কোনোক্রমেই চেনা যায় না। ফলে এই চেনা-অচেনার দোলাচলে এক অজানা, অনির্দেশের সাথে এগিয়ে চলি আমি। তখনই প্রশ্ন দাঁড়ায় আমি কে? আমি কি আমার দেহ নাকি সেই অচেনা পাখিরূপী আত্মা?

প্রাচীন হিব্রুরা সম্ভবত প্রথম এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। মানুষের আত্মা বলতে কী বুঝায়? অনেকেই ভাবতেন আত্মা এমন এক বস্তুগত জিনিস, যা দেহ-বিনাশের সংগে সংগে উবে যায়। এটাকে দেখতে লাগে ডায়মন্ডের মতো উজ্জ্বল কোনো পিণ্ড অথবা জ্বলন্ত কোনো গোলকের মতো বস্তু। এ জন্য প্রায়ই তারা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিদের মুমূর্ষু অবস্থায় একটা ঘরে রেখে দিয়ে জানালা খুলে দিতেন, যাতে করে সেই আত্মা প্রস্থান করতে পারে নির্বিঘ্নে। গ্রিসের মানুষেরাও প্রায়ই একই ধারণা পোষণ করতেন। পিথাগোরাস ছিলেন গ্রিকদের মাঝে বেশ প্রভাবশালী। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবনপ্রক্রিয়ার সাথে সবজি-জাতীয় জিনিস, বিশেষ করে সিমের অঙ্কুরোদগমের

অনেকটা মিল আছে। সূর্যের আলোকরশ্মির প্রতি সিমের বীজের যেমন তীব্র আকুতি থাকে; আলোকের আভায় যেমন নতুন প্রাণের সঞ্চারণ ঘটে, মানুষের জীবনেও তেমনি মানবভ্রূণকে বিদীর্ণ করে নতুন জীবনের আকর্ষণে সামনে এগিয়ে যায়। দার্শনিক প্লেটো অবশ্য ভাবতেন আত্মা হল দেহাতিরিক্ত সত্তা যা দেহাবসানের সাথে সাথে নতুন কোনো জায়গায় অবস্থান করে। এজন্য আত্মা অবিনাশী, অবিনশ্বর ও শাশ্বত। এর কোনো ধ্বংস নেই, নেই কোনো ক্ষয়। পাশ্চাত্যের অনেক আগে প্রাচ্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'উপনিষদে' দেহ ও আত্মার ভিন্নতা নিয়ে পরিষ্কারভাবে কথা বলা হয়েছে। কঠ্ উপনিষদে বলা হয়েছে–

'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীররং রথমেব তু
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মন প্রগহমেব চ।।'

শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মাকে রথী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। শরীর হবে রথের মতো। আর বুদ্ধি হবে রথচালক এবং মন হবে লাগাম। উপনিষদের এই কথায় স্পষ্ট হয়েছে শরীর ও মন দুটো ভিন্ন সত্তা। যাদের আলাদা আলাদা পরিচয়, আলাদা ভূমিকা। এরিস্টটল অবশ্য প্লেটো থেকে আলাদা ছিলেন। তাঁর ধারণা অনেকটাই আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। তিনি মনে করতেন দেহের বাইরে আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। দেহাবসানের সাথে সাথে আত্মারও বিনাশ ঘটে। যদিও এরিস্টটল ছিলেন পুরোদস্তর ভাববাদী। কিন্তু তার এ ধারণা কিছুতেই ধর্মীয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। লালন মনে করতেন, আত্মা যদিও দেহাতিরিক্ত সত্তা তবু এর সার্থকতা দেহাভ্যন্তরে। এই দেহেই আত্মার পরিপূর্ণতা। এই দেহেই তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু অচিন পাখিরূপী আত্মা কীভাবে ও কখন দেহ এবং দেহের বাইরে যাতায়াত করে তা রীতিমতো অবোধগম্য। আমার অন্তরে যিনি আছেন তাকে আমি চিনি না। যদিও তিনি আমার চেতনাকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করে আছেন, তবুও তার স্বরূপ আমার কাছে অপরিজ্ঞাত। এই অচেনাকে চেনার জন্য কবি, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ এমনকি বিজ্ঞানীরাও খুঁজে ফিরেছেন দশ-দিকে। খুঁজতে খুঁজতে আত্মোপলব্ধি হয়েছে এভাবে

'আদি মক্কা এই মানব-দেহে
দেখ না রে মন-ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে কেন
মরছো রে হাঁফায়ে।।
করে অতি আজব ভক্কা
গঠেছেন সাঁই মানুষ-মক্কা,
কুদরতি সূর দিয়ে
চার দ্বারে চার নূরি ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে।'

উপনিষদে বলছে, ‘আত্মানং বিদ্ধি’। সক্রেটিস বলেছেন, ‘নিজেকে জানো’। সুফিবাদে যেমনি বলেছে, ‘মান আরাফা নাফসাহু’, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু’। অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে, সে তার রব বা প্রভুকে চিনেছে। লালনের এই প্রভুই তাঁর অচিন পাখি। আর সেই অচিন পাখিই হল মানুষরতন তত্ত্ব। অচিন পাখি হচ্ছে, পরমাত্মারই অংশ যা মনের মানুষ, মানুষরতন কিংবা অলখ সাঁই। তাঁর নিজের কথায়

‘এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ রতন।
ডুবে দেখ দেখি মন তারে; কিরূপ লীলাময়
যাঁরে আকাশ পাতাল খোঁজ এই দেহে তিনি রয়।’

আবার অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

‘দেহের মাঝে আছে রে মনের মানুষ।
ডাকলে কথা কয়।
তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।’

আত্মা ও পরমাত্মার মাঝে কোনো বিভেদ নেই। প্রতিটা আত্মাই সেই অনাদি ও অন্তরের অংশ। লালনের গুরু সিরাজ সাঁই বলেছেন

‘সিরাজ শাহ বলে রে লালন
গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জানলে না
আত্মা আর পরমাত্মা
ভিন্ন ভেদ জেনো না।’

বাউল মতের মধ্যে দেহাত্মবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লালন দেহাত্মবাদকে অবিশঙ্ক চিত্তে গ্রহণ করেছেন এবং মনে-প্রাণে দেহের মধ্যেই সেই পরম শক্তিকে অনুভব করেছেন। তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাবে বলেছেন

‘উপাসনা নাইগো তার
দেহের সাধন সর্বসার,
তীর্থব্রত যার জন্য
এ-দেহে তার সব মিলে।’

এই দেহই হল শ্রেষ্ঠ মন্দির। এখানে বাস করেন মানুষরতন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'যাহা আছে দেহভাণ্ডে তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। যারা তার খোঁজে দূর-দূরান্ত অতিক্রম করেছেন তারা নিছক কালক্ষেপণ করেছেন মাত্র। তাকে পেতে মক্কা-মদিনা-কাশী-গয়া-বৃন্দাবন যাওয়া অহেতুক। এই দেহের মধ্যেই বাস করেন পরম পুরুষ। সাধক কবি লালন এটা বুঝেছিলেন এবং অন্তরের গভীরে তা লালন করেছিলেন। লালন গবেষক অধ্যাপক আহমদ শরীফ লিখেছেন 'দেহের আধারে যে-চৈতন্য সেইতো আত্মা'। এই নিরূপ নিরাকার আত্মার স্বরূপ জিজ্ঞাসা শরীরতত্ত্বে মানুষকে করেছে কৌতূহলী। এ থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে: দেহযন্ত্র-নিরপেক্ষ আত্মার অনুভূতি যখন সম্ভব নয়, তখন আত্মার রহস্য ও স্বরূপ জানতে হবে দেহযন্ত্র বিশ্লেষণ করেই। এভাবেই সাধন-তত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অসামান্য। তাই এদেশে আধ্যাত্ম সাধানায় যোগাভ্যাস একটি আবশ্যিক আচার। যোগ-সাধন পাক-ভারতের অদিম অনার্য শাস্ত্র। বৌদ্ধযুগে এর বহুল চর্চা দেখা যায়। বাংলার পাল আমলের তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের একটি শাখাই মধ্যযুগে সুফি প্রভাবে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলমত রূপে প্রসারলাভ করে। এভাবে চর্যাপদে পরিণতি ঘটে বাউল গানে ও সহজিয়া পদে।'

## তিন.

লালনকে দর্শনের ভাষায় সর্বেশ্বরবাদী বলা যায়। কারণ তিনি জগতের আদি ও পরম সত্তাকে সবকিছুর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন এবং তার মনে হয়েছে সবই সেই পরম সত্তার প্রকাশ। অর্থাৎ সীমার মাঝে অসীম অনুসন্ধিৎসু লালন এক ও অদ্বৈত সত্তার উপাসক ছিলেন। তাকে তিনি পেয়েছেন এই আঠারো মোকামের মাঝে। তাঁর কথায়

'এ বড় আজব কুদরতি
আঠারো মোকামের মাঝে
জ্বলছে একটি রূপের বাতি।।
কি কব কুদরতি খেলা
জলের মধ্যে অগ্নি জ্বালা
খবর জানতে হয় নিরালা
নীরে-ক্ষীরে আছে জ্যোতি।'

মনের মানুষকে তিনি খোঁজ করছেন সমস্ত জায়গায়, সমস্ত প্রপঞ্চে। জিজ্ঞাসা করেছেন–
'কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ-বিদেশ বেড়াই ঘুরে।'

আগেই বলেছি, লালনের অচিন পাখি আর রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সম্ভবত একই বিষয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

'অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।'

আমার অন্তরের মাঝে যিনি আছেন তিনি আমার মুখ থেকে আমারই ভাষা কেড়ে নেন। আমারই কথা বলেন আপন সুরে। এ কারণেই তাকে উপলব্ধি করাটাই আমার সার্থকতা। স্বজ্ঞাবাদী লালন নিজের মধ্যে অজানা সত্তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন গভীর আধ্যাত্মজ্ঞান দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি। তোমায় দেখতে আমি পাইনি। বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চইনি'। সুতরাং হৃদয়পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই আমার কাজ। আমি তখনই আবিষ্কার করতে পারব মহাজগতের অকৃত্রিম ও অনন্ত সত্তাকে। সেই অচেনা পাখিই হয়ে উঠবে আমার একান্ত সাধনার ধন। হয়ে উঠবে একান্ত আপন। আমি চিনতে পারব সেই মহা অজানাকে, যার জন্য অনন্তকাল ধরে মানুষ খুঁজে ফিরেছে, তল্লাশ করে চলেছে শাশ্বত ও নিত্য-জ্যোতিকে।

## চার.

লালন যে অজানা সত্তাকে নিয়ে ভেবেছেন তার অনুসন্ধান করেছেন বিশ্বের প্রতিটি দার্শনিক। প্রাচীন গ্রিস থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রতিটি জিজ্ঞাসু মানুষ ভেবেছেন এই বিশ্বজগতের আদি সত্তা কী ? কোন মৌলিক সত্তা দিয়ে এ জগৎ গড়া? থেলিস থেকে শুরু করে রাসেল পর্যন্ত প্রত্যেক চিন্তাবিদ মনে করছেন পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে? তাকে কিভাবে জানা যায়? আসলে তাকে কখনও জানা যায়, কখনও সে অজানা । কখনও মনে হয় সে আমার কাছে আপন, কখনও-বা পর। কখনও বোঝা যায়, কখনও-বা সে অবুঝ। কবিগুরুর ভাষায় 'কে সে মোর কেইবা জানে, কিছু তার দেখি আভা/ কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা'। এই না-বোঝার জন্যই লালন বলেছেন সে পাখি অজানা, সে অধরা। তবে যায় হোক সে আছে আমার মনে, আমার মনের একান্ত গহনে। কবিগুরুর ভাষায় শেষ করি

'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।।
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়

এত রূপের খেলা রংয়ের মেলা অসীম সাদায় কালোয় ।
সে মোর সংগে থাকে ব'লে ।
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দক্ষিণ সমীরণে । ।
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে ।
দুঃখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ  ভোলায়
সে মোর চিরদিনের ব'লে ।
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে ।'